শারদ সংখ্যা

দক্ষিণের দর্পণ

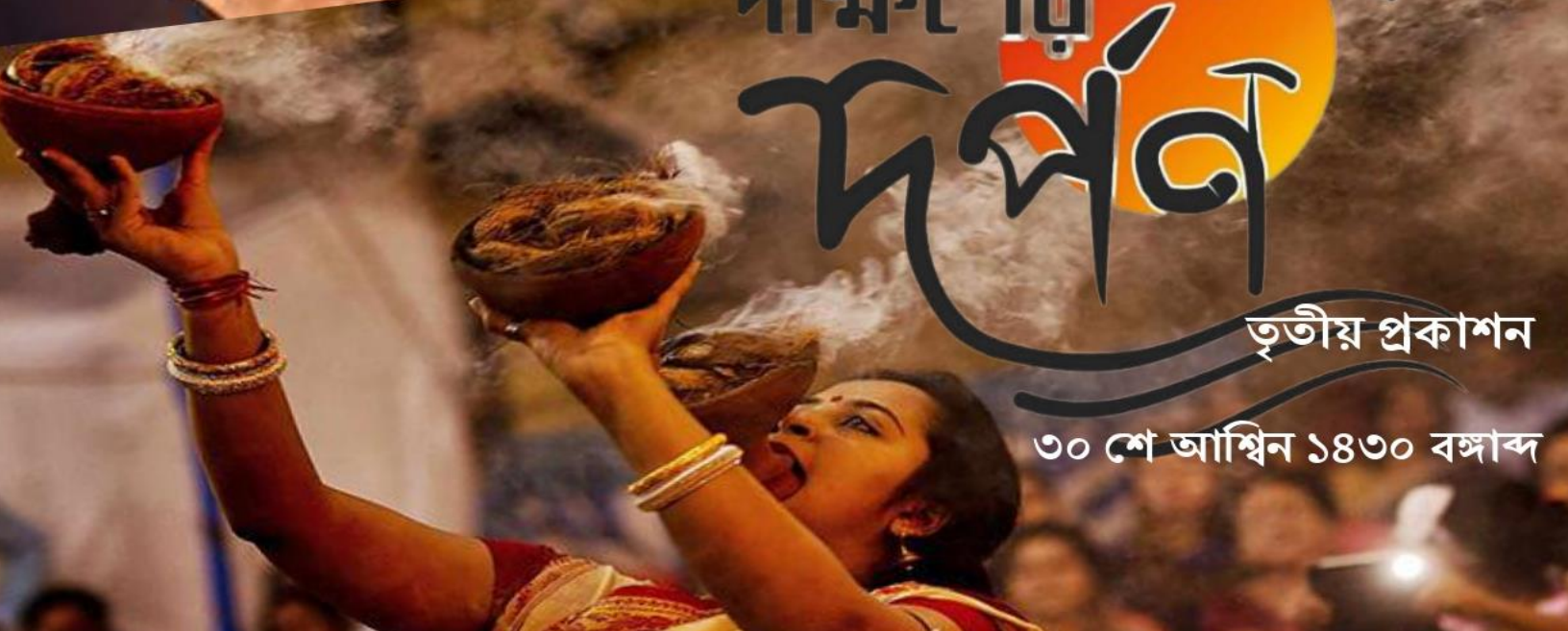

তৃতীয় প্রকাশন

৩০ শে আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

“বাংলার টানে বাঙ্গালীর অর্পণ”

দক্ষিণের দর্পণ

মুখ্য উপদেষ্টা : ডাঃ জোতির্ময় বিশ্বাস

সভাপতি : শ্রী চন্ডি মুখার্জী

সম্পাদক : শ্রী বিপ্লব ভক্ত

মুখ্য সম্পাদক : ডঃ তিমির ভট্টাচার্য

যুগ্ম সম্পাদক : শ্রী সঞ্জীব মল্লিক, শ্রী সিতাংশু শেখর বিশ্বাস

সম্পাদক মন্ডলী : শ্রী অনিমেষ চট্যোপাধ্যায়, শ্রী প্রণব বসু, শ্রীমতি নীলাঞ্জনা চৌধুরী

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রী অলোক ঘোষ, কুমারী দেবলীনা মুখার্জী

প্রকাশক ও পরিবেশক : দি বেঙ্গল এসোসিয়েশান চেন্নাই,
২৯ গিরি রোড, চেন্নাই - ১৭

দক্ষিণের দর্পন বার্তা

মুখ্য উপদেষ্টার কলমে

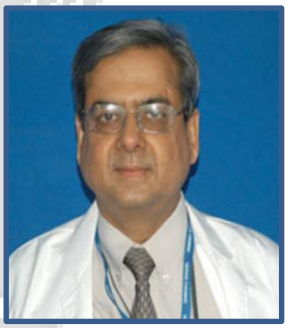

দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই এর কথা এলেই বাঙালির মনে পড়ে CMC, Apollo বা Sankara nethralaya এর কথা, কিন্তু একথা হয়তো অনেকের ই অজানা যে চেন্নাই তে বেঙ্গল এসোসিয়েশান বহুকাল ধরে বাঙালির ভাবধারাকে গতিশীল করে রেখেছে, প্রবাসে ও বাঙালিকে মাতিয়ে রেখেছে, তাদের এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে বাঙালি সংস্কাররের বন্ধনে|

বাংলা বাঙালির নাড়ীর টান, তার ভাব আবেককে প্রকাশ করার এক অনুভূতিশীল মাধ্যম, কিন্তু সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে আমরা যেন কোথায় আমাদের মাতৃভাষাকে আজ হারিয়ে ফেলতে চলেছি| আজকের এই ডিজিটাল মাধ্যমের যুগে আমরা প্রায় লিখতে ভুলে গেছি, এই প্রসঙ্গে নচিকেতার একটি গানের লাইন আজ বার বার মনে হচ্ছে,

এমন কিছু অনভুতি ,যাদের গতি প্রকৃতি
না না ফেসবুকে শেয়ার করা যায় না

যতই ডিজিটাল মাধ্যমের জোয়ার আসুক, মাতৃভাষায় নিজের মনের ভাবকে যেভাবে প্রকাশ করা যায় তা অন্য কোনো মাধ্যমে অসম্ভব, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলা ভাষার কোনো বিকল্প নেই, তাই যুগে যুগে বাঙালির সুখ দুঃখ ভালোবাসা, প্রকৃতির রূপ যখন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, তা এক অনবদ্য কাব্য সাহিত্যিক রূপ পেয়েছে, ওই ভাষাতেই নোবেল এসেছে, তৈরী হয়েছে অস্কার জয়ী পথের পাঁচালি, সেই বাংলা ভাষাকে নিয়ে বেঙ্গল এসোসিয়েশান এর একটি অসামান্য প্রয়াস "দক্ষিণের দর্পন", দক্ষিণী বাঙালির মুখ দেখার আয়না|

কুহেলি সমাচ্ছন্ন শরতের শিউলি ভেজা সকালের বায়ুপ্রবাহের মাঝে ভূগর্ভ উত্তেলিত স্ফটিক স্বচ্ছ জলধারা যখন ফলহীন পান্ডুর মরুক্ষেত্রে প্রোথিত নিবার কিশলয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রাণ স্পন্দনের পুলক সৃষ্টিতে সদানিরত, দশপ্রহরধারিনীর আগমনী বার্তা, খুশির হাওয়ায় মুখরিত আকাশবাতাস, সেই বাতায়নে আমাদের এবারের "দক্ষিণের দর্পনের" আর একবার বহিঃপ্রকাশ, আমি দক্ষিণের দর্পনের মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে নিজেকে অনেক গর্বিত মনে করছি এমন একটি সৃষ্টিশীল কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরে|

এবার আমরা দক্ষিণের দর্পনের ই-সংস্করণ প্রকাশ করতে চলেছি যাতে দক্ষিণের দর্পন ছড়িয়ে পড়তে পারে দেশ তথা পৃথিবীর কোনে কোনে| দক্ষিণের দর্পনের সমস্ত সদস্যবৃন্দকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এমন একটি অভিনব প্রয়াসের জন্য| ভারতবর্ষ বৈচিত্রের দেশ, বৈচিত্রময় আমাদের মাতৃভূমি বাংলা ও, তার যেন সঠিক সমাহার এই দক্ষিণের দর্পনে, কত বৈচিত্রময় ভাবনার লেখনী দিয়ে সেজে উঠেছে আমাদের এই পত্রিকা, আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা আর চেষ্টায় আমরা অনেক এগিয়ে নিয়ে যাবো এই পত্রিকাকে, এই দক্ষিণের দর্পনের ডানায় ভর করে আমরা বাংলাভাষাকে দেব এক বিশ্বব্যাপী বিস্তার, এগিয়ে চলুক বাঙালির ভাষা, দক্ষিণের দর্পনের আয়নায় ভেসে উঠুক হাজার বাঙালির ভাবনা, বাঙালির সংস্কার, বাংলার মুখ|

ডঃ জোতির্ময় বিশ্বাস
মুখ্য উপদেষ্টা, দক্ষিণের দর্পন
বেঙ্গল এসোসিয়েশান, চেন্নাই

দক্ষিণের দর্পন বার্তা

সভাপতির কলমে

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ-মরি বাংলা ভাষা।
মাগো তোমার কোলে, তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালোবাসা.....

সত্যি ই বাংলা ভাষা আমাদের নাড়ির টান, বাংলা ভাষা আমাদের গর্ব| সেই সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা ভাষা আমাদের এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে, বাংলা ভাষা প্রতিটা বাঙালির সুখ দুঃখ ভালোবাসার সাথী, প্রতিটা দিনের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি আমরা বয়ে চলেছি ওই বাংলা ভাষার টানেই | এই ভাবধারাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা প্রকাশ করতে চলেছি দক্ষিণের দর্পনের তৃতীয় সংখ্যা , দক্ষিণের দর্পন নামটা যেন বহুল তাৎপর্য পূর্ণ, আমরা যারা চেন্নাইবাসি, এই দক্ষিণের দর্পনেই আমরা একে অপরের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবো নিরন্তর| আমি গর্বিত যে আমাদের এই তৃতীয় সংখ্যায় বহু স্বনামধন্য লেখক লেখিকারা লিখেছেন, এইভাবেই আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই দক্ষিণের দর্পন একদিন দেশের একটি শ্রেষ্ঠ বাংলা পত্রিকায় উপনীত হবে|

দক্ষিণের দর্পন নিয়ে লিখতে বসে যেন হাজার কথা মনের আকাশে ভিড় করে এলো, এই বাংলা ভাষাই তো ফিরিয়ে দেয় পুরোনো দিনগুলিকে নতুন আঙ্গিকে, স্বপ্ন দেখতে শেখায়, বাঁচার প্রেরণা যোগায়| আমাদের যাপিত জীবনের বছরভোর হিসেবের সালতামামি লেনদেন আর সুবিধা সুযোগের পরাধীন মাটিতে বুকভরা করে থাকে রক্ত মেঘ, হাজার ব্যস্ততা আর জৈবিক চাহিদায় ক্লান্ত আমরা ক্ষনিকের শান্তি পাই বাংলা ভাষাকে আঁকড়ে | বাংলা সাহিত্য আমাদের দিয়েছে অনেক কিছু, দেশের চরম বিপর্যয় থেকে শুরু করে ভারত মাতার পরাধীনতার গ্লানি মুছে দিতে বাংলা ভাষার অবদান আমরা কোনো দিনই ভুলবো না| দেশের আপামর মানুষকে একত্রিত করতে, তাদের দেশাত্মমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করতে গুণী মানুষের কলম থেকে ঝরে পড়েছিল বাংলা ভাষার ঝংকার, যা কাঁপিয়ে তুলেছিল বিশ্বের কঠোর শক্তিকেও | আমাদের দক্ষিণের দর্পনও সর্বাঙ্গিক ভাবে সেই বাংলা ভাষার রীতিকে চলমান করে রাখবে আজীবন আশাকরি|

অনেকদিন পর লিখতে বসে যেন কাব্যিক হয়ে উঠলাম,
শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
শিউলির সুবাস ভেসে আসা, এই কার্তিকের ক্ষেতে
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার
চোখে তার শিশিরের ঘ্রান··· দক্ষিণের দর্পনের শৈশবের হাটাহাটি পা ফেলা| জন্ম লগ্নেই যেন দিকেদিকে তার প্রতিভার আলোচ্ছটা, আশা রাখি দক্ষিণের দর্পন হয়ে উঠবে মৃত্যুঞ্জয়ী, অশ্বিনের শারদপ্রাতে মা দুর্গার আবির্ভাবের মতো দক্ষিণেরদর্পন ও পুনঃপুনঃ আমাদের সামনে আবির্ভুত হবে সব বাধা পেরিয়ে|

শ্রী চন্ডী মুখার্জী
সভাপতি, বেঙ্গল এসোসিয়েসন, চেন্নাই

দক্ষিণের দর্পন বার্তা

সম্পাদকের কলমে

বাংলা সাহিত্যের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চিরকাল সুদূর প্রসারী, বাংলা ভাষার জাদুতে সে হাজার বাঙালিকে একত্রিত করে এক বৃহত্তর পরিবার তৈরি করে নিমেষে, বৈচিত্র্যময় চিন্তা ভাবনার মানুষগুলোকে এক সুতোয় বেঁধে নতুন সৃষ্টির জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে উৎকৃষ্ট মতাদর্শে একে অপরকে আলিঙ্গন করতে শেখায়, মানুষকে ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে, দক্ষিণের দর্পনের পাতায় আপনাদের অভিবাদন জানাতে গিয়ে ডঃ কালামের সেই কটা বিখ্যাত উক্তির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, when there is a righteousness(ন্যায়পরায়ণতা) in heart, there is a beauty in the character, if there is a beauty in the character, there is harmony in the home, if there is harmony in the home, there is an order in the nation and if there is an order in the nation, there is peace in the world. ইতিহাস সাক্ষী যে এই বাংলা ভাষা আমাদের জীবনকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করেছে, সম্প্রীতির বাতাবরণ দিয়েছে আমাদের, আমরা একসাথে চলার প্রেরণা পেয়েছি, সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে শিখেছি। বেঙ্গল এসোসিয়েসন এর সম্পাদক হিসেবে আমি নিজেকে আজ খুব গর্বিত মনে করছি, এমন বহু প্রীতিভার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক বৃহৎ পরিবারের সদস্য হতে পেরে,

আমরা করবো জয়, আমরা করবো জয়
আমরা করবো জয় নিশ্চয়, আহা বুকের গভীর, আছে প্রত্যয়, আমরা করবো জয় নিশ্চয়।

আয়না খুব ছোট্ট একটি শব্দ হলেও, তার ব্যাপ্তি কিন্তু অনেক, আয়নায় আমরা মুখ দেখি, নিজেদের চিনতে শিখি, ওই আয়নায় ই ধরা পড়ে একটি বৃহৎ পরিবারের প্রতিচ্ছবি | আমার ঠিক জানা নেই যে এই "দক্ষিণের দর্পন" এর নামকরণটি কার, কিন্তু আজ সূচিপত্রে চোখ রাখতেই এই নামকরণের যথার্থতা খুঁজে পেলাম নতুন ভাবে | কত গুণী মানুষের সমাহার এই বেঙ্গল এসোসিয়েশান পরিবারে, কে নেই? কবি, গদ্যকার, প্রবন্ধকার, নাট্যকার, রম্য রচয়িতা, যেন ছোট্ট আকাশে হাজার তারার সমাহার | আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের যেকোন সংকটে আমরা সবাই এক হয়ে মোকাবিলা করবো, আমাদের সাধের বেঙ্গল এসোসিয়েসন কে এগিয়ে নিয়ে যাবো উচ্চতর শিখরে |

আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই
আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর
আমি এই বাংলার মায়াভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর
বাংলা আমার জীবনানন্দ, বাংলা প্রাণের সুখ, আমি একবার দেখি, বার বার দেখি, দেখি বাংলার মুখ

প্রতুল মুখোপাধ্যায় এর গানটির সাথেও যেন দক্ষিণের দর্পনের এক নিকট যোগ সাদৃশ্য, এই দক্ষিণের দর্পনেই আমরা নতুন ভাবে কথা বলবো, নতুন স্বপ্ন গড়বো, এতে ভর করেই হেটে যাবো সুদূর পথ, খুঁজে পাবো এক নতুন খুশির দিগন্ত, নতুন নতুন মুখ খুঁজে পাবো এই দর্পনের ফ্রেমে বছরের পর বছর ধরে.....

বিপ্লব ভক্ত

সম্পাদক, বেঙ্গল এসোসিয়েসন, চেন্নাই

দক্ষিণের দর্পন বার্তা

সম্পাদকীয়

সারা পৃথিবী জুড়ে এক কঠিন অসুখে আক্রান্ত আমাদের সবার প্রিয় সবার ভালবাসার বস্তু বই। একের পর এক বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে বইরা একে একে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ত্রিস চল্লিশ বছর আগে কলেজস্ট্রীট সারাদিন গম গম করত মানুষের ভিড়ে। আমরা নিজেরাই দেখেছি মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে বই কিনছে। আমাদের ছোটবেলায় দেবসাহিত্য কুটিরের বা আনন্দ পাবলিশার্সের পূজাবার্ষিকী পুজোর জামা কাপড়ের সঙ্গে অবশ্যই বাড়িতে আসতো আর বড়দের জন্যে আসতো দেশ বা অমৃতবাজার। আমি জানিনা এখন কটা বাড়িতে পুজোর জামা কাপড়ের সঙ্গে পূজাবার্ষিকী আসে। একটা সময় প্রায় প্রতি পাড়ায় একটা করে লাইব্রেরী ছিল যেখানে আজকাল মানুষের পায়ের ধুলো আর পরেনা, বইগুলোতেই জমছে ধুলোর স্তর। বইয়ের ওপর ভাইরাস এর আক্রমন বিভিন্ন দিক থেকে এসে চক্রব্যূহর মত ঘিরে ধরেছে। একদিকে টিভির শতাধিক চ্যানেল আর তার সঙ্গে নেটফ্লিক্স, আমাজন, হইচই আরও কত বিনোদনের হাতছানি তার ওপরে আছে ইউটিউব, হোয়াটস্অ্যাপ, ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম এর আক্রমন। এই বহুমুখী আক্রমনের মধ্যে প’রে আমাদের প্রিয় বইয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

এই রকম এক পরিস্থিতিতে আমরা প্রকাশ করতে চলেছি দক্ষিণের দর্পণের তৃতীয় সংখ্যা। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা আমাদের পত্রিকা এবারে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমেও প্রকাশ করছি যাতে আমাদের পত্রিকা আরও অনেক অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। পত্রিকা এবং বইপ্রেমি মানুষের তরফ থেকে আমরা বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশানের কতৃপক্ষকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ এই পত্রিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্যে।

ধন্যবাদান্তে,

ডঃ তিমির ভট্টাচার্য্য
পত্রিকা মুখ্য সম্পাদক

দক্ষিণের দর্পনের উপহার

কবিতার ডালি

প্রোষিতভর্তৃকা
অদিতি বসুরায় 1

ইচ্ছা
সঞ্জীব মল্লিক 1

আমার মনিপুর
সুতপা দেবনাথ 2

হেমন্তে
নীলাঞ্জনা চৌধুরী 2

আজি এ বসন্তে
পল্লব চৌধুরী 3

কালপ্রতিমা
সৈয়দ হাসমত জালাল 3

স্বপ্ননীল
কৃতীলেখা মন্ডল 4

নির্যাতিত দোসর
সিতাংশু শেখর বিশ্বাস 4

কবিতার ডালি

ব্যর্থতা
কাবেরী সিংহ রায় 5

মিঃ বোস
কমলিকা ভট্টাচার্য্য 6

একপেশে ভালোবাসা
পিন্টু চ্যাম্প মাহাতো 7

ভালোবাসার আগুন
পিন্টু চ্যাম্প মাহাতো 7

সেই মেয়েটি
প্রনব বসু 8

খুশীর ছোঁয়া
রূপা ব্যানার্জী 9

ভালো লাগার সেই ছোট্ট বৃত্ত
পারমিতা রায় 10

গুনিন
স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় 10

যন্ত্রণাবাড়ি
স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় 11

কবিতার ডালি

ময়ূরাক্ষী
সোমা গুহ ঠাকুরতা 11

শ্মশান - (মাটি থেকে – মাটি পর্যন্ত)
শ্যামল ঘোষ 12

কল্পনা
রীতা সেনগুপ্তা 13

গল্পের আসর

দ্রোনাচার্য
বাসুদেব গুপ্ত 14

সহগমন
প্রতিভা সরকার 16

রাজার খেলা
ডঃ অমিত বিশ্বাস 21

গন্ধ
প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য 25

বিশ্বাস অবিশ্বাস
বাসবদত্তা কদম 27

বুড়ো ও কবুতর
প্রনব বসু 30

গল্পের আসর

বাঁক পেরিয়ে রাজপথ
সিতাংশু শেখর বিশ্বাস 40

ভালোবাসার খোঁজে
নবনীতা মুখার্জী 44

অশান্ত সময়ের স্মৃতিকথা
প্রীতিলতা বিশ্বাস 46

হারিয়ে যাওয়া রান্নার গল্প
নন্দিনী পাল 54

রম্য রচনার সম্ভার

মুঠোফোনে মুঠোবন্দী
সবুজ বিশ্বাস 56

প্রবাস জীবন এবং তার আধার
পারমিতা রায় 60

নাটকের মঞ্চ

একটি সাদামাটা বিয়ের গল্প
ডঃ তিমির ভট্টাচার্য্য 63

প্রবন্ধের ডালি

ফুলের গন্ধে যে কবি হাহাকার পেয়েছিলেন
অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় 68

প্রবন্ধের ডালি

সময়ের স্রোতে গানের সাথে
চর্যাপদ থেকে বাংলা ব্যান্ড, রিয়েলিটি শো
মণিদীপা ব্যানার্জী 76

আমার রবি
প্রণতি ঠাকুর 83

বীরসিংহের সিংহ শিশু
শুভ্রা মন্ডল 87

রবীন্দ্রনাথের টাইম ম্যানেজমেন্ট ও ডক্যুমেন্টেশন
ডা. পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার 91

সাধারণ মানুষের অসাধারণ সংস্থা-ISRO
ডঃ সরিৎ দাস 95

Poem

Not Your Normal Type
Jayita Chowdhury 102

The Sun Shines
Swagata Dasgupta 103

Guiding Stars
Pragyaa Saha 103

Story

The Gamechanger
Avik Samanta 105

Article

Vision Of The Blind
Sagar Sengupta 106

Chess: A game I love
Sushmit Banerjee 108

Memories down the lane
Mrs. Rama Sadhu 111

প্রোষিতভর্তৃকা

অদিতি বসুরায়

তোমার উড়ানের সঙ্গে সঙ্গে ঘর ভরে যাচ্ছে
অনুতাপ ও অশ্রুজলে।
তোমার শার্ট ও ডেনিম থেকে উঠে আসছে পলাশরেণু, গুঁড়ো রাগ এবং
অবুঝ অক্ষরমালা।
ছেড়ে যাওয়া যত অভিমান ছুটে যায় রানওয়ে ধরে
আমার উচ্চতা কমতে থাকে তত।
বিরহ হাহা হাসে এসব দেখে –
আসঙ্গের দিন সব স্বপ্নে আসে।

ইচ্ছা

সঞ্জীব মল্লিক

একদিন আমি ছেড়ে যাবো
যা কিছু আমার ভালো, যা কিছু
আমি ভালোবাসি
তুমিও থাকবে সে তালিকায় -
তবে একদম শেষে
ছেড়ে যেতে কী সত্যিই মন চায়
তবু যেতে হয়, না ছাড়লে তোমায় পাওয়া দায়।

মেঘের পরে মেঘ যেদিন জমবে
বৃষ্টি জেনো সেদিন হবেই হবে
বারান্দাতে দাঁড়িয়ে থেকো তুমি
মুকুল চুঁইয়ে তখন পড়বো আমি ঝরে
যদি হাত বাড়িয়ে ধরতে পারো আমায়
বুঝবো, যেমন ছিলাম তেমনি আছি
তোমার মনের কোনায়॥

আমার মনিপুর

সুতপা দেবনাথ

নামেই গনতন্ত্র,কাজে রাজতন্ত্র।

কে মেতেই কে কুকি খ্রীষ্টান,নাগা এরাই আদি পাহাড়ি মানুষ।
হিন্দু খ্রীষ্টান ভোট ভাগাভাগি
ভাগাভাগি পাহাড়ী জমি
যাদের অধিকার বনে তারাই ভিটেমাটি ছাড়া

ঘরে ঘরে আগুন।সহজ শিকার নারী

তাঁর আঁচলেই টান পড়ে।যতো বীভৎসতা তত ভয়
মায়ের সামনে কন্যা ধর্ষিতা
মহাভারতে ভরা সভায় লাঞ্ছিত দৌপদ্রী
আজ ভারতে প্রতিদিন ভরা সভায় বস্ত্র হরণ হয়
যতো ভয় ততো ভোট
যতো ভোট ততো জমি
ব্যাবসাই যাদের মূল উদ্দেশ্য তারাই উসকে দেয় সলতে

বস্ত্র হারায় নারী। পুড়ে মরে ভারতবাসী।
একবিংশ শতাব্দীর আমরা পারিনা মানুষ কে

শুধু মানুষ ভাবতে।

তাই ভাগ হয় জমি ভাগ হয় পাহাড়।

হেমন্তে

নীলাঞ্জনা চৌধুরী

হেমন্তের কমলা রোদে একবার
যেতে চাই পর্ণমোচী বনে
কনে দেখা শেষ রোদে দেখে যেতে চাই

টুপটাপ খসে পড়া বাদামি, কমলা আবরণ।
আদিগন্ত ঝরে পড়া কামনার রঙে

দিনশেষে মেখে যেতে চাই সেই অনির্বচনীয় আলো।

সব পাতা খসে গেলে, রিক্ততার সুউচ্চ মিনার থেকে সব বৃক্ষের মত

রাতজাগা অগণিত তারাদের প্রাজ্ঞ চোখে চোখ রাখার আগে, একবার দেখে যেতে চাই

ফেলে দেওয়া, ছিঁড়ে নেওয়া, ঝরে পড়া, ভুলে যাওয়া রঙিন নির্মোক।

আজি এ বসন্তে

পল্লব চৌধুরী

১) বৃষ্টি ভেজা সকাল
উঠোন জুড়ে
ঝরা আম্র-মুকুল;
মন আকুল!

২) সূর্যোদয়
উদিল রবি
বাহিয়া স্বর্ণ-তরী;
আহা! কী করি!

৩) মধ্যাহ্ন
উতলা মন;
রে, দখিনা পবন!
কি সে কারণ?

৪) বিকেল
সন্ধ্যা আগত
ভাবি যে কত শত;
যায় বসন্ত!

কালপ্রতিমা

সৈয়দ হাসমত জালাল

নৌকোয় নদী পার হচ্ছেন মৃণ্ময়ী
তাই দেখে দুই পাড়ে ঝলমল করে উঠল কাশফুল
এক পশলা বৃষ্টি আর স্বর্ণচাঁপারঙ রোদ্দুর ঝরিয়ে
দুপুরের আকাশ হয়ে উঠল নির্ভার নীল
দূর গ্রামে বেজে উঠছে জন্মান্তরের ঢাক
চিরকালের শিউলিগন্ধ এসে জানিয়ে যাচ্ছে
এখন ঘরে ফেরার সময়

নদীতীরে দাঁড়িয়ে এইসব দৃশ্যের জন্ম দেখছিল কবি
কালস্রোতে ভেসে গেছে ঘরখানি
শব্দে অক্ষরে সুরে ও আগুনরঙে সে গড়ে তোলে
যে কালপ্রতিমার মুখ, আরক্ত অবয়ব
ভেসে যায় সেই অসংপূর্ণ কুহকমায়া
সে আর ফিরবে কোথায়

তার পথে পথে ছড়ানো পাথর, কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত পা
মাথার ভেতরে জ্বলছে সূর্যাস্তের রশ্মিমালা
একটি পালক ফেলে উড়ে যায় দিনান্তের পাখি
কবির বুকের ভেতরে তার ডানার শব্দ জলের শব্দ
দাঁড়ের শব্দ একাকার
তার অঞ্জলিবদ্ধ হাতে এইসব দিনরাত্রির উপচার

সুদূর অতীতের তীরে দাঁড়িয়ে একলা কবি দেখে--
নৌকোয় নদী পার হচ্ছেন চিন্ময়ী তার

স্বপ্ননীল

কৃতীলেখা মন্ডল

এক একটা দিন কাটছে মোদের ঘরের কোণে বসে,
মাঝে মাঝে ছাদে ওঠা একটি দিনের শেষে |

দুপুর বেলা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখি তাই,
বন্ধুরা মোর বলছে এসে খেলতে চলো ভাই |

স্বপ্ন শেষে ঘুম আবেশে চোখ খুলতেই দেখি,
আমি যে সেই ঘরেই আছি হলো মাগো একি |

আর যে মোদের ভাললাগে না ঘরের কোণে বসে,
কবে মা গো ঘুরবো মোরা মোদের সাধের দেশে |

জানলা পানে বসে দেখি রোদ বাদলের খেলা,
কবে মোরা পাবো ফিরে মোদের সাধের ভেলা |

পরম পিতার আশিস যেন বর্ষে মোদের ঘিরে,
দুঃখের কাহন ফেলে যেন আনন্দ পাই ফিরে |

আমার মাথায় রেখো মাগো আশীর্বাদের হাত,
আসুক বাঁধা আসুক বিপদ সইব সবাঘাত |

এমনি করেই পাবো মোরা মোদের সাধের ঘর,
সেই আশাতেই কাটিয়ে দেব কঠিন রণের ঝড় |

আমার ছড়া শেষ হলো ভাই সবাই ভালো থেকো,
মা বাবা আর ভাই বোনেদের আনন্দেতে রেখো |

নির্যাতিত দোসর

সিতাংশু শেখর বিশ্বাস

ছোট্ট গুল্ম, বৃহৎ বৃক্ষ হতে চেয়েছিলো একটি পাখির সাথে |
সেই একটি মিষ্টি পাখির কাকলীতে হাজার বলাকার শুভ্রতা এনেদিতো একদিন ,
তাই শাখা-প্রশাখার এতো বিস্তার আজ |
কাঠঠোকরা চিরকাল রংবেরঙের, দুস্টু পাখিও ভালো সিস্ দিতে জানে |
রংবেরঙের পত্র ধারণকারী শাখায় শাখায় কাঠঠোকরার ক্ষতের চিহ্ন |
ক্ষত শাখায় ভ্রমর গন্ধ শুকে ফেরে, বাসা বাঁধে না, পরজীবী ঠাঁই নেয় |
জীবনের কথা ভেবে ভেবে বৃহৎ বৃক্ষের বেদনা স্মিত হয়ে আছে রাতের শান্ত চিলের মতো |
পরজীবীর মাংসে একদিন ক্ষত ভরে যাবে,
পরজীবীর স্বল্পকালের আয়ুতে, নিজের সুন্দর হওয়া আর
কোনো ধনী ব্যাক্তির ড্রয়িং রুমের পাতাবাহার হয়ে ফিরবে |
পরজীবীটা নতুন করে বাচঁতে শিখবে, কিন্তু ক্ষত ত্বকে আর অঙ্গজ জনন হবেনা কোনো দিন,
শুধু ক্ষতস্থানের ঝরে যাওয়া কালো চামড়া আর কিছু নির্জীব কোষ নিয়ে
যুগের সাক্ষী থাকবে বৃক্ষের পদযুগল | তবুও চলতে হবে.....

ব্যর্থতা

কাবেরী সিংহ রায়

আজ তোমার জন্মদিন বসুন্ধরা মা,
না- না, আজ তোমার জন্মদিন ঠিক কথা নয়,
আজকের দিনে -তোমায় ধুমধাম করে মনে রাখার জন্য,
এদিনের নামকরণ করা হয়েছে- 'বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস'।

তুমি আমাদের মাতৃ- সমা পৃথিবী-
তাই-
তোমাকে রক্ষার স্বার্থে,
পরিবেশের নিয়ম-কানুন রক্ষার স্বার্থে,
পরিবেশগত শিক্ষার স্বার্থে,
পরিবেশবিদদের মনে হল-
আজকের দিনটাই খুব উপযুক্ত- 'বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস'।
তুমি ধরিত্রী মা,
শত কষ্ট সহ্য করেও-
আমাদের ধারণ করে রেখেছো এই ধরা-তে।
তোমার বুকে আমাদের হাসি- কান্না,
তৃপ্তি- আহ্লাদ,সুখ -দুঃখ, প্রেম -ভালোবাসা।

তোমার স্নেহের আঁচলে, তোমার দেহ রসের উত্তাপে, তোমার অন্তরের উষ্ণতায়, ভালোবাসায় -আমরা গড়ে উঠি, বেড়ে উঠি।
আর সেই তোমাকেই-
যেদিন থেকে আমরা হাঁটতে চলতে শিখেছি,
সেদিন থেকেই অত্যাচার করে চলেছি।
কখনো তোমায় আঁচড়েছি তোমায় আঘাত করেছি বারে বারে, তোমায় কাটা ছেঁড়া করে- তোমার হৃদপিণ্ডকে তছনছ করে ,তোমাকে আমরা ভাগ করে নিয়েছি নিজেদের ইচ্ছামত করে।

পৃথিবী তুমি জানো - ধর্মের, নামে ভাষার নামে, দেশের নামে মানুষ মানুষকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। সাদাকালো চামড়ার রং দিয়ে ,গণতন্ত্রের নাম নিয়ে টুকরো টুকরো করেছি আমরা নিজেদের।

অ-মলিন নীল আকাশ কে- আমরা মলিন করে তুলেছি,
নির্মল বাতাসকে দূষিত করে তুলেছি। পরিশ্রুত জলকে কলুষিত করে ফেলেছি। সবুজায়ন কে দহন করে চলেছি।
সর্বোপরি, সর্ব জীবের বাসযোগ্য উপনিবেশ কে আমরা অনাশ্রয়ী করে তুলেছি, আরো আরো নিজেদের প্রয়োজনীয়- অপ্রয়োজনীয় লালসা চরিতার্থ করে চলেছি।

আচ্ছা বসুন্ধরা মা, বলতো - কেন আমাদের মনে হয় না তোমাকে ভালো রাখার কথা?
কেন আমাদের মনে হয় না তোমাকে সুস্থ রাখার কথা?
কেন আমরা পারিনা তোমায় রোজ রক্ষা করতে?

একদিন তোমাকে ঘিরে মানুষের উত্তেজনা -
তোমাকে কিভাবে ভালো রাখবে?
তোমাকে নাকি একদিনে পুনরুদ্ধার করে ফেলবে!
পৃথিবীকে একদিনে পুনরুদ্ধার করে
নতুন পৃথিবী গড়ে তুলবে।

জানো, বসুমতি মা- মানুষ এখন নিজের স্বার্থে-
শুধু তোমাকে না, নিজের মাকেও প্রতিনিয়ত আঘাত করে চলেছে ।
আর তাই নিজেদের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ,ও শিরোনামে নেবার জন্য,
এক একটি নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে নিয়েছে-
যেমন -
মাতৃ দিবস, পিতৃ দিবস, নারী দিবস, ভালোবাসা দিবস, পরিবেশ দিবস, বসুন্ধরা দিবস ইত্যাদি ইত্যাদি,
আরো কত দিবস!

কেন পারিনা - আমরা তোমায় রোজ রোজ রক্ষা করতে বসুমাতা?
কেন তোমায় একদিনের জন্য শিরোনামে নিয়ে আসি!
এটাই আমাদের চরম ব্যর্থতা-
রোজ- রোজ, প্রতিনিয়ত তোমায় রক্ষা করতে না পারা!

মিঃ বোস

কমলিকা ভট্টাচার্য্য

এক বস বদমেজাজি
অফিসে ঢুকলেই কানাঘুষো
ওই এসে গেছে বদরাগী পাজি
বাড়িতে তিনি মিনমিনে বিড়াল
গিন্নির ভয়ে হননা বেচাল
তবে গিন্নির কাছে তিনি
প্রেমিক মানুষ খামখেয়াল
মায়ের কাছে তিনি এখনো
আদরের গোপাল
বাবার কাছে ছোটোবেলার খুঁটিনাটি
সারানো ইঞ্জিনিয়ার খোকাটি।
মেয়ের কাছে আদরের ডার্লিং ড্যাডি
ছেলের কাছে ক্যাশ ATM মেশিন
দিতে permission
একটু কড়া, আর কি
বোনের কাছে তিনি
বাড়ির বড় মাথা
ভাইয়ের কাছে তিনি লক্ষ্মণের দাদা
বন্ধুদের গ্রুপে তিনি
পাজীর পা ঝাড়া
পড়শীর কাছে তিনি
এক unsocial মানুষ
কেউ আবার বলে নাকি character লুজ
দোকানির কাছে তিনি কঞ্জুস ক্রেতা
সিগনালে ফুল বেচা বাচ্চা মেয়েটির কাছে তিনি ওর দাতা
একই অঙ্গে এত রূপ নিজের সৃষ্টিতে হাসেন বিধাতা।

একপেশে ভালোবাসা

পিন্টু চ্যাম্প মাহাতো

না বলে কত কথা
বলে দেওয়া যায়,
না চেয়েও কত কিছু
চেয়ে নেওয়া যায়।
না হেসেও হাসি মুখে
মেনে নেওয়া যায়,
না এলেও আসা পথে
ঘুরে যাওয়া যায়।
আর যদি কখনো ভাল বাসতে পারো-
না থেকেও তবু মনে
মিশে যাওয়া যায়,
না ছুঁয়েও অনুভবে
ছুঁয়ে থাকা যায়,
না দেখেও তাকে
চোখে ধরে রাখা যায়।
আর যদি কখনো মন চিনতে পারো-
কাছে না থেকেও
সুখে ভেসে যাওয়া যায়,
না বলেও কত কথা
বলে দেওয়া যায়,
না চেয়েও কত কিছু
চেয়ে নেওয়া যায়।

ভালোবাসার আগুন

পিন্টু চ্যাম্প মাহাতো

লোকে ভাবে আমি পাগল
শুধু এদিক ওদিক ছুটে বেড়াই।
তারাতো কেউ বোঝেনা
আমি যে তোমায় খুঁজে বেড়াই।

হারিয়ে ছিলে পথে
সে এক ঝড় বৃষ্টির রাতে
এখনো খুঁজে চলেছি আমি তাই
যদি এই পথে আবার দেখা পেয়ে যাই ।

সেদিন রেগে ছিলে তুমি খুব,
এখনো অজানা আমার সে কারণ,
সেদিন পারিনি বোঝাতে তোমায়,
কথা বার্তা হয়ে গেল বারন।

সেদিন চলে গেলে তুমি ওভাবে,
একবার ফিরে দেখলেওনা আমায় ,
অভ্যাস টা যে বদলে দিয়েছ তুমি
এখন যে ভয় লাগে একা থাকায়।

প্লিজ ফিরে এসো তুমি আবার
আগের মত জড়িয়ে ধর আমায়,
প্রেমের আগুন মনে ফুটে পড়ছে
পরিপূর্ণ কর তুমি ভালবাসায়।

সেই মেয়েটি

প্রনব বসু

অনেক দিন হলো তোমার সংগে দেখা নেই
তুমি কি সেই রকমই এখনো আছো?

সেই শাড়ীর আঁচল কাল সাদা ডুরে
বিষাক্ত শঙ্খিনী সে
শঙ্কাহীন সটান বেদিনী তোমার বিদ্যুৎ শরীরে
ফুঁসছে সর্বক্ষণ
ফুঁসছে তোমার পিঠে লুটিয়ে পড়ে
উদাসীন অ্বহেলায় ধূসর বেণী
সার্কাসর মাষ্টারের নির্মম চাবুক সে তখন

সেদিন ভরে ছিল তোমার উঠোন
রুক্ষ শুক্ষ কিছু কঙ্কাল শিশু কিশোর কিশোরী ক'জন
বয়স তাদের হবে আট থেকে বারোর ভিতর
মৃত মাছেদের চোখ তাদের গভীর কোটর
দেখেও দেখেনা কিছু সব সময় মাথা নীচু
মাটির ওপর
স্থূল মাংসপিণ্ড একদলা তাদের জিভের আদলে
অলস অনড় মাঝে সাঝে যদি কিছু বলে
অস্ফুট শব্দ শুধুই বঞ্চ নার বুকের ভাষা তাদের
মূক থেকে যায় অন্ধ গুহার গভীরে
সামনে এগোতে ভয় কি জানি কি হয়
নীরক্ত বিশীর্ণ তাদের দুটো হাত
নীরবে কাঁদে
এখনই পড়েছে বাঁধা দাসত্বের ফাঁদে
ছন্দহীন দুটো পা দ্বিধাগ্রস্ত সমস্ত সময়

তুমি সেদিন শুনিয়ে ছিলে শেকল ছেঁড়ার গান
সেই সব মানুষের কথা
কঠিন বাসাল্ট বিশ্বাসের জমিতে দাঁড়িয়ে একদিন যারা
নিজস্ব ভাষায় দিয়েছিল সূর্য্যের সন্ধান

চেনাচ্ছিলে সেদিন তাদের প্রতিটি রাস্তার নাম
সামনে এগিয়ে যাবার বাধাহীন নিশানা
বলেছিলে প্রতিটি পদক্ষেপে লেখা হয় ইতিহাস
ভালবাসার আপন অন্তরের ঠিকানা

সেদিন দেখেছি আমি তাদের চোখে
হাজার প্রদীপের মেলা
বুকের স্প্ ন্দ্ নে দ্রিমি দ্রিমি বাজছিল
নতুন জীবন গড়ার স্ব্ প্নের খেলা
তারপর একদিন আকাশ অন্ধ্ করে
চরাচর ছিদ্রহীন পর্দায় ঢেকে
নেমেছিল বৃষ্টি অঝোরে
গভীর রাতে সেদিন শামুকের শল্কথায়
কালো এক গাড়ি শ্বাপদের জিঘাংসায়
নিঃশব্দে থেমেছিল তোমার দুয়ারে

সেইদিন থেকে তুমি ঠিকানা বিহীন
একলা রোদ সারাদিন উঠোনে তোমার থাকে অপেক্ষায়
শিশুরাও আসেনা আর খেলার ছলে
বাতাস বয়ে যায় চুপি পায়
কেবল তোমার কথা বলে
তবু জানি যেখানেই থাকো তুমি
এখনো পরনে কাল ডুরে শঙ্খিনী আঁচল
ফুঁসে ওঠে তোমার বিনুনি
চোখেতে আগুনের ঢল

খুশীর ছোঁয়া

রূপা ব্যানার্জী

তোকে ছুঁতে ইচ্ছে করে খুউউউব
যখন তখন , যেখানে সেখানে , যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ |
আচ্ছা ঝগড়া হলে ছোঁয়া যায় !
অনেকটা ঝড় বৃষ্টির মতন -
হৈচৈ , চেঁচামেচি , মন কেমন , কান্নাকাটি !
তারপর গুমোট কেটে গেলে -
মেঘে মিশে চাঁদের হাসি |

তোকে ছোঁয়া অনেএ এ এ ক দূরত্বে -
তারাদের ভিড়ে ছোট্ট একটা সুখ |
লুকিয়ে থাকে আলোকবর্ষ পেরিয়ে দূরে এ এ অনেক দূরে|

তোকে দেখতে মানা নেই ,
যেমন খুশি দেখা চলে
ওই নিষিদ্ধ বইয়ের মত , আড়চোখে |
নইলে লোকে নষ্ট বলতে পারে |

তোকে ছুঁতে বাহানার আড়াল খুঁজতে হয় |
আচ্ছা আর কি ভাবে ছুঁতে পারি তোকে !
অবশ্যই মাটি থেকে আকাশের দূরত্বে |
অভিমানে কথা না বলে ছোঁয়া যায় !
দু ফোঁটা চোখের জলে , হাসিতে , প্রলাপে !

তোর সাথে মিশে যেতে চাইলে কি বৃষ্টি হতে হয় ?
নাকি ভীষণ গম্ভীর শব্দে বিশ্ব কাঁপিয়ে বজ্রপাত !
যদি শান্ত নদী তোকে ছায়ায় বেঁধে রাখে ?
যদি ঠিক দুপুরে ছায়ার মতো পায়ের কাছে থাকে !

ঠিক জানিনা কেমন করে তোকে চাওয়া যায় ,
ঠিক জানিনা কেমন করে তোকে পাওয়া যায় !
শুধু জানি , আমার কেবল ইচ্ছে করে খুব ,
তোকে নিয়ে আকাশ কুসুম রচি -
মন খারাপের বিকেল গুলোয় হাতটা ধরে থাকি |
কান্না পেলে বুকের মাঝে মুখটা চেপে রাখি ,
হয় যদি হোক সেখানটাতে ছোট্ট একটা নদী |

আকাশ - বাতাস - ফুল - নদী - মাঠ সব মিলিয়ে , যদি একটা তুই হতিস !
হারিয়ে যেতাম যেমন খুশি ,
কেউ পেতনা হদিস |
মন খারাপকে বলে দিতাম
চুপটি করে বস |
এখন আমি একাই রাখি আমার খুশির খোঁজ |

ভালো লাগার সেই ছোট্ট বৃত্ত

পারমিতা রায়

আমার ছোট্ট বৃত্তই ভাল লাগে,
ছোঁয়া আমার চেনাই ভাল লাগে।
আয়োজন, আড়ম্বর, জাকজমকের চেয়ে
সহজ-সরল আন্তরিকতা ভালো লাগে।
উপহারের থেকে বেশী সঙ্গ ভালো লাগে।
নিজের কথা বলার চেয়ে বেশী
মানুষের কথা শুনতে ভালো লাগে।
খোলা মাঠ, সমুদ্রের ধার, রাতের আকাশ, পাখীর ডাক,
পুরানো গান, চায়ের দোকান, পাহাড়ের সৌন্দর্য
এসব আমার ব্যাক্তিগত দুর্বলতা বরাবরের।
নীরবতা, পিছুটান, মানুষের আন্তরিকতা ভালো লাগে।
চালাক, চতুর নই; আজকের দিনে একটু ব্যাকডেটেড হলেও
আমার এই ভার্সনটাকে আমি খুব ভালবাসি।
যা কারোর জন্য কোনোদিন বদলাইনি
যা কারোর জন্য কোনোদিন বদলাবোও না।

গুনিন

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখার কথা বলেও না দেখে
রক্ত গুনে ফেলি
দার্জিলিং বিষয়ক কবরখানা
উৎসবে গোলাপি রিবনে উড়ু উড়ু
গান পাচ্ছে খুব
টানা গলার গানগুণ
চা বাগান ডিঙিয়ে আসছে কমলাবনের
বাতাস বা তাস
নিভতে নিভতে জ্বলতে জ্বলতে
গানশাড়ি
গানসারি
কমলা কমলা ঝাঁজ

যন্ত্রণাবাড়ি

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়

সাদা গোল দাঁড়িয়ে আছে
পাঁচিলে বেড়াললাফ তিনভাগে
তিনটে রাস্তা
শূন্য
দিকখোলা ট্রাক হেঁটে যাচ্ছে
দীর্ঘ নাক চওড়া চোয়াল ভারি বুট
বাড়ির জানলা থেকে ঝুপ সরা আলো
বঁড়শি ঝুলিয়ে রাখে চার,টোপসহ
যন্ত্রণাবাড়ির বাঁয়ে গর্ত ও জঙ্গল
চাঁদভাঙা মস্ত চাক রাত আসার আগে
হয়ে ওঠে রাতচরার শান্ত আস্তানা

ময়ূরাক্ষী

সোমা গুহ ঠাকুরতা

নৌকা কেন যে থেমে
জল কেলীতে ব্যস্ত!
আজ কিছু দিন পারাপার স্থবির
অনন্ত আকাশে দৃষ্টি ন্যস্ত,
আকাশ সমীক্ষা, চিৎ হয়ে তারাদের ভীড়,
নিকষ কালো অমাবস্যার মেঘমুক্ত সীমাহীন
মাঝি ভাবে কত হল পারাপার!
কত বৌ বর চেলি টোপর
কত ছাত্র এপার ওপার
সওদার ব্যবসায়ী, জীবনের পূঁজি
সাবধানী মূলধন অল্পেতে সুখী
ছোটো এ নৌকায় তার লক্ষ গতিবিধি কত ইতিহাস
পারের নিকটে চড়ায় প্যাকপেকে হাঁস
এ গাঁ ও গাঁয়ের রোজনামচা,
অজস্র চাপান উতোর ।
বহু ভয় অকৃপণ আনন্দের সাক্ষী
ঝড় ঝঞ্ঝা সামলেছে ময়ূরাক্ষী।
বড়ো লম্বা এ জীবন - এপার ওপার করে কাটানো
আকাশের পানে তাকানো
বাতাসের গতি নিরীক্ষণ
দাঁড় ধরা দরকার না শুধুই জলের টান!
"পশ্চিম কোণে র মেঘের ভয়
রোজকার এ চিন্তার ক্ষয়
শুধু জলের ওপরকার তথ্য
গভীরে চোখ সেধাইনি কখনই
নদীটার কোনো কোণে
চড়া পড়ে যাওয়া জলে যাওয়া হয় নাই "।
চড়ার দুধারের নদীকে ছোঁয় নি তার হাত
নদী তাকে দিয়েছে অগাধ;
নির্ভর আশ্রয় ;
নিজেকে বাঁচাতে ,
আকাশ , নদীর ঢেউএ চোখ রেখে
জোয়ার ভাটার ক্ষণ মেপে পারাপার।

বাশা মিঞা ভাবনায় ডুবেছে -
"ছাওয়ালেরা বেড়েছে -
ঘরের মানুষটিও সংসারী পাকা"
এবার সে নৌকা ভাসাবে
ময়ূরাক্ষীর, কোণায় , চড়ার অলিতে গলিতে পা রাখবে;
জলের ঐশ্বর্য এর হিসেব নেবে।
নিজেকে সময় দেবে
"বড্ড পরিশ্রমে কেটেছে এই বড় বৃক্ষময় কাল
এবার আমার সকাল
ছোটো ছোটো নদী উপনদী পরিক্রমা
নদীকে আপন করে চেনা
তারপর মিলে যাবে ভগীরথে-"
এতকাল যে কোল দিয়েছে ওকে
কেমন করে ভুলেছিল তাকে।।?

শ্মশান - (মাটি থেকে – মাটি পর্যন্ত)

শ্যামল ঘোষ

আজ শ্মশান ঘাটের ছাই এর কয়েকটা পরত ঘেঁটে এলাম,
কিন্তু কোনো পদবি, কোনো দম্ভ বা কোনো ঐশ্বর্য কাজে এলো না
আজ আমি বাস্তবিক নিঃস্ব সর্বহারা ভিক্ষুক একাই থেকে গেলাম।।

আশারুপি প্রভাতী সূর্যের কিরণ কে দেখে
কলুষিত প্রগাঢ় নিশা বলছে কেন যাই
চিতার আগুন এখন নিস্তেজ, শিশিরে ভেজা ছাই।
ওগো সজনী , মোর প্রিয়দর্শিনী
বলতো তোমাকে এখন কোথায় খুঁজে পাই।।

তুমি গেছ চলে কোন অজানা পথের অন্তহীন যাত্রায়।
মাটির মানুষ মাটিতেই গেছ মিশে
করে মোরে শূন্য আরণ্যক পূর্ণমাত্রায়।।

চিতার আগুন তোমার তনুকে যতই স্পর্শ করেছে
ততই কেড়ে নিয়েছে ধমনীতে আমার রুধির উষ্ণতা।

আফসোস সেদিন পদবীর লোভে তোমায় করেছিলাম নগণ্য
পদ-পদবি, ধন-ঐশ্বর্য সব থেকেও আজ আমি একা, ভীষণ একা –
ক্ষমাহীন ভুল যে আমি করেছিলাম সেদিন

তোমার অন্তিম যাত্রায় সঙ্গী হতে পারলাম না
আমি যে আজও 'স্বার্থপর'
মৃত মন, দগ্ধ শরীর- চেষ্টা করেও আজ আমি মরতে পারলাম না।।

কল্পনা

রীতা সেনগুপ্তা

কল্পনার জগতে ঢুকলে
যখন যা খুশি করা যায়
মেঘের মাঝে পাখনা মেলে
পাখির মত ওড়া যায়
হিমালয়ের চূড়ার ওপর
খালি পায়েও ওঠা যায়
সমুদ্রের গভীর জলে
তিমির পিঠে চড়া যায়
কল্পনাটা এমন জিনিস
না স্বপ্ন না সত্যি
কল্পনার আগুন লাগলে
গুলে না কারুর পিত্তি
কল্পনার সঙ্গ নিয়ে
যাও যেখানে খুশি
কল্পনাই ফুটিয়ে রাখবে
তোমার ঠোঁটের হাসি ।।

ড্রোনাচার্য

বাসুদেব গুপ্ত

জানলার সামনেই একটা ভীমরুলের চাক। ভীমরুল মাথা গরম জীব। কখন রেগে দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলা মুস্কিল। মৌমাছি শান্তিপ্রিয়। সীমিত হিংসা। একবার কামড়িয়ে তার হুল যায় খসে। ভীমরুল কামড়াতেই থাকে। বারবার।

বৈশাখী সাবধানে থাকে। ঘাঁটায় না। সে জানে, ভীমরুল মধুকর নয়। মানুষের কাজে লাগে না। সারাক্ষণ নিজের কেল্লা পাহারা দেয়। আর শত্রু দেখলেই আ-ক্র-ম-ণ।

বৈশাখীর বর সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ছোটখাট কলেজে পাস। তাই বিদেশ যাওয়া দূরস্ত, গ্রাম জঙ্গল নদীর চরায় তার কর্মস্থল। বৈশাখী যায় সঙ্গে। রোদে ঘুরে ঘুরে সুমন্তের চেহারা যেন রামকিঙ্করের ভাস্কর্য। বৈশাখীই বলে। শান্তিনিকতনে পড়া, এসব ও জানে। মাটি পাথর সিমেন্ট জঙ্গল এসবের মধ্যে কখনও ওঠে ব্রীজ, কখনো বাঁধ, কখনো জঙ্গল কেটে জেগে ওঠে হাইওয়ে। বিশ্বকর্মা। সুমন্তের আদরের উত্তরে বৈশাখীর আশ্লিষ্ট গলায় ঐ শব্দটা সুমন্তের মন ভরিয়ে দেয়।

নতুন এক যন্ত্র হয়েছে ড্রোন। যখন আকাশে ওড়ে, ঠিক ভীমরুলের মত রাগী দেখায় তাদের। নিরীহ রোগাসোগা একটা লোক সেটাকে আকাশে ওড়ায়, চারটে পায়ে বাঁই বাঁই করে চাকা ঘোরে, আর সেটা হুস করে উড়ে গিয়ে আকাশ থেকে ছবি তোলে। একটা পর্দায় দেখা যায়, বড় বড় মাটি কাটার যন্ত্র মাটি কাটছে, ভরাট করছে, বুল্ডোজার দিয়ে সমান করে দিচ্ছে। মাথায় হলুদ হেলমেট পরা লোকজন, তারই মধ্যে কোথাও রয়েছে সুমন্ত। বৈশাখীর কাছে এমন একটা ড্রোন থাকলে সে নজর রাখত। সুমন্ত রোদে রোদে বেশী ঘুরলে, বাড়িতে তৈরী রাখত লস্যি।

আবদার? সুমন্ত হাসে এমন বোকার মত কথা শুনে। ড্রোন তো দোয়েল পাখি নয়, বরং ভীমরুল বললেই ভালো। ইউক্রেন ছারখার করে দিচ্ছে এই ড্রোণ। ঘরের জানলার সামনে এসে মিসাইল ছুঁড়ে দিচ্ছে, ভিতরে ঝলসে যাচ্ছে তুলতুলে নরম শিশু। ড্রোন যারা চালায় তারা মেডেল পাচ্ছে, দূর থেকে রিমোট দিয়ে ঘর জ্বালানোর জন্য।

বৈশাখীর এসব শুনতে ভালো লাগে না। এই তো ভালো, বিশ্বকর্মা হয়ে তার সুমন্ত নদীর বুকে বাঁধ দিচ্ছে, ব্রীজ দিয়ে জুড়ছে এপার ওপার। মানুষ কেন যে মানুষ মারে, তার শান্তিনিকেতনী মাথায় তা ঢোকে না।

মাথায় না ঢুকলেই যে হবে না তা তো নয়। কোয়ান্টাম থিওরি কেউ বোঝে না, কিন্তু তাই দিয়েই চলছে বিশ্বজগত। ইলেক্ট্রনিক্স। ইন্টারনেট, হোয়াটসঅ্যাপের বীণ।

সেদিন সকাল বেলায় হইচই। পিলপিল করে একদল লোক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে তীরধনুক নিয়ে। তারা কিছুতেই নদীতে বাঁধ বাঁধতে দেবে না। তাহলে নাকি তাদের ঘর যাবে ভেসে, জঙ্গল যাবে শেষ হয়ে। সবকটা মাটিকাটা গাড়ীর ওপর উঠে বসে আছে। নামবে না।

আবদার। এরা ভাবে কি? দেশ কী করে এগোবে তাহলে? আর বোকা লোকগুলোর এত সাহস হয় কী করে? পিছনে লোক আছে। বই পড়া, মাথায় শয়তানী কিলবিল করা লোক।

যত তীর ধনুক, তত বন্দুক। কোম্পানির ম্যনেজার থানায় খবর দিতেই, অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে শান্তিরক্ষকরা চলে এসেছে। তারপর অল্পস্বল্প গুলি। তাতেই কাজ। হোমিওপ্যাথির দেশ। যত কম ওষুধ তত ভালো কাজ। তিন চারটে লাশ আর চিরুণী তল্লাশি।

সুমন্ত ফোনে সব খবর দিয়ে যাচ্ছিল বৈশাখীকে। ঘরে সিঁটিয়ে বসে ও থরথর করে কেঁপে গেল যতক্ষণ না সুমন্ত বাড়ী ফিরল। সুমন্ত ওকে বোঝালো কেন এটা প্রয়োজন ছিল। অনেক মানুষের ভাল করতে গেলে কিছু মানুষকে হারাতে হয়। বিশেষ করে তারা যদি বিকাশের সামনে এসে পথ আটকায়।

বৈশাখী বুঝল আবার বুঝল না। ওর মন খুঁতখুঁত করছে। আজ রান্না বেশি নেই। খিচুড়ি আলুভাজা আর ওমলেট ব্যাস। একটাই ওমলেট, সেটা থেকে দুভাগ করে পাতে তুলতে তুলতে বলল।

'আর ওই চিরুণী তল্লাশি যে বললে সেটার কী দরকার?"

"না হলে উকুনগুলো বাছবে কি করে? যারা লোকগুলোকে খেপায় তারাই তো আসল দোষী"

"ধরে কী করবে? ওদেরও মেরে দেবে নাকি? আমার কিন্তু ভাল লাগছে না "

"আরে না না, কোর্টে তুলবে তার পর আইন আইনের পথে চলবে। জেল হবে হয়ত" সুমন্ত সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'চলো বাইরে বসি, আজ চাঁদ উঠেছে, কতদিন তোমাকে চাঁদের আলোয় দেখিনি। "

"নাগো না ভালো লাগছে না।"

সুমন্ত পুরুষের জোর খাটায়। জড়িয়ে ধরে একটা চুমু দেয়, মুখটা তুলে ধরে বলে, ঠিক আছে, এই তো আমার চাঁদ, আর কী চাই?"

পাঁচিলের পাশে একটা ধপ করে বড় কাঁঠাল পড়ার মত আওয়াজে ওদের খেলার বিঘ্ন ঘটে। সুমন্ত বাইরে বেরোয় টর্চ নিয়ে, হাঁক দেয় "চৌকিদার, চৌকিদার, দেখো কৌন"

একটা রোগা শরীর, দুটো জ্বলজ্বলে চোখ, আর একটা ছোট্ট ইস্পাতের নল, ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে সুমন্তের পিছনে দাঁড়ায়, বলে, 'প্লীজ মৎ চিল্লাইয়ে।'

বৈশাখী জানলা দিয়ে দেখতে পেয়ে সোজা দৌড়ে এসে, রিভলভারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা কেড়ে নেয়। তারপর চাপা স্বরে বলে "কে তুমি? কী চাই?"

"বন্দুক দিয়ে ভয় দেখাবেন না, ওটা নকল। প্লীজ দাদাকে বলুন না চেঁচাতে। আমাদের ধরে নিয়ে গেলে ওরা মেরে ফেলবে।"

সুমন্ত কথা না শুনে চেঁচিয়ে ওঠে। দূর থেকে আওয়াজ আসে অনেক লোকের। একটা পুলিশের গাড়ীর আলো এসে ছিটকে যায় জানলার শার্সিতে।

"কী হয়েছে? কুছ দিক্কত? ওই বদমাশ গুলো ঢুকে যায় নি তো?" এক লাঠিধারী এগিয়ে আসে।"

বৈশাখীর কী যে হয়! হাতের বন্দুকটা ছুঁড়ে মারে ভীমরুলের চাকে। ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন উড়ে যায় আলো লক্ষ্য করে, ছেলেটির হাত ধরে ঠেলে দেয় ঘরের মধ্যে। তারপর চেঁচিয়ে ওঠে,

"ততইয়া, ভাগ জাইয়ে, ভাগ জাইয়ে।"

সুমন্ত শাড়ীর আঁচলে মাথা ঢেকে দৌড়য়, বৈশাখী আজ ড্রোনাচার্য।

সহগমন

প্রতিভা সরকার

বিশাল দিঘির চারপাশটা ঝোপঝাড়, গাছ আগাছায় ভর্তি। ভোর না হতেই পাখির কিচিরমিচির কানে তালা ধরিয়ে দিতে থাকে। পুব দিক থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয় সূর্য ওঠার আগে, সারা শরীর যেন শীতল হয়ে যায়। মণিকণা ধোয়া গামছা, শাড়ি, সায়া, বাঁধানো ঘাটে রেখে জলে ডুব দেয়, কোনোদিন খেয়াল হলে এপার ওপার করে। তার শ্বশুরের আমলের মাছেরা গায়ে ঠেস দিয়ে ঝগড়া বাঁধাতে চায়, আদ্যিকালের জলঝাঁঝরিরা ভাসতে ভাসতে দূরে যাবার আগে নরম আঙুল ছুঁইয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করে।

শীতে গ্রীষ্মে খুব ভোরে স্নান করা মণিকণার পঁচিশ বছরের অভ্যাস। মাত্র আঠার পেরনো বধূটি বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে দুটো জিনিসে খুব অবাক হয়েছিল, কলকাতার এত কাছে প্রকৃতির এতো অকৃপণ প্রাচুর্য, আর গেরস্ত বাড়িতে গৃহদেবী রূপে ঘোরা কৃষ্ণা কালী মূর্তির নিত্য পূজা পাওয়া। তার বাপের বাড়িতে লক্ষ্মীদেবী ছাড়া নিয়মিত কেউ পূজিত হতেন না। সন্তোষী মায়ের সিনেমাটা খুব জনপ্রিয় হবার পর মা শুক্রবার টক জিনিস খেত না, আমিষ রান্নাঘরে ঢোকা বন্ধ। সন্ধেবেলায় সন্তোষীব্রতের কী নিয়ম ছিল, মণিকণার মনে নেই। তবে এখনও তার পরিষ্কার মনে আছে কোমর অব্দি কাশফুলের মতো সাদা একঢাল চুল খুলে, কাঁচা টাকা সাইজের টকটকে সিঁদুরের টিপ পরিহিতা তার শাশুড়ি মা পেতলের মালসায় ভোগ ঢেকে উচ্চকণ্ঠে মন্ত্র পড়তে পড়তে সন্ধ্যায় পুকুরের দিকে যেত শিবাভোগের ব্যবস্থা করতে। গ্রীষ্মের উথালপাথাল হাওয়া, শীতের কুয়াশা বা বর্ষার অবিরল বৃষ্টিতে তার আবছা হয়ে যাওয়া দেহরেখার দিকে তাকিয়ে মণিকণার মনে হত সে কোনো অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছে।

তারপর গঙ্গা দিয়ে কতো জল গড়াল,

কুলদেবীকে মন্দিরে রেখে শ্বশুর শাশুড়ি দুজনেই মারা গেলেন, আক্ষেপ নিয়ে গেলেন একমাত্র পুত্রের কোনো সন্তান হল না বলে। দূরের স্টেশনে কলকাতা যাবার ট্রেনের সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল নিত্যযাত্রীর ভিড়, জন খাটার মুনিষ অকুলান হলে হাড় পাঁজরা বার করা বাড়িটার গায়ে যেটুকু পলেস্তারা অবশিষ্ট ছিল, খসে খসে পড়তে লাগল। শুধু একরকম থেকে গেল ভূতে পাওয়া এই অট্টালিকা, লাগোয়া ঐ প্রকান্ড দিঘি আর তার পেটের ভেতরের জলজ প্রাণ সব। একরকম থেকে গেল এ বাড়ির নিঃসঙ্গ মানুষদুটো আর জালের মতোই তাদের ঘিরে ধরা নিবিড় একাকীত্ব, যার ভেতর বাস করতে করতে চাওয়াপাওয়ার হিসেব পরিষ্কার মিলিয়ে নেওয়া যায়। সারাটা যৌবন দাপটে কাটাবার পর এখন নিজের অক্ষমতার কারণে অপরাধবোধে ভোগা সুদর্শন ভাবে, তার কিছু হয়ে গেলে মণিকণার কী হবে ! বয়সের অনেক তফাৎ তাদের দুজনের মধ্যে। মণিকণাই আজকাল ভাবে, মা কালী চাননি, সন্তান হয়নি। তিনি চাইলে আমরা সুস্থভাবে আরও অনেকদিন বাঁচব। নিজের একাকীত্ব, স্বামীর খামতি নিয়ে ভয়ংকর কিছু অভিযোগ করার কথা তার ভেতর থেকে আসেনি কখনও। নাহলে ডাক্তারবদ্যি তো কম হয়নি। স্বভাবে সরল আর ভাগ্যবাদী মণিকণা এ বাড়ির আধিভৌতিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিতে অন্য কিছু ভাবার সময়ই পায়নি বোধহয়।

অনেকদিনই হল মণিকণার ওপর শিবাভোগের ভার। ঠিক শাশুড়ির মতোই সন্ধেবেলায় পট্টবস্ত্র পরিধান করে সে প্রথমে গৃহদেবীর পূজা করে, তারপর মাটির সরায় ভোগ নিয়ে এলোচুলে সিঁদুর মাখামাখি হয়ে দিঘির দিকে যায়। দূরে দাঁড়িয়ে বিশাল পেতলের প্রদীপ জ্বেলে পথ দেখায় এখনও টিঁকে থাকা সর্বশেষ প্রজা মকর মন্ডল। একে তো তার বয়স হল প্রায় আশি, উপরন্তু মকরের সাতকুলে কেউ বেঁচে নেই। দিঘির উত্তর পশ্চিম কোণায় একটি মাটির চালায় সে অনন্ত কাল ধরে বসত করছে। আপন মনে রাতবিরেতে মরে যাওয়া ছেলের সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলে। ছেলেটিনাকি নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল,পালাবার সময় পুলিশের গুলিতে স্টেশন রোডে লুটিয়ে পড়ে। এখন ভট্টাচার্য পরিবার ছাড়া মকরের আপন বলতে এ জগতে এক ভাইপো আর তার বৌ।

সুদর্শন প্রায়ই বলে এই শিবাভোগের রীতি তাদের শাক্ত পরিবারে কতদিন ধরে চলে আসছে, কেউ জানে না। কেনই বা শারীরবৃত্তীয়ভাবে নির্দিষ্ট দিন ক'টি ছাড়া গৃহকর্ত্রীরাই এর অধিকারী তাও কেউ জানে না। শাস্ত্রে বলে সাধক বা কালী উপাসক গৃহীদের প্রত্যেক রাত্রিতে শিবা বা শেয়ালদের মাংসপ্রধান ভোগ ভক্ষণ করাতে হবে। মাংসের বদলে মাছ হলেও চলবে। শ্মশানে বা গৃহে যেখানেই হোক না কেন, কালী কালী বলে হাঁক দিয়ে বেলগাছের তলায় নৈবেদ্য রাখলেই দলে দলে শিবাকুল বেরিয়ে এসে তা গ্রহণ করে। দেবী কালিকা সঙ্গী পরিবৃত অবস্থায় শেয়ালের রূপ ধরে নৈবেদ্য গ্রহণ করেন, সন্তুষ্ট হলে ঈশান কোণে মুখ তুলে রব করেন। তাতে শুধু নৈবেদ্য প্রদানকারীর মঙ্গল তা নয়, যতদূর সেই রব শোনা যাবে, ততদূর অবধি সর্ব শুভ হবে। এইসবই কুলপ্রথা বলে জেনে এসেছে মণিকণা। সে এও জানে শিবাভোগের খুঁটিনাটি পুরুষদের দেখাও বারণ,

তাই মকর বহুদূরে প্রদীপ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, তাতে অন্ধকার যাক আর নাই-ই যাক, শক্ত করে ঘাড় যতটা পারে পেছন দিকে ঘুরিয়ে রাখে। অন্ধকারে ঘাস মাড়িয়ে মণিকণা চেনা রাস্তায় এগোয় আর স্তোত্র পাঠ করে, ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুখকেশীং চতুর্ভুজাম/ কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুন্ডমালাবিভূষিতাম---

তার মনে পড়ে যায় শাশুড়ি তাকে পুরুষের বর্জনের এই গোপন রহস্য খুলে বলেছিলেন একদিন। শিবাভোগ দেবার অধিকারী নারীর দেহ এই রীতি পালনের সময় দেবী কালিকার সম্পূর্ণ অধীন থাকে। বহু যুগ আগে ভট্টাচার্য বাড়ির কোনো এক কর্ত্রীর দেহে নাকি শিবাভোগের সময় দেবীর ভর হয়। তার স্বামী যেহেতু জরুরি কাজে দেশান্তরে, আলো দেখাচ্ছিল এক অতি বিশ্বাসী কর্মচারী। হঠাৎ সে পেছন থেকে দেখে, সামনে যে যাচ্ছে তার শরীরে কোনো বস্ত্র নেই। এক নগ্ন নারীর সুগঠিত শ্রোণির ওপর ঝালরের মতো পড়ে আছে কালো কুঞ্চিত কেশদাম, হাঁটার দমকে যা ক্ষণে ক্ষণে স্থানচ্যুত হচ্ছে। কী সুঠাম সেই পেছন ফেরা শরীর, বিশেষ করে পদযুগল, যেন দুই কৃষ্ণসর্পের উজ্জ্বল ত্বক মোড়া হিলহিলে দেহের দোলানি। পুরুষটির দেহ তীব্র ভাবে জেগে উঠতেই ঘটে যায় এক অনর্থ। আকাশ থেকে নেমে আসে অতিকায় এক কুয়াশাখন্ড, ঢেকে ফেলে নারী অথবা দেবী মূর্তিকে, আর তীব্র চিৎকার করে প্রদীপবাহক সমস্ত পৃথিবীকে জানান দেয়, সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। চিরদিনের মতো তার দৃষ্টি অবলুপ্ত হয়েছে।

এ কথা আলোচনা করাও পাপ, তাই শাশুড়ির কাছ থেকে পুত্রবধূ যা জেনেছে তা সে নিজের স্বামীকেও কখনও বলেনি। কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকেই অতি সাবধানতাবশত বাড়ির পুরুষদের এ কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ঘরে অন্য নারী থাকলে ভালো, নাহলে অনাত্মীয় কোনো মানুষ অর্থের বিনিময়ে এ কাজ করতে রাজি হলে তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, শিবাভোগের খুঁটিনাটি দেখলে সে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। মকরের সুবিধে হচ্ছে সে চোখে কিছু দেখতেই পায় না। তবু প্রত্যেক দিন শিবাভোগের পর তার ঘাড় টনটন করতে থাকে।

অন্ধকারে মণিকণার পায়ের শব্দ ও স্তোত্রপাঠ শুনতে পেলে দিঘির ধারে ঝোপঝাড়ে শব্দ ওঠে খসখস। ওরা সামনের দুই পায়ের ওপর মুখ নামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। ঝোপের ওপর ল্যাজ আছড়ায়। বেলগাছ অবধি যাবার আগেই তাই শব্দের বৃত্ত ছড়িয়ে যায় অবিকল জলের বৃত্তের মতো, চারপাশ থেকে চামরের মতো ফুলো ফুলো অগুন্তি ল্যাজের ডগা উঁকি দিয়েই মিলিয়ে যায়, ছুঁচলো মুখ বার করে আড়াল আবডাল থেকে জ্বলন্ত কয়লার মতো জোড়া জোড়া চেরা চোখ মণিকণাকে দেখতে থাকে।

ভাগ্যিস মকরের গ্রামে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে গোলমাল লেগেছিল। তাই তার ভাইপো আর তার বৌ পালিয়ে জেঠার কাছে এসে উঠল। সুদর্শনের নাহলে কলকাতাযাত্রা শিকেয় উঠত। মণিকণাকে একা ঐ আশি বছরের হেঁপো বুড়োর জিম্মায় রেখে সে কোথাও নড়তে পারে না! কিন্তু একমাত্র দিদি তার, অনেককাল ধরে আমহার্স্ট স্ট্রিটে ভাড়া বাড়িতে স্বামীকে নিয়ে থাকে, পুরনো খাড়াই সিঁড়িতে জমা বৃষ্টির জলে পা পিছলে হঠাৎ জামাইবাবুর মালাইচাকি দু টুকরো। ওদের মেয়ে জামাই শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পেছনটায় বাসা নিয়েছে বুড়ো মা বাবার কথা ভেবেই, কিন্তু গ্রহের ফের, তারা কাশ্মীর বেড়াতে গেছে। সেখান থেকেই ফোনের পরে ফোন, মামা তুমি গিয়ে মা বাবার কাছে অন্তত দিন দুচার থাকো, আমরা ফ্লাইট বুক করবার চেষ্টা করছি। হাঁটুর ব্যথায় কাহিল মা একা কিছুই করতে পারবে না। এরপরও না যাওয়া কি সুদর্শনের উচিত হত?

মকরের ভাইপোটা কেমন গোঁয়ারগোবিন্দ গোছের। সব সময় বৌ আর জ্যাঠার ওপর মেজাজ দেখাচ্ছে। কিন্তু বৌটি বেশ, কুড়ি বাইশ বছরের হাসিখুশি তরুণী, ছলবলানির জন্য স্বামী তাকে সন্দেহ করে, গায়ে হাতও তোলে। ক্লাস টেনে পড়তে পড়তে তার বিয়ে হয়েছে এক নিরক্ষরের সঙ্গে, এসব ভুলে গিয়ে সে মণিকণার মেঘের মতো চুল আদুল করে দিয়ে ঘসে ঘসে জবাফুলের রস মেশানো নারকেল তেল মাখায়। পায়ে গাঢ় করে আলতা পরিয়ে দেয়। দিদির রূপের প্রশংসা করতে করতে হেসে লুটোপুটি খায়। সেইই একদিন ফিসফিস করে বলে, আমার স্বামীটা ভালো লোক নয়, ভোটের সময় বাড়িতে বসে বোমা বানায়। একবার আঙুল উড়ে গেছে, তবু শিক্ষা হয় নাই। পার্টির দাদারা বলতেই আবার বানাতে বসে। আমি তো ডরে দাঁতকপাটি।

তুই কিছু বলিস না, মণিকণা অবাক হয়, চৌকির তলায় তাজা বোমার ঝুড়ি, মালমশলা রেখে ওপরে কেউ ঘুমাতে পারে!

-বলবো না কেন, বলি তো। শুনলে না! বেশি বললে মাইর খেতে হয় যে। বলে মেয়েছেলের অত পটপটি কিসের ! ওর মনে খুব সন্দেহ। ভাবে আমি অন্য কাউরো সঙ্গে ভালবাসা করি। আমার যে কাউকেই ভাল্লাগে না সেটা টের পায় না বুড়াটা।

এই অব্দি বলে সরলা আবার দমক তুলে তুলে হাসতে থাকে। তার এলো খোঁপা ভেঙে দাওয়ায় লম্বা চুল লুটোপুটি খায়। বুকের নির্লজ্জ আঁচল খসে পড়ে। তবে এই দুই অসম বয়সী নারীর মধ্যে বিস্তর বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একধরণের সখ্য তৈরি হয়ে যায়। শুধু যেটা মণিকণার একদম পছন্দ হয় না, সেটা হচ্ছে সরলার হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকা। হয়ত দেবীর জন্য রক্তচন্দন বাটছে সে একমনে, চিন্তা করছে সুদর্শনের ফেরা নিয়ে, হঠাৎ দেখে উঠোনে মাছ কোটার আওয়াজ

একেবারে বন্ধ। যেন তার চারপাশে অনেক দূর দূর অবধি কেউ কোথাও নেই। আসলে কিন্তু তার চার পাঁচ হাতের মধ্যে বসে আঁশবটিতে হাত রেখে সরলা হাঁ করে তাকেই দেখছে। কী দেখছিস রে সরল, এই প্রশ্নের উত্তরে সে গোঁজ হয়ে যায়। পীড়াপীড়ি করলে বলে, দিদি তোমাকে দেখছিলাম। তোমার মতো রাঙা মেয়ে আমার গ্রামে একটাও নাই গো। মা কালীর কিরা খেয়ে বললাম।

বিরক্ত হয় মণিকণা। এই কি রূপ দেখার সময় ! মাছ কাটা হবে, দিঘির জলে ধুয়ে পেঁয়াজ রসুন বর্জিতভাবে বিশুদ্ধ নিরিমিষ পদ্ধতিতে তা রান্না করে কালো পাথরের বাটিতে ঢালতে হবে, তারপর গোবিন্দভোগের ভাত হলে সেসব সরিয়ে রেখে, পায়েস রান্নার বন্দোবস্ত। পাঁচরকমের ফল কাটা, চন্দন বাটা, কোশাকুশি সাজানো, এইসব মণিকণাকে একা করতে হবে অবেলায় আরও একবার স্নান করে এসে। সে বিরক্ত হয়, কিন্তু রাগ করতে পারে না। এই মেয়েটা আসবার পর থেকে তার একজন সঙ্গী হয়েছে, হাতে হাতে সাহায্য করবার একজন লোক হয়েছে। সব কাজ সারা হয়ে গেলে ঠাকুর দালানে ভূতের মতো তাকে আর বসে বসে অপেক্ষা করতে হয় না, কখন সুদর্শন তাস পিটিয়ে বাড়ি আসবে। এখন সে বাড়ি নেই বলে তো চব্বিশ ঘন্টাই সরলা মণিকণার সঙ্গী। তারা একসঙ্গে দিঘিতে সাঁতার কাটে, গল্প করে, চারপাশের আগাছা পরিষ্কার করে। দিঘির কোণায় মকরের কুঁড়েতে স্বামী আর জেঠশ্বশুরের জন্য রান্না করা ছাড়া সরলা আর ওমুখো হয় না। এখন তো সুদর্শনই ব্যবস্থা করে গিয়েছে, পালঙ্কে নিজের জায়গায় শোবে মণিকণা, আর মেঝেতে বস্তা বিছিয়ে সরলা। একটা বিছানার চাদর তাকে দিতে গেলে সরলা হাসতে হাসতে লুটোপুটি খায়। ওটা দিয়ে সে কী করবে! শীতকাল হলে তাও হয়ত গায়ে দিত। হ্যাঁ, ঘুমের মধ্যে তার শাড়ি হাঁটুর ওপর উঠে যায় বটে, কিন্তু ঘরে কে আছে যে সে লজ্জা পাবে !

কিন্তু সুদর্শন যাবার পর পাঁচ দিনের মাথায় সরলার ষণ্ডা বর এসে বলল, আমি ধাঁ হচ্ছি গো মা ঠাউরান। পাটির দাদারা ডাকাডাকি করছে। ধক করে উঠেছিল মণিকণার বুকের ভেতরটা, ও কী সরলাকেও নিয়ে যাবে নাকি ! কিন্তু না, ষন্ডা নিজে থেকেই বলল, বৌ থাকবে, কারণ গ্রামে মুড়ি মুড়কির মতো এতই বোমাবাজি হচ্ছে যে বোমা কম পড়ে গেছে। ওখানে এখনই মেয়েছেলে নিয়ে ঢুকলে মহা ঝামেলা। তাছাড়া সে জেঠা আর দাদাবাবুকে কথা দিয়েছে মা ঠাউরানের কাছে বৌ থাকবে। কথার খেলাপ সে করবে না। তবে দাদাবাবু ফিরলেই যেন তাকে খবর দেওয়া হয়। বেশিদিন তো আর হাত পুড়িয়ে খাওয়া যাবে না। সে গ্রামে যতো ভয়ই থাকুক না কেন।

যেদিন ষন্ডা বিদেয় নিল, সেদিন বিকেল থেকেই মকরের ধুম জ্বর। জ্বরের তাড়সে বুড়ো কেঁপেঝেঁপে একশা। স্টেশন রোডের ওষুধের দোকান এখান থেকে বহুদূর বলে সুদর্শন প্রচুর ওষুধ একটা পুরোনো চকোলেটের বাক্সে গুছিয়ে রাখে। সেখান থেকে ক্যালপল দিল মণিকণা। সরলাকে বলল, খালি পেটে খাওয়াস না যেন। কিন্তু সন্ধের আগে জানা গেল বুড়োর জ্বর কমলেও সে চোখ খুলতে পারছে না। মহা মুশকিল, শিবাভোগের সময় প্রদীপ দেখাবে কে ! তবে কি সরলাকেই দেখাতে হবে !

সূর্য সেদিন ডুবে যাবার আগে কেমন একটা বিভ্রমের সৃষ্টি করেছিল। কনে দেখা আলোতে যেমন দ্রুত সুন্দরের শেকড় গজায়, তারপর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তার অপরূপ ছায়া, তেমনি এই আলোতে সবই সুন্দর লাগছিল। এই পোড়ো বাড়ি, বাগানে ভেঙে পড়া নগ্ন পরির হাতে উপুড় করা কলস, ঝোপঝাড়, এমন কী মন্দিরের খোলা দরজা দিয়ে দেবী মূর্তির সোনা বাঁধানো ত্রিনয়নেও সেই আলো ঠিকরাচ্ছিল। মণিকণার মন ভালো হয়ে গেল। যেন তার কোনো অভাববোধ নেই, স্বামী তাকে যা দিতে পারেনি তাই নিয়ে মনের সংগোপনেও কোথাও কোনো দুঃখের লেশমাত্র নেই। এই একাকীত্বও তার পরম আদরের, আশির্বাদের মতো, নাহলে তার ভাঙা বাড়ি ঝলমলিয়ে এমন আলো ঠিকরে ওঠে ! কিশোরির মতো উল্লাসে সে বলে, চল সরল স্নান করে আসি। তারপর পুজোর যোগাড়ে বসব।

দুজনে পাল্লা দিচ্ছিল দুই মৎসকুমারীর মতো। কখনও চিৎ সাঁতার, কখনও ডুব সাঁতার। সরলার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে কেবল জলশুশুক। তাই তীরে এসে ভুস করে মুখ তুলে হাত দিয়ে কপালের ওপর জলে ভেজা চুল সরায় মণিকণা, সরে যাওয়া আঁচল টানে বুকে, পায়ের দিকের শাড়ির ঘের নিংড়ে নিয়ে বলে, চল এবার, যোগাড়ের দেরি হয়ে যাবে। জলে আরও থাকলে তোর ঠান্ডা লেগে যাবে। সোনালি আলোর চাদর মুড়ি দেওয়া আকাশ চোখে নিয়ে ভাসতে ভাসতে সরলা বলে, তুমি আগাও দিদি। গতরটা ঠান্ডা করে যাই।

সেদিন মণিকণার পুজো সারা হয় বড় নির্বিঘ্নে। কোশাকুশি যেন আপনা থেকে জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, ধূপ আরও গন্ধ বিলায়। দেবীর পাদপদ্মে অঞ্জলি দেওয়া পঞ্চমুখী জবা অন্য দিনের মতো একবারও স্থানচ্যুত হয় না, যেন আঠা দিয়ে কেউ সেঁটে রেখেছে। মায়ের নয়নে বরাভয়, মুখে ভুবনভোলানো হাসি। আজ বড় সার্থক দিন যেন, আজ সবার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবার মতো দিন, আজ এত বড় চাঁদ আকাশে, মনের মধ্যে তাই জোছনার প্লাবন! ভাবতে ভাবতে সরলাকে চরণামৃত দেবে বলে পেছন ফেরে মণিকণা, হাত ধুয়ে প্রদীপ নিয়ে চল আমার পিছু পিছু। শিবাভোগটা সেরে আসি।

দিঘির দিকে যাবার ঘাসে ঢাকা সরু রাস্তায় পা ফেলে চোখে যেন ধাঁধাঁ লেগে যায় মণিকণার। এতো স্পষ্ট জোছনা সে আর দেখেছে কোনদিন ! হুই দূরে মকরের কুঁড়ের চালায় বসে আছে সাদা লক্ষ্মী প্যাঁচাটা, এতো দূর থেকে ওর ঘাড় ঘোরানো পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওদিকে বনতুলসীর ঝোপের আড়ালে সরে গেল একটা ছুঁচলো মুখ, ভুঁড়ো শেয়ালিটা যখন আছে তখন ওর সদ্য বিয়ানো বাচ্চাদুটোও পেছনের পায়ের ফাঁকে জড়ামড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চয়ই। নাককাটা বুড়ো শেয়ালটা তার আত্মীয়স্বজন নিয়ে পাথুরে পরির পায়ের কাছে অপেক্ষা করছে।

আর বেল গাছের বাঁধানো গোড়া ঘিরে জোড়া জোড়া বসে আছে মহাকালীর সহচরেরা। ওরা জীবনে একবারই জোড় বাঁধে আর আমৃত্যু বিশ্বস্ত থাকে পরস্পরের প্রতি।

অকুতোভয় মণিকণা এগিয়ে যেতে যেতে শুনতে পায় জোছনার ভেতর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে ট্রেনের তীক্ষ্ণ হর্ণ। সুদর্শন কবে ফিরবে জানা নেই।

শিবাভোগের পাত্র উবুড় করে দিয়ে পায়ে পায়ে পিছিয়ে আসে মণিকণা। সে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছলে তবে খাবারের দিকে এগিয়ে আসবে শিবাকুল। খাবে আর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবে আশেপাশের কেউ কাছেআসছে কিনা। জন্তুগুলোর দিকে নজর নিবদ্ধ রেখেই পিছোচ্ছিল মণিকণা, হঠাৎ তার সঙ্গে কারও ধাক্কা লাগে। আতঙ্কে হাত থেকে অতবড় পেতলের পাত্র পড়ে যায় দিঘির শান-বাঁধানো ঘাটে, বিকট ধাতব আওয়াজ হয় একটা। শেয়ালরা ছিটকে যায়, নিজে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে পেছন থেকে কারও বাহুবন্ধনে ধরা পড়ে মণিকণা, মুথা ঘাসের মতো নরম সুগন্ধি স্পর্শ, কিছুই না বুঝে তার শরীর ঘটনার আকস্মিকতায় তির তির করে কাঁপতে থাকে। খুলে পড়ে তার পট্টবস্ত্রের আঁচল, কপালের সিঁদুর মাখামাখি হয়ে যায় সারামুখে, বিস্ময়ে আতঙ্কে সে শুধু গোঙাতে পারে, কে কে !

তার কানের লতিতে মুখ রেখে কে যেন বলে, আমি আমি। ছিটকে সরে যেতে নেয় মণিকণা, তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, কী করছিস তুই ! ওরে ছাড় ছাড়, হাতে তোর প্রদীপ কোথায় ! আজ তোর সাক্ষাৎ মরণ হবে রে পোড়ারমুখী ! তাকে ছেড়ে দিয়ে এবার সামনে আসে সরলা, পেছনে ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখা প্রদীপ দু বার হেঁচকি তুলেই নিভে যায় ! এ তুই কী করলি, হাহাকার করতে করতে মণিকণা ফুটন্ত জোছনায় ঠাহর করার চেষ্টা করে সরলার চোখদুটো গলে সাদা মণি বেরিয়ে আসছে কিনা। কিন্ত না, দেখে সেখানে জ্বলে রয়েছে শুধুই এক অপার্থিব আলো। তাকালে তা স্নিগ্ধ করে, কাছে ডাকে আয় আয়। শেয়ালরাও ফিরে এসেছে, তাদের খাবার শব্দ, হুটোপাটি সবই শুনতে পাচ্ছিল সে, কিন্তু এক পাও পেছোবার শক্তি না পেয়ে মণিকণা কেঁদে ফেলে, কী, কী চাস তুই আমার কাছে। সরলা আরও কাছে এগিয়ে আসে, তার কণ্ঠায় প্রায় ঠেকে যায় ছোটখাট মণিকণার কোঁকড়া চুলে ভরা মাথা। নিশ্বাসের তলায় যেন অনেকদূর থেকে সরলা বলে, দিদি, আজ আমি দেখে নিয়েছি এক আশ্চর্য দৃশ্য।

-কী, কী দেখেছিস তুই অসৈরণ মেয়েছেলে, গাল দেয়, কিন্তু মাথা সরাতে পারে না মণিকণা। সরলার গা থেকে উঠে আসা একটা জংলী মাদকতাময় গন্ধ তাকে অসাড় করে রাখে। তুমি যাচ্ছিলে আগে আগে, ঠমকে ঠমকে, আমি পেছন থেকে তোমার রাঙা পায়ের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি তোমার পরণে কিছু নেই গো, একটি সুতোও নয়। তোমার পা, তোমার পেছন, সব চোখ দিয়ে ছুঁয়ে ছুয়ে আমি তোমার খোলা পিঠ দেখি, উঁচু হাড় দেখি, তার ওপর ছড়ান কাঁধ, এলো খোঁপা, এইসব ছুঁতে ছুঁতে আমি যেন তোমাকে সামনে থেকে দেখি। তোমার ভরাট বুক, পেট ,নাভি, সুগন্ধ সুগন্ধ--

সরলা হাঁপাতে থাকে, মণিকণা তাড়াতাড়ি তার মুখ চাপা দেয়। আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে হ্যাঁ রে তুই সব দেখতে পাচ্ছিস তো ? এই দিঘি, বাড়ি, গাছ, জোছনা, এই আমি--- দেখতে পাচ্ছিস তো? আর কিছু বলে না সরলা, যেন তাকে নিশিতে পেয়েছে এইভাবে আঙুলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় মণিকণার সমস্ত শরীর, টের পেতে থাকে সেখানে বর্ষার প্রথম জল পাওয়া কদমফুলের শিহরণ!

এইসময় খাওয়া শেষ করে আকাশের দিকে মুখ তুলে বিপুল স্বরে ডেকে ওঠে শিবাদল। যেন পূর্ণতার আনন্দই এই জীবজগতের মূল, এই ঘোর নাদ সেকথা নির্ভুল মনে করিয়ে দেয়। কেউ অপূর্ণ থাকতে আসেনি এই পৃথিবীতে, পূর্ণ মিশে যায় পূর্ণতে, আবার পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিয়ে নিলে পূর্ণই পড়ে থাকে। মণিকণার মনে পড়ে যায় শাশুড়ির কথা, শিবাভোগে পরিতৃপ্তি ঘটলে ছদ্মবেশী দেবী কালিকা শিবা পরিবৃত অবস্থায় ঈশাণ কোণে মুখ তুলে তীব্র রব করেন। কিন্তু এমন আশ্চর্য সুগন্ধ তাকে ছেয়ে রেখেছিল, আত্মহারা করে দিয়েছিল, মুখ তুলে মণিকণা নিজের বাড়ির ঈশাণ কোণ কোনটা তাইই ঠাহর করতে পারল না।

সরলা বর্ষার ভরন্ত মেঘ হয়ে গেলে, মণিকণার ভিতর বাহিরে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। তার চোখদুটো যেন সেই অকাল বর্ষণে ফুলেফেঁপে ওঠা চঞ্চল প্রস্রবণ। কদম ফুটছিল কোথাও, নাকি তার মাথার ভেতরেই, অথচ বাইরের বাতাসেও তার তীব্র সুগন্ধ ! কিন্তু তখনই মণিকণার কানে আসে এক অতি পরিচিত পায়ের শব্দ, জং ধরা গেট সশব্দে খুলে, সুড়কির রাস্তা পেরিয়ে কে যেন ঠাকুর দালানে উঠে হাঁক দিল, মণি, মণিকণা, কোথায় গেলে গো। পাপুনরা আজ কাশ্মীর থেকে চলে এল বলে আমিও ছুটি পেয়ে

গেলাম। হাত পা ধুয়ে আসছি, এবার ভালো করে এককাপ চা বানাও দিকিনি।

অধ্যাপক প্রতিভা সরকার ছোট গল্পকার হিসেবে সুপরিচিত। তার উপন্যাস মানসাই জনাদৃত, যেমন তার অন্যান্য প্রবন্ধের বইগুলি। সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যা, মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের টানাপোড়েন তার লেখায় রূপ পরিগ্রহ করে।

রাজার খেলা

ডঃ অমিত বিশ্বাস

কলকাতার উপকণ্ঠেই এই বৃদ্ধাশ্রম। আবাসনের নাম আবদানা। তবে এখানে ছেলেমেয়েরা তাদের বাপ-মাকে জমা দিয়ে যায়নি। বাবামারা নিজেরা এখানে ফ্ল্যাট কিনেছেন, নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী, সে বড়ই হোক বা ছোট। সেদিন সেপ্টেম্বর মাসের পয়লা তারিখে তাদের ক্লাব হাউসের উদ্বোধন। ক্লাব হাউসটা এদ্দিনও ছিল, তবে কিনা এখনো নির্মানরতো এই নয়া জমানার বৃদ্ধাশ্রমে, সেটির সমস্ত ইন্টেরিয়র কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল না। উদ্বোধন উপলক্ষে অনুষ্ঠানে গান গাইবেন বেশ কয়েকজন বুড়ো-বুড়ি। এক ছোটোখাটো বক্তৃতা দেবার জন্য তৈরী হয়েছেন এই আবদানা রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর সভাপতি শ্রীযুক্ত শেখর চৌধুরী মহাশয়। শেখর বাবু ছিপছিপে গড়নের মাঝামাঝি উচ্চতার, যদিও বয়স বাড়ার ফলে, মধ্যাঞ্চলে একটু চর্বি জমেছে, তবে তা বেল্টের অধীনে সংযত। ধূসর রঙের জিন্স এর সাথে সাদা লিনেনের ফুল হাত জামা, একটু গম্ভীর প্রকৃতির দেখতে লাগলেও, প্রাণ খুলে হাসতে কার্পণ্য করেন না। তবে টেনশন হলে তা লুকোনোর চেষ্টাও তার চরিত্রের বাইরে। সাদা মাটা ভালো লোক, অভিনয়টি তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে পড়ে না।

এই বয়োজেষ্ঠদের নাচ দেখলেই বোঝা যায়, এরা কেউই প্রফেশনাল ডান্সার নন, কিন্তু হয়তো ছোটবেলায় শিখেছিলেন, কয়েক বছর, হয়তোবা যে বৃদ্ধারা আর একটু স্বচ্ছল পরিবারে জন্মেছিলেন, তারা বিয়ের আগে পর্যন্ত। কিন্তু তার পর থেকে এপর্যন্ত আর খুব বেশী সুযোগ মেলেনি, স্টেজে পারফর্ম করার মতো। তাই আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ আপনারা রাগ ঘৃনাকে আটকান, কেননা যে সুযোগ পায়নি সে আপনাদের সকলের সাহায্য চায়। আর শেখর বাবুতো পকেটের কাগজটি মাঝে মাঝেই বের করে একটু ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন, অফিসে বেশ কিছুবার মিটিঙে কথাবার্তা বলেছেন বটে, তবে এইরকম খোলা মঞ্চে বক্তৃতার সুযোগ এই প্রথম, almost.

সব বুড়ো-বুড়িরা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে আসন গ্রহণ করেছেন, বেশ কয়েকজন মুখোশধারী, যদিও pandemic কেটে গিয়ে কয়েকমাস হয়েছে। আবার কিছু লোক লাঠি নিয়ে কিংবা walker নিয়ে এসেছেন, আর প্রথম সারীতে বেশ কয়েকটি wheel chair. Wheel Chair এর সাহায্যকারীরা তার ঠিক পিছনেই আছেন। কয়েকজনের আবার AC র ঠান্ডা সহ্য হয় না, তারা কিন্তু শাল জড়াতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। এই বৃদ্ধদের sence of freedom বা freedom from inhibition সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। এখানে আপনাকে দেখে কে কী ভাবলো, তা ভাবার সময় অন্য কারুর নেই। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে, দেবী বন্দনা দিয়ে। মুখ্য ব্যক্তিরা একটু প্রদীপ-ট্রদিপ জ্বালিয়েছেন। ক্লাব হাউসের গুণগান করে, তার সমস্ত সুযোগ সুবিধা বুঝিয়ে বললেন, প্রজেক্ট এর এক কর্মকর্তা।

নাচ গান বক্তৃতা মিলিয়ে, সন্ধ্যা কাটিয়ে ক্যান্টিনে মিনি ফিস্ট এর ভোজ খেয়ে সেদিনকার মতো তাদের দিন শেষ হলো। পরের দিনটা রাজা দাদুর আর কাটতে চায়না! তিনি যে এতো দিন ধরে প্ল্যান করে বসে আছেন উদ্বোধনের পরদিন থেকেই, তিনি TT খেলবেন সকালে বিকালে! কিন্তু অন্য দাদুরা বাদ সাধলেন, সকালে খেলবেন না বলে! তাই, কি আর করা, রাজা দাদুকে অপেক্ষা করতেই হলো। বিকেল পাঁচটা বাজতে না বাজতে, অন্য যে দাদুরা আগেও মাঝে মাঝে সেই make-shift ক্লাব হাউসে খেলতেন তাদের নিয়ে এক WhatsApp গ্রুপ বানিয়ে ফেললেন। রাজা দাদু সবার আগে, আর একজন আসতেই খেলা শুরু হলো। ধীরে ধীরে আরো কয়েক দাদু এসে হাজির হলেন। সবাই প্রায় ৩০/৩৫ বছর পরে ব্যাট ধরেছেন। কারো একটু আধটু বডি-মেমরি আছে, কারো একেবারেই নেই। রাজা দাদু অবশ্য ইতিমধ্যে একটু আধটু প্রাকটিস করে রেখেছেন। রাজা এক সুগঠিত বলিষ্ঠ গড়নের অধিকারী। প্রায় ছ ফুট লম্বা, ফর্সা, তিনি অত্যন্ত গরমের দিনেও ফুল হাতা খেলার শার্ট পরেন, যার কব্জি এলাস্টিকে আটকানো থাকে। তিনি এক বাইক দলের সদস্য, মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়েন শয়ে শয়ে কিলোমিটার পাড়ি দিতে।

খেলা শুরু হতেই পাশ থেকে দু একটা করে comment ও শুরু হলো। গুড শট, চালিয়ে যাও, ব্যাট একটু কাত করে ভাই, মারো এটাকে, ইত্যাদি, সব মিলে TT room সরগরম। তবে প্রত্যেক সন্ধেই, শেখর আর রাজা নিয়ম করে TT খেলতেন, অন্যান্য দাদুরা আসতেন বটে, তবে, না টাইমের বালাই ছিল, না ছিলেন রেগুলার। এরকম চলতে চলতে কখন যে শেখর রাজার coach হয়ে উঠেছিলেন, তা আর তাদের মনে নেই।

বলকে ব্যাট দিয়ে ব্রাশ করতে হবে, তবেই তো স্পিন আসবে, চপ করতে, কানের লাইন থেকে, উল্টো হাঁটু পর্যন্ত ব্যাট টানতে হবে, তবেই না

অপোনেন্টের জালে বল যাবে। শেখর ছোটবেলায় একটু কোচিং নিয়েছিলেন, এবং খেলাটা ভালোবাসেন, ফলে, শুরু করতেই তার পুরানো স্মৃতি সব ফিরে এসেছে। রাজা দাদুও সিরিয়াস। তাকে শিখে জিততে হবে, ওই যে সুন্দর আছে না? যে TT খেলে, তবে তার খেলা রাজার পছন্দ নয়, তাকে তো অবশ্যই হারাতে হবে। তার পরে ওই যে গনেশ দাদু, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলে, তারও উপরে থাকতে হবে, তাই তো শেখরের সঙ্গে রাজার বন্ধুত্ব! তার কাছ থেকে ভালো করে খেলা শিখে অন্যদের হারাতে হবে। তবে শেখরের কাছে হারতে রাজার খুব আপত্তি নেই। যদিও শেখর রাজাকে বার বার বলেন, এখন শুধু খেলা প্র্যাক্টিস করা, গেম খেলা পরে। তাই বেশীর ভাগ সময়ে শেখর গেম খেলেন না, শুধুই প্র্যাক্টিস, কখনো forehand, কখনো backhand, কোনোদিন শুধুই চপিং, আবার অন্যদিন top spin.

রাজা কিন্তু এতদিনে শহরের সেরা দোকান থেকে বেশ দামী একটি ব্যাট কিনে এনেছেন, ওই যে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে GK Sports, রাজার ফেভারিট দোকান, তার ব্যাটের দাম প্রায় আট হাজার টাকা! কিন্তু ওই ব্যাট দিয়ে তার খেলাটা ভালো জমছে না, সব বলই টেবিলের বাইরে চলে যাচ্ছে। রাজা দাদু আবার চললেন তার আড়াই লাখ টাকার বাইক হাঁকিয়ে সেই GK Sports. ইয়ং দোকানদার ব্যাট দেখে এবং কমপ্লেইন্ট শুনে বললেন, "অরে আঙ্কেল আপনার তো একটু স্লো ব্যাট লাগবে, এটা তো খুব ফাস্ট।" রাজা বললেন ঠিকআছে, রাবার টা পাল্টে দাও। ছেলে বললো, "তা করতে গেলে ওই দামী, সবে কেনা রাবারটা খারাপ হয়ে যাবে, আমি বলি কি, এই ব্যাটটা আপনি রাখুন, আপাতত আর একটা স্লো ব্যাট নিয়ে যান, দাম একটু কমই পড়বে, এই ব্যাটটা আপনি কিছুদিন পরে পাক্কা খেলোয়াড় হয়ে use করবেন।" ইয়ং হলে কি হবে, ছেলে ভালো ব্যবসাদার, রাজাকে দেখেই বুঝে ফেলেছে, দাদুর পয়সা আছে, এবং কেনাকাটা করতে ভালোবাসেন, দোকানের ঠিক বাইরে পার্ক করা বাইকটাও সে কথাই চিৎকার করে বলছিলো! After all কলকাতার রাস্তায় Harley Davidson খুব বেশী নেই। রাজা সেদিন শুধু আর একটা পাঁচ হাজারী ব্যাট নয়, প্রায় ডজন খানেক বেশ দামী TT বল, ঘাম আটকাবার জন্য রিস্ট ব্যান্ড, হেড ব্যান্ড ইত্যাদি নিয়ে বাড়ী ফিরলেন, খুবই উৎফুল্ল মনে, যে কাল থেকেই এই নুতন ব্যাট আর বলের জোরে তিনিই champion.

পরের দিন খেলার শুরুতেই খুব উৎসাহ সহকারে শেখরকে বললেন তার GK Sports এর গল্প। শেখর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, একটু বিরক্তও হলেন আবার তার হাসিও পেলো। তবে সেদিনের শেখরের top spin গুলো রাজার টেবিলে পড়ে ছিটকে বেরিয়ে গেলো। শেখরের চপগুলো, রাজার ব্যাটে লেগে তার টেবিলেই জড়িয়ে গেলো, শেখরের placement গুলো, রাজা হাত-পা ছড়িয়েও নাগাল পেলেন না। সব মিলিয়ে শেখর রাজাকে বুঝিয়ে দিলেন খেলার তিনি কিছুই শেখেন নি! রাজা একটু হতাশ হয়ে বাড়ী গেলেন সেদিন। পরদিন, শেখর রাজাকে বোঝালেন, অপোনেন্টের খেলা কিভাবে বুঝতে হয়। অপরপক্ষকে কিভাবে বাধ্য করতে হয় এক রকমের শট খেলতে, কিভাবে খেলার গতি নিজের দখলে রাখতে হয় ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে আবদানা আবাসনের কর্তৃপক্ষ TT tournament ঘোষণা করলেন। TT রুমে ভীড় বেড়ে গেলো। যাঁরা কোনোদিন TT খেলেন নি, তারাও ব্যাট, বল হাতে TT room এ হাজির! রাজার প্র্যাক্টিস মাথায় উঠলো। রাজা খুব বিরক্ত। তিনি প্রায়ই গজগজ করতে থাকেন, এই unprofessional খেলোয়াড়দের খেলার শখের সমালোচনা কোরে। যাই হোক, সবাই নাম টাম দিয়ে tournament এর জন্য রেডি। শেখর আর নামটি দিলেন না, কারণ তার একটি অফিস ট্রিপ পড়ে গেছে ওই সময়ে। রাজা, সুন্দর, গনেশ এবং আরো অনেকে, জোর কদমে tournament এর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। খুব odd time slot এও TT room ফাঁকা পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো।

লাস্ট কয়েকদিন শেখর কন্সেন্ট্রেট করলেন, রাজা যাতে প্রতিপক্ষের দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারেন, তাই অন্য খেলোয়াড়দের, কার বিপক্ষে কিভাবে খেললে ফল পাওয়া যাবে, রাজাকে বোঝালেন এবং সেই মাফিক রাজা খেলে দেখলো সে গেম জিততে পারছে। ব্যাস, রাজা এখন tournament ready. রাজা আক্ষেপ করে বললেন, আমার জেতাটা শেখর দেখতে পাবে না! শেখর বললেন, আরে ভাই, আমি থাকলে আর খেললে, তুমি জিততে কোথায়??

সে যাই হোক, শেখরের ট্রেনিং, রাজার সেদিনের ফর্ম আর জেতার অদম্য ইচ্ছা, সব মিলিয়ে, রাজা কিন্তু চারজন খেলোয়াড়কে হারিয়ে সেদিনের মতো আবদানা চ্যাম্পিয়ন হয়েই গেলেন!

সব থেকে ইন্টারেষ্টিং ছিল সেমি ফাইনালে সুন্দর এর সঙ্গে রাজার ম্যাচ! তার আর একটা কারণ ছিল, সুন্দর হলো গিয়ে গত বারের চ্যাম্পিয়ন। তিনি আবার স্থানীয় মন্দিরের সেক্রেটারি ও বটে। তিনি খেলতে আসেন যখন মন্দিরের কাজ থেকে বিরতি পান। তার স্ত্রী এই বয়সেও খুব ভালো

গান। আজকের সংগীত পরিচালনার দায়িত্বেও তিনি। মেয়ে থাকে আয়ারল্যান্ডে, বছরে দু একবার সপ্তা দুয়েকের জন্য ঘুরেও আসেন। সে যাই হোক সুন্দর ব্যাক হ্যান্ডে ভীষণ উইক, ফোর হ্যান্ডে একমাত্র একটু কিল শট ছাড়া সে কোনোমতে অন্যের টেবিলে বল পাঠায়, কিন্তু নিজেকে বিরাট প্লেয়ার ভাবে। সেমি ফাইনাল ম্যাচের দিন রাজা তো consistently তাকে ব্যাক হ্যান্ডে খেলিয়ে খেলিয়ে, সুন্দর নিজে ভুল করা পর্যন্ত খুব ধৈর্য্য সহকারে খেললো। তার কানে যেন শেখরের নির্দেশ বাজছিলো। ধরে খেলো, মারার দরকার নেই, বল ফেরত দাও, ব্যাক হ্যান্ডে place কারো, ইত্যাদি। ফাইনাল ম্যাচ শেষ হতেই, রাজা দুহাত তুলে, নিজেকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করলেন, সুন্দর আর রেফারী ছাড়া, দর্শকদের যে যে হাত বাড়িয়েছে বা বাড়ায়নি, সকলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে ঠান্ডা এক বোতল জল খেয়ে ফেললেন। তার পরেই ফোন করে শেখরকে জানালেন, তার সুখবর। শেখর অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, কাল সকালে আমি কলকাতা ফিরছি, নুতন ট্রেনিং শুরু।

পরের দিন খেলতে এসে, শেখর লক্ষ্য করলেন, রাজার বেপরোয়া ভাব, প্রতি বলেই প্রায় তিনি শট মারতে চান এবং বেশীর ভাগ সময় শটগুলো আর কোথাও গিয়ে পৌঁছয় না। এবং এই এতো ভুল সত্ত্বেও তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। দু এক জনের সঙ্গে গেম খেললেন, গেমগুলি তিনি লড়ে লড়ে জিতেও গেলেন। এর পর যখন শেখর তার সঙ্গে খেলতে শুরু করলেন, তখন শেখর দু একবার তাকে বলার চেষ্টা করলেন, বল ঠিক ফেরত আসলেও শটগুলো কিন্তু ভুল হচ্ছে, রাজা শুনে, না শুনে বললেন চলো গেম খেলি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেখর গেম শুরু করলেন এবং তার মেজাজ ইতিমধ্যেই বিগড়ে আছে, ফলে রাজাকে হারাতে চেয়েও তিনি বাজে খেললেন এবং রাজার কাছে হারলেন। এতে শেখরের কিছু যায় না আসলেও রাজার মাথাটি মত্ত হাতির মতো চড়ে গেলো। রাজার খেলা শেখারও এখানেই ইতি হোলো।

রাজা এখন আর বেশী প্র্যাক্টিস করা পছন্দ করেন না, শুধুই গেম খেলতে চান, এবং অনেক সময় গেম জিতেও থাকেন, কিন্তু তার খেলার ইমপ্রুভমেন্ট আর হয় না। যে কটা গেম তিনি যেতেন, তাতে তিনি সন্তুষ্ট, দু একটা গেম মাঝে মাঝে হেরে গেলেও, তিনি খুব তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে পরের জনের সঙ্গে গেম খেলতে শুরু করেন, সেটি জিতবেন সেই আশায়।
একটা টুর্নামেন্টে জয়লাভ করে রাজা দাদুর টেবিল টেনিস খেলাটা ধংস হয়ে গেলো, এটাই দুর্ভাগ্য।

ইতিমধ্যে শেখরের কলেজ জীবনের বন্ধু এবং বহুদিনের সহকর্মী, যে তাদের বেঙ্গালুরু অফিস এ কর্মরত, সে কলকাতায় বেড়াতে আসছে। দীপক গ্রামের ছেলে, ফলে, কলকাতায় এলে সে শেখরের বাড়ীতেই আশ্রয় নেয়। তাছাড়া এই প্যানডেমিকের ধাক্কায় বেশ কিছুদিন না আসার ফলে শেখরের এই বৃদ্ধাশ্রমটিও তার এবং স্ত্রী মিতুর দেখা হয়নি। মিতুর সঙ্গে শেখরের স্ত্রী চাঁদনীরও বহুদিনের সখ্যতা। সেও খুব খুশী দীপক এবং মিতুর আসার খবরে।

পরের দিন শনিবার, শেখর খেলতে না গিয়ে, দীপকের সঙ্গে আসর জামালো একটি সিঙ্গল মল্টের বোতল খুলে। সঙ্গে সুইগি থেকে আনানো দু একটি স্টার্টার। কথায় কথায় তাদের সেই কলেজ জীবনের সময়বিহীন খেলার দিনগুলির স্মৃতিচারনাও এসে গেলো। সেই ডিনারের আগে খেলা শুরু করে ডিনারের পরে আবার কন্টিনিউ করে রাত একটা দুটো পর্যন্ত খেলার দিনগুলি। শেখর আক্ষেপ করে বলছিলো, সেদিনের ছ সাত ঘন্টা টানা খেলা এখন একটানা খুব বেশী হলে আধ ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে গিয়ে ঠেকেছে। মিতু আর চাঁদনী সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজ আর ক্যান্টিনের নিরামিষ নয়, বাড়িতেই রান্না হবে মাটন কষা। রান্না করতে করতেই তারা দুজনেই কিন্তু আড্ডায়ও সামিল।

রাজাকে চাঁদনী বোকা দাদু বলে রেফার করে এবং সে একটু আধটু তার TT খেলার গল্পটাও জানে, TT খেলার কথা শুনে সেই শেখরকে মনে করিয়ে দিলো, রাজার গল্পটা দীপককে বলার জন্য। গ্লাসদুটো রিফিল করে, শেখর দীপককে শোনালো রাজার জিতে, হেরে যাওয়ার গল্পটি। দীপকও reasonably দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বললো,

"রাজার এই গেম খেলা এবং জেতা এবং তারই সঙ্গে প্র্যাক্টিস করতে অপছন্দ, আজকালকার বাবা-মায়েদের কথা মনে করিয়ে দেয়, যারা একের পর এক টিউশনে পাঠিয়ে তাদের সন্তানের পরীক্ষার নম্বর বাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন।"

শেখরের হঠাৎ মনে পড়ে গেলো "কোটার IIT কোচিং এর গল্প জানিস তো? যেখানে গড়ে, প্রতি মাসে একজন করে ছাত্র আত্মহননের রাস্তা বেছে নিতে বাধ্য হয়!"
দীপক তার উত্তরে বললো "কিন্তু দেখ, আজ থেকে বছর পঞ্চাশ আগে, পশ্চিম বাংলায় অন্ততঃ ছাত্ররা গড়পড়তা ৯০/৯৫ শতাংশ নম্বর পেত না।

ভাষা বিষয়ে লেটার (৮০%) পাওয়াটাই এক আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল। আমরাই বা কত পেয়েছিলাম?"

শেখর মনে করিয়ে দিলো, "তুই ৭৫% আর আমি বাষট্টি!"

মিতু সব শুনে বললো "সেকাল আর একালে অনেক তফাৎ। রাজা হলেন একালের দাদু।"

শেখর যোগ করলো "তবে রাজা তো দাদু হয়ে গেছে, তার খেলা ইম্প্রুভ করুক না করুক, even রাজার তাতে যায় আসে না। তবে কিনা, আজকের স্কুল পড়ুয়াদের কিন্তু এই marks oriented শিক্ষা ব্যবস্থায় থেকেও learning oriented পড়াশুনা করতে শেখানো তাদের ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

চাঁদনী আর চুপ থাকতে না পেরে বললো "বোকা দাদু তো already ৬৫, আর কদিন বাদে টিকিট নিয়ে উপরে চলে যাবেন, কোটার মতো আমাদের এই আবদানা তেও সেই মাসে প্রায় একটা!"

দীপক হো হো করে খোলা গলায় একটু হেসেই কিন্তু থামলো আর বললো,

"কিন্তু স্কুলের এই বাচ্ছাগুলোতো দেশের ভবিষ্যৎ। এরাই তো ডাক্তার হয়ে লোকের চিকিৎসা করবে, এরাই লম্বা লম্বা ব্রিজ বানাবে। অবশ্য এদের মধ্যে অনেকেই code লিখবে, হয়তো ChatGPT র পরের ভার্সন এর জন্য। সবকিছুর জন্যেই তো, শেখাটা ভীষণ দরকার, শুধু খেলায় যেন তেন প্রকারেন জিতলেই তো আর চলবে না।"

শেখর প্রায় স্বগতোক্তি করলেন, "খেলা শিখতে হবে, শিখেই খেলা খেলতে হবে, তখন জিতলাম না হারলাম, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হবে খেলাটা আমি এবং দর্শকরা উপভোগ করলেন কিনা।" অল্প কিছুক্ষনের নীরবতার পর আবার আড্ডা শুরু হলো।

গন্ধ

প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য

দিবাকর ছোটবেলা থেকেই গন্ধ চেনে। একটু একটু করে তার চেনা গন্ধের ভাণ্ডার বেড়ে যাচ্ছে। গন্ধ কি একটা দুটো? হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ। দিবাকর শুনেছে, এই গন্ধ পায় বলেই কত প্রাণী বেঁচে আছে। মেরুভল্লুক মাইলের পর মাইল দূর থেকে সীলের গন্ধ পায়, বাঘ হরিনের, সাপ ব্যাঙের! মানুষ নাকি দশ লক্ষ গন্ধ মনে রাখতে পারে। গন্ধের স্মৃতি নাকি তার জিনে থেকে যায়, তার উত্তরপুরুষ সেই স্মৃতি বহন করে। কি করে দেহকোষ এতসব মনে রাখে, এটাই আজব! এই যেমন বৃষ্টি পড়লে দিবাকর শত শত গন্ধ পায়। এটা গন্ধরাজ, ওটা কাঠচাঁপা। আবার ওইটা পচা কাঁঠালের ভুতুড়ি, তার মাঝে মাটির কোখ থেকে নতুন চারার উদ্গম। সবাই যে গন্ধ পায়, তাও তো না, দিবাকর পায়। স্থলপদ্মের, রেলের পাথরের, পুরনো ডাকবাক্সের, মেলে দেওয়া রঙিন শাড়ির, আরও কতকিছুর। গান শেখার মতই যত্ন করে গন্ধ চেনা শিখতে হয়। একাজে তার গুরু ছিল তার পাড়াতো এক দাদু। সেই সিদ্ধেশ্বর দাদু তাকে হাতে ধরে গন্ধ চেনা শিখিয়েছিল। সেই দাদু বলত, 'যেই কোনও নতুন গন্ধ পাবি, ছিনে জোঁকের মত গন্ধটার পেছনে লেগে থাকবি। তার উৎস জানতে হবে, তার বাড়া কমা, তার ঘের কতটা, তার তীব্রতা, স্থায়িত্ব কতটা, কে তাকে বাড়িয়ে তোলে, কমিয়ে দেয়, এইসব খুঁটিনাটি জেনে নিবি। তারপর মনে মনে চর্চা করবি!' দিবাকর সেই কথাগুলো মেনে এসেছে যত্ন করে এতকাল।

দিবাকরের ইচ্ছে ছিল সেন্টের ব্যবসা করে। নানা গন্ধের সেন্ট। কিন্তু তার ইচ্ছে পূরণ হয় নি। যারা সেন্ট মাখে গায়ে, জামায়, তারা বড়লোক। আর বড়লোকেরা দামী কোম্পানির সেন্ট মাখে। অজানা অচেনা কোম্পানির সেন্ট মাখে না। তাই শেষমেশ দিবাকর ধূপের ব্যবসা শুরু করল। গাঁয়ে গঞ্জে ধূপ সবাই কেনে টুকটাক। আর তার সাথে বিরিয়ানির মিঠি আতর। সাদা সেদ্ধভাতে একফোঁটা দিলে ভুরভুর করে বিরিয়ানির গন্ধ বেরোয়। তার তৈরি ধূপের নাম হয়েছে অল্পবিস্তর, সেটা ধূপের গন্ধের জন্যেই। গন্ধের কাজ খুব সাবধানে করতে হয়। কম বেশী হলে গন্ধ পালটে যায় যে। দিবাকর দেখেছে গন্ধও কিভাবে বদলে যায়। প্রথমে এক ধরণের গন্ধও, অন্যদের থেকে আলাদা বলে চিনিয়ে দেয়। সে গন্ধও আস্তে আস্তে অন্য একটা মিঠে গন্ধে পালটে যায়। সেটাই লোকের মনে থাকে। তারপরেও আবার যখন একটু পুরনো হয়, তখন সেই গন্ধও স্নিগ্ধ একটা স্মৃতি রেখে যায়। যেমন চন্দন, চাঁপা, বেলফুল। সেরকম প্রত্যেক মানুষের আলাদা আলাদা গন্ধও থাকে। শিশুকালে তা বোঝা যায় না, কিন্তু বড় হবার সাথে সাথে গন্ধ আলাদা হয়ে যায়। আর এই গন্ধের মিল হলেই শরীরে কামনা তীব্র হয়। যোনিরসে, বীর্যে, লালায়, শীৎকারে মিশে সে এক অদ্ভুত রসায়ন।

দিবাকরের কারখানা বড় হয়েছে। দুজন কাজের লোক। গন্ধটা দিবাকর বানায়, সেই গন্ধ মিশিয়ে ধূপ বানায় শ্যামলী আর রতন। দুজনেই প্রতিবেশী। দিবাকরের বৌ কল্যাণী ঘর সংসার ছেলেমেয়ে নিয়েই ব্যস্ত। কল্যাণীর গন্ধ দিবাকর চেনে। এতদিনে সে গন্ধ তার কোষে সেঁধিয়ে গেছে। তবু শ্যামলীর গন্ধ আজকাল দিবাকর বড় বেশী পায়। শ্যামলীর বর অর্জুন দিবাকরের ছোট থেকে চেনা। সে বড় একগুঁয়ে, রগচটা, সেটা দিবাকর জানে। তবু শ্যামলীর গন্ধটা বড় তীব্রভাবে দিবাকরকে টানে। দিবাকর বই পড়ে জেনেছে, গন্ধের তিনটে ভাগ। টপ নোট, হার্ট নোট আর বেস নোট। শ্যামলীর শরীরের টপ নোট হাতছানি দেয় দিবাকরকে। দিবাকর বুঝে নিতে চেষ্টা করে বেস নোট কেমন হবে? দিবাকর জানে মানুষের শরীরে হাজার হাজার হরমোন খেলা করে, তারাই গন্ধ তৈরি করে, ছড়ায়। মানুষ তো এই হরমোনের কাছে বাঁধা পড়ে যায়। সবকিছু ভেসে যায় খড়কুটোর মত। কল্যাণীর গন্ধও তো এ ভাবেই দিবাকরকে

ডেকেছে দিনের পর দিন। একদিন বাদলদুপুরে রতন ছিল না। দিবাকর শ্যামলীর শরীরের গন্ধ শুঁকল চরম আশ্লেষে। শ্যামলীও শুঁকল অন্য এক পুরুষের গন্ধ। তারপরেই ছুতোয় নাতায় রতনকে মাল ডেলিভারির জন্য পাঠাতে লাগল দিবাকর। এমনই এক দুপুরে রতনকে খুঁজতে এসে অর্জুন দেখল দিবাকর আর শ্যামলীকে রমণবিহারে। নিঃশব্দে চলে গেল অর্জুন। কিন্তু দিবাকরের নাকে এলো চেনা গন্ধের। দিবাকর অনেক গন্ধ একসাথে পেলো, ভয়ের, প্রতিহিংসার, ঘৃণার! সব ছাপিয়ে আরও একটা গন্ধ বইতে লাগল বাতাসে। গন্ধটা কি, দিবাকরের ঠাওর হল না। গন্ধটা দিবাকরকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

রাতে দিবাকর শুয়ে আছে জানালার পাশে। অন্য চৌকিতে কল্যাণী তার ছেলে মেয়ে নিয়ে। জানালায় এসে দাঁড়াল অর্জুন। ঘুমের মধ্যেও দিবাকর তার গন্ধ পেলো। আর তখনই ওয়ান শটারের ঘোড়ায় চাপ দিল অর্জুন! কত আর দূর হবে? বড়জোর তিন হাত। ধাক্কা খেয়ে নড়ে উঠল দিবাকরের দেহ। বারুদের পোড়া গন্ধ নাকে এসে লাগল। কি আশ্চর্য! মরে যেতে যেতে দিবাকর শেষ অব্দি সেই অচেনা গন্ধটা চিনতে পারল। সে গন্ধ মৃত্যুর!

বিশ্বাস অবিশ্বাস

বাসবদত্তা কদম

ক্যারর...ক্যারর...

-এত রাতে কে এল?

-কাকিমা তুমি এত রাতে? মা! শেলি কাকিমা

একগাল হেসে, শাড়ীর আড়াল থেকে মিষ্টির প্যাকেট টা বাড়িয়ে দিল।

-বাপীর বিয়ে

ঠিক হয়ে গেল। তোর মা কোথায় রে?

-কার বিয়ে ঠিক করলে শাল্মলী?

পুরো পাড়ায় মা'ই একমাত্র, যে শেলি কাকিমাকে শাল্মলী বলে ডাকত।

-বাপীর গো রমা দি।

-শুনছ! একবার এদিকে এসো। শাল্মলী এসেছে, বাপীর বিয়ে। বাবাকে ডাক দেয় মা।

মা বলে, -মেয়ের বাড়ির লোক কি সব ঝামেলা করছেন বলেছিলে না...? বিশ্বাস বাবু গেছিলেন?

-হ্যাঁ রমা দি, উনি গেছিলেন তো। তোমরা তো জানো, উনি খুব ব্যস্ত থাকেন, সময়ই পান না। তবে এবার আমি বলেছি, তুমি না গেলে আমাদের ছেলের বিয়ে হবে কি করে! আগে ছেলে না অফিস? ঠিক বলিনি বলো?

-বাঃ এতো খুব ভালো কথা। বসুন। তুমি একটু চা করে আনো। আমি ততোক্ষণ গল্প শুনি।

-না দাদা, এখন বসব না। ওরা বসে আছে একসঙ্গে খাবে বলে। কাল সকালেই আবার উনি বেরিয়ে যাবেন। বাবাকে উত্তর দিয়েই শেলি কাকিমা উঠে দাঁড়ায়।

মা বাবার দিকে একবার তাকায়।

-কাল আসব রমাদি। আজ এলাম শুধু ভালো খবরটা দেব বলে। তোমার থেকে আপন এ পাড়ায় আমার তো কেউ নেই।

-বড়দি, শেলিদি এসেছে? ছোট কাকিমা ঘরে ঢোকে।

-বাপীর বিয়ে রে মুন!

-বাব্বা সব জেনে শুনে মেয়ের বাড়ি থেকে দিচ্ছে?

-নিশ্চয় দিচ্ছে। তাই হচ্ছে।

-কি জেনেশুনে গো কাকি?

আমার একটু পিএনপিসি বেশ লাগে। মায়ের জন্য পারি না।

-তুই থাম তো মুন। অনেক রাত হলো, এবার ঘুমাতে যা। আমার খুব ক্লান্তি লাগছে।

ছোট কাকিকে চুপ করিয়ে, আমার কৌতূহলে জল ঢেলে, মিষ্টির প্যাকেট টা মা ফ্রিজে ঢোকায়।

#

বাপীর বিয়েতে বরযাত্রী, বৌভাত। সব মিলিয়ে একটা বেশ ঘ্যাম্মা বিয়েবাড়ি গেল। আমার ঝাড়ি মারবার জন্য বাপীর শালাটা হেব্বি ছিল। কিন্তু আমার দশপ্রহরণ ধারিণী মাতা দেবী! ঘটতে ঘটতেও এবারও আমার প্রেম টা ঘটতে দিলেন না। এ মহিলা মনে হয় আমায় বিয়ে থা হতে দেবে না! নাহলে, অমন স্মার্ট লুকের ডাক্তার ছেলেও পছন্দ হল না।

মাস ছয়েক কেটে গেল। বাপী বৌ'কে নিয়ে ওর নতুন কেনা লাল টুকটুকে মারুতিতে করে ঘুরতে যায় নিয়ম করে।

আমি পার্ক স্ট্রীটের পাশে রাসেল স্ট্রিটে একটা অফিসে কম্পিউটার অপারেটারের চাকরি পেলাম। পনেরো হাজার হাতে দেবে। বাবা বলল,

-শুরু হিসাবে কিছুই খারাপ না।

মেট্রো থেকে নেমে ওটুকু পথ হেঁটেই যাই।

দু একদিন মেট্রোতে বাপীর বৌ'এর সঙ্গে দেখা হয়।

ওদের চার্টার্ড একাউন্টেন্সির ইন্সটিটিউট এদিকেই। দেখা হলে, নিজেই হেসে কথা বলে। বলল, বাপী ওর টিচার ছিল।

জানতাম। কিন্তু কিছুই বললাম না।

বাপী যা র‍্যালা নিয়ে থাকে পাড়ায়। কে বলবে ও আমাদের সঙ্গে পড়ত! নিজে চার্টাড একাউন্টেন্ট বলে যেন মাটিতে পা পড়ে না।

#

সেদিন দেখি পার্কস্ট্রীট মেট্রো স্টেশনে একা দাঁড়িয়ে আছে বাপীর বৌ শ্রীরাধা।

-শ্রীরাধা! বাড়ি ফিরছ? যেন শুনতেই পেল না। আমি এগিয়ে যেতেই খানিক দূরে সরে দাঁড়াল। আশ্চর্য অভদ্র মেয়ে তো। কি এমন হল কথা না বলার মত! চা খেতে খেতে সেদিন কাকিকে বললাম, -শ্রীরাধা মেয়েটা এত অভদ্র!

-শ্রীরাধা কে?

-বাপীর বৌ কাকি।

-টুসি, ও কথা বলবে কি! বাপীর আর ওর তো ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। মেয়েটা চলে গেছে এ বাড়ি ছেড়ে।

-চলে গেছে? এক বছরও তো হয়নি বিয়ে হল।

-বিশ্বাসদার দুটো বিয়ে নিয়ে প্রবলেম। বাপী নাকি বিয়ের আগে এটা ওকে জানায় নি।

-দুটো বিয়ে মানে? কি বলছ কাকি!

-হ্যাঁ তো! অফিসের এক মহিলা কে বিয়ে করেছে, বাপী তখন এত্তটুকু।

-বাপীর মায়ের সঙ্গে সেই কবে, ডিভোর্স হয়ে গেছে তবু বিশ্বাসদা আসেন। থাকেন।

-কি বলছ? শেলি কাকিমার মত দাপুটে মানুষ মেনে নিল? ডিভোর্স হবার পরেও...

-ছেলেটাকে তো বড় করতে হবে। বাড়ি তো বিশ্বাসদার নামে। বেশি তেজ দেখালে শেলিদির শ্যাম কুল দুই'ই যেত। শেলিদির বুদ্ধি আছে, তাই মেনে নিয়েছে।

-কার বুদ্ধি আছে রে মুন?

-মা! সব্বনাশ করেছে।

-না বড়দি, টুসি বলছিল...।

-থাক! থাক! শাকে মাছ ঢাকা যাবে না। দেখলাম দুজনে বসে মন দিয়ে পাড়ার গেজেট উদ্ধার করছিলি।

-না মা শ্রীরাধা যে বাপীকে ছেড়ে চলে গেছে...।

-ছেড়ে কিছু যায় নি। এখন বাপের বাড়িতে আছে। বাপী চেষ্টা করছে ওকে ফিরিয়ে আনতে।

-মা! বিশ্বাস কাকু আর শেলি কাকিমার...!

-ডিভোর্স হয়ে গেছে। তবুও বিশ্বাসদা আসেন, থাকেন। শেলি কিভাবে মেনে নেয়! এটাই বলবি তো।

-হ্যাঁ মানে...।

-প্রতিবাদের একটা জোর লাগে। এটা মানবি তো। বিশ্বাস কে বিয়ে করবার অপরাধে ব্যানার্জি ফ্যামিলি শাল্মলীকে ত্যাগ করে এ পাড়ার বাস উঠিয়ে চলে গেছে। সব ডানা যার ছাঁটা, কার ভরসায় সে করবে প্রতিবাদ!

-মা!

-হ্যাঁ! বাপী তখন দুধের শিশু। বিশ্বাসদা এই কান্ড ঘটালেন। ছেলেকে আঁকড়েই জীবন হল ওর। বিশ্বাসদা আগে সপ্তাহে একদিন আসতেন। শ্রীরাধা ওনাকে এ বাড়িতে ঢুকতে মানা করে দিয়েছে।

সন্ধ্যা বলল, -সেই থেকে শাল্মলী চিলেকোঠার ঘরে ঠাকুর দেবতার সঙ্গে নিজেকে বন্দী করেছে। তবু যদি বৌ'টা ফিরে আসে ওর ছেলের কাছে।

-এত পুরনো কথা শ্রীরাধা জানল কিভাবে!

-উপকারী মানুষের অভাব আছে নাকি পাড়ায়! বিদ্রুপ ঝরে পড়ে মায়ের গলায়।

-এতে বাপীর বা শেলি কাকিমার কি দোষ!

-শ্রীরাধা বাপীকে বলেছে বাড়ি ওর নামে লিখে দিলে ফিরে আসবে। নাহলে নয়।

-নাহলে সে মিউচুয়াল ডিভোর্স চায়।

#

মাঝখানে বেশ কিছুদিন চলে গেছে। আমার একটার পর একটা সম্বন্ধ ক্যানসেল হচ্ছে। কেউ চাকরি করতে দেবে না। কারুর দাবী অন্য অনেক কিছু যা আমার বাবার সাধ্যের বাইরে।

চাকরিটা বদলে ফেলেছি আমি। সরকারী চাকরির পরীক্ষার জোর কদমে প্রস্তুতি নিচ্ছি।

ক্যাররর... ক্যাররর...

-এত বিশ্রী ভাবে বেল কে বাজাচ্ছে?

-বড়দি! শেলিদি...। কাকিমার চোখে কিরকম ভয়।

হুড়মুড়িয়ে নামে মা। পিছনে আমি।

-রমাদি! আমার বাপীর বিয়ে ঠিক হয়েছে। এটা রাখো। খালি দুটো হাত, একটা প্যাকেট তুলে দেবার ভঙ্গি করে।

-বিয়ে! আবার! আগোছালো শেলি কাকিমাকে দেখে আমার কিরকম অস্বস্তি হয়।

মা বলে, -শাল্মলী তুমি শান্ত হও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

-আমি ঠিক আছি রমাদি! খুব ভালো মেয়ে! বাপীর নিজের পছন্দ। উনিও দেখে এসেছেন।

-রমা কাকি-ই! আমাদের কাকিমাকে দেখেছ? বাপীদের কাজের বৌ সন্ধ্যা ডাকছে।

-হ্যাঁ এসেছে। এখানেই আছে।

-দরজাটা একটু সময় খোলা ছিল, বেরিয়ে এসেছে। কোথাও পাচ্ছি না। বৌদি চলে যাবার পর থেকেই কাকি এরকম হয়ে গেছে।

-আর বক্তৃতা দিতে হবে না। কাকিমাকে নিয়ে বাড়ি যাও। মা সন্ধ্যাকে ধমক দেয়।

সন্ধ্যার বক্তৃতায় বাধা পড়তে সে ঢুকে কাকিমার হাত ধরে। -চলো কাকিমা বাড়ি চলো। দাদা বাড়ি ফিরে, তোমায় না দেখলে কিরকম কষ্ট পাবে!

-হ্যাঁ। হ্যাঁ চল্। আসি রমাদি। পরে আসব।

আমার মায়ের শাল্মলী, একটা ঝড়ে ঝাপটানো লতানে গাছের মত সন্ধ্যার কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটে মিলিয়ে যাচ্ছে সন্ধের রাস্তায়। ছোট থেকে দাপুটে শেলি কাকিমাকে কোনদিন এরকম ভেঙেচুড়ে মুড়িয়ে নটেগাছ হয়ে যেতে দেখিনি।

বুড়া ও কবুতর

প্রনব বসু

মে ৩ -বুড়ো

বুঝতে পারছি অনেক ঝড় জলের সংগে এতদিন পাঞ্জা লড়াইয়ের পর এখন আঁকড়ে থাকার মাটিটা এই ছেষষ্টি বছর বয়সে নরম হতে শুরু করেছে। এখন পথ চলা ধীরে ধীরে সংশয় সঙ্কুল কঠিন হবে। সময় তার বরাদ্দের হিসাবের খাতা নিয়ে বসেছে। আর নয়, এখন দরকার নির্ভার নিরাপদ আশ্রয়। নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসযোগ্য বিশ্রামের পান্থশালা। মাথার ওপর নিশ্ছিদ্র ছাদ, পা আঁকড়ে ধরা হোঁচট বিহীন সংবেদনশীল মেঝে, অবাধ উন্মুক্ত আলো বাতাস বুক খোলা জানালার সব সময়ের সঙ্গী- এরকম একটি ঘর। সেখানে বেঁচে থাকার, বাঁচিয়ে রাখার- খাওয়া থেকে শোওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দূষণমুক্তির দিকে সব সময় নজর, চব্বিশ ঘন্টা আস্থাময় চিকিৎসা থেকে চিন্তাহরন পাহারাদার, বাইরের যে কোন প্রয়োজনে সর্বমঙ্গল সাহায্যের সংবেদনশীল শক্ত হাত। হয়তো বা একটি যথার্থ বৃদ্ধদের আশ্রম।

মামা বুড়ো ভাগ্নের এই দিবা স্বপ্নের কথা অন্যদের মত সোনার পাথর বাটি না ভেবে, আমি জানি, উৎসাহ দিতেন, "খোঁজ, পেয়ে যাবি। বিদেশে কত দেখেছি, এদেশে নিশ্চয় আছে। দেশটাতো এগুচ্ছে।" অল্প কথার মানুষটা, প্রচণ্ড আশবাদী। অথচ সারাটা জীবন একা, নিজস্ব ব্যাবস্থাপনায় অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে গেলেন।

মামার কথাটা কিন্তু এখন কথার কথা নয়। কারণ যেমনটি খুঁজে ছিলাম, ঠিক তেমনটি আমি পেয়ে গেলাম। তবে ঘরে পা দিয়েই যেটা চোখে পড়লো, সেইটা আমি ঘরের সঙ্গে চাইনি।পায়রার ডিমটা!

মে৩- কবুতর

অনেক দিন খালি ছিল। দিন নয়, মাস নয়, বছর বলাই ভাল। আগে ছিল এক মেয়েমানুষ। মাথাভর্তি সাদা চুল, ফোকলা তোবড়ানো মুখ। আজ এলো টাক-মাথা এক বুড়ো। লম্বা সটান চেহারা। ঘরে ঢুকেই সোজা এই জানালায়। যেন এ ঘরের বাসিন্দা সে বহু দিনের। জিজ্ঞেস করলে চোখ বুজে বলে দিতে পারবে সব। চার দেওয়ালের রঙ কি? হালকা সবুজ। ক'টা জানলা? দু'টো। কোন দিকে? সামনে আর বাঁদিকে। এরকম ভাবেই তিনতলার ঘরের নিত্য সঙ্গী সাজানো গোছানো আসবাবপত্র বালিশ বিছানা টিভি বাথরুমের ঠিকানা। সব সব যেন চোখ বুজে বলে দেবে। ঠিক সেই আত্মবিশ্বাস উপচে পড়া পদক্ষেপ। সটান এসে আমার বুক কাঁপিয়ে সশব্দে পাল্লা দু'টো খুলে দিল।

মে ৩-_ বুড়ো

গলায় কোন আর্ত আওয়াজ না করে পাখা ঝাপটিয়ে বাতাস কাঁপিয়ে তিন ফুট দূরে আলো হাওয়া আটকে দেওয়া চারতলা অট্টালিকার শ্যাওলার গালিচা পাতা সবুজ কালচে আলসেয় গিয়ে বসে। ওই পায়রাটা যে পুরুষ পায়রা, সেটা আমি ভালমতই জানি কারন মামার বাড়ি অনেক পায়রা দেখেছি ডিমে তা দিচ্ছে, যাদের দেখিয়ে তিনি একদিন বলেছিলেন – ওগুলো পুরুষ কবুতর। কেন যে মামা ওদের পায়রা না বলে কবুতর বলতেন জানিনা। মামার কাছে কবুতর প্রসঙ্গে আরও কিছু জেনেছি। জেনেছি ওদের সমাজে ঐ রকমই নিয়ম, সারা রাত্রি সঙ্গিনীর উমানোর দায়িত্ব, দিনের বেলায় সঙ্গীটির, কারন হয়তো দিনের আলোয় বিপদ বেশী তাই চরম সুরক্ষার প্রয়োজনে পুরুষ পাহারা, কিংবা মনুষ্য সমাজের মত ওদেরও পুরুষদের হাতে সমাজ শাসনের চাবিকাঠি, ভাগ্যবান নিজেদের চরম সুখ সাচ্ছন্দের দিকেই নজর বেশী। ফলে দিনের খাদ্য আহরণের দায়িত্ব মেটাতে সঙ্গিনীটির পাখনায় মুহুর্মুহু ভাসা, আর ধারাবাহিক দিনের পর দিন বিরামহীন ষোল সতের দিন রাতের শীতলতা অমান্য করে শরীরের উত্তাপে সূর্যালোকে ভেসে যাওয়া শস্য শ্যামল এই উজ্জ্বল পৃথিবীর বুকে আরেক নতুন জীবন নিয়ে আসা । এবং শুধু তাই নয়, পরে তাকে লালন পালনের ভার, তার দু' পাখনায় সাহস সঞ্চার করে সুনীল আকাশের সীমানা জরীপ করার মন্ত্র শেখানোর ভার, সবই তার ওপর। এই জীবন পরিক্রমা চলে বছরে দু'তিন বার, বছর বছর, প্রতিবার দু'টো,

কখন একটা, হালকা সবুজের আভাষ মাখা উপবৃত্তাকার সাদাটে ডিম। এই জীবন যাত্রায় পুরুষের ভার ভোজন ভ্রমণ নির্ভার আরামে শয়ন, অবশ্যই নিজের তাড়নায় অবিরল রমন। মামার সব বিষয়ে ছিল অবাধ গতায়াত। ছিলেন মানবপ্রেমী, সমাজসেবী, প্রকৃতিপ্রেমী অর্থাৎ চারপাশের যা কিছু আমাদের দৃশ্য শ্রবণ ঘ্রাণ সঙ্গ হৃদয় অনুভূতি লালন করে, জারিত করে, সেই সবকিছুর একনিষ্ঠ আপনজন। মানুষজন, গাছগাছালি, ফুলপাতা, পশুপাখী ভীষণ ভালবাসতেন।

জানুয়ারী ১- মামা

বুড়োটা চিরটা কালই এক রয়ে গেল। নামে, কাজে, স্বভাবে। ভালবাসা, আপন ভেবে কাউকে কাছে টেনে নেওয়া ওর ধাতে নেই। আত্মীয় পরিজন অনেকে ওকে ভুলেছে। বন্ধুও তেমন নেই। কারো সঙ্গে তেমন যোগাযোগ ছিল না। বাইরে বাইরে চিরটা কাল কাটিয়ে দিল। নানা কাজে সবসময় ব্যাস্ত। বৌমারও একই ব্যাপার ছিল। বোধহয় সন্তানহীনতার দুঃখ ভোলার জন্যে, কিংবা পরবাসে থাকার মেকি উচ্চমন্য মানসিকতার প্রভাবে, পদমর্যাদার অহঙ্কারে ওরা ভৌগলিক দূরত্বটার সঙ্গে মনের দুরত্বটা স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিল। এখন বুড়ো একা, মনে হয়না ওর কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তবু কেন জানিনা ব্যাতিক্রম হিসাবে চিরকাল আমার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসার সম্পর্কে যথেষ্ট আন্তরিক।

মে ৪ - কবুতর

তখনও ঠিকমত ভোর হয়নি। পেঁচাগুলো শেষ রাতটাকে করাত চেরা গলায় বিদায় জানিয়ে যে যার ডেরায় ফিরে গেছে। এবার তাদের দিবানিদ্রা। অন্যেরা এখন জাগছে। কাক কোকিল শালিক। বুড়োটাও জাগলো। উঠেই আলো জ্বেলে সজোরে জানালাটা খুলে দিল। পাল্লাটা দেওয়ালে ধাক্কা খায়। আলো আঁধারির পরিবেশটা কাঁপিয়ে আওয়াজ ওঠে। আমার বৌটা ভয় পায়। বাসা ছেড়ে ওড়ে, সঙ্গে আমিও অন্য কার্ণিশের নিরাপদ আশ্রয়ে। বুড়োটা কাল সারাদিন জানালাটা খোলেনি। আমরা নিশ্চিন্তে দিন কাটিয়েছি।

পরমুহূর্তে একটা খয়েরি রুমাল নাকে চেপে ধরে পাল্লাদু'টো বন্ধ করে দিল। ঘৃণায় তার নাক কুঁচকানো। সারা মুখে অসন্তুটির ছায়া। বাথরুমে যাওয়ার কথা ভোলে। বিছানা তোলার কথা ভোলে। অস্থির হয় তার ঘরেতে পায়চারী। পরনে আন্ডারওয়ার আর হাতকাটা গেঞ্জি। প্রায় অর্ধ উলঙ্গ। ওই বেশেই হ্যাঁচকা টানে দরজা খোলে। ঝড়ের বেগে বেড়িয়ে যায়। বোঝাই যায় রাগে দিশাহারা। একটু বাদেই পাহারা দেবার দারোয়ানটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল বন্ধ জানালাটার সামনে। বুড়োর নাকে তখনও সেই খয়েরি রুমাল। জানালার পাল্লাদু'টো আবার দড়াম করে খোলে। এ আওয়াজে আমাদের বাছা ডিমের মধ্যে নিশ্চয়ই কেঁপে উঠেছে। আমরা তো বটেই। বুড়োটা গলা চিরে চেঁচায়। আঙুল দিয়ে লোকটাকে বাসাটা দেখায়। কার্নিসের একদম কোণে খোলা পাল্লার পেছনের খোঁদলটায় ধাপে ধাপে সাজানো শুকনো খড়কাঠির বাসা। লোকটা পাল্লার নীচের ফাঁকটায় হাত ঢোকায়। চেষ্টা করে বাসাটা ভাঙতে। হাত পৌছয় না। অনেক ভাবে চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দেয়।

নভেম্বর ৫ - মামা

বুড়ো প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে। আজ ছ'মাস হতে চললো বৌমা নেই। নিঃসন্তান, একা, পরের বাড়ী থাকে, তাই মনে বেশ কষ্ট | কত বলি, " আমার মত ব্যাবস্থা করে নিজের মত স্বাধীন ভাবে থাক। তোর টাকার তো অভাব নেই।" তা নয়, বলে, "এতো এক রকমের সংসার, বকলমে সংসার। সেই বাজার হাট, রান্নাবান্না, বসত বাড়ির দেখাশোনা, এটা ভাঙলো ওটা ফাটলো, ছুতোর মিস্ত্রী রাজ মিস্ত্রী জলের কলের মিস্ত্রী এসব নিয়েই থাকা।" তার কথায় সংসার মানে বৌ, তার অবর্তমানে এসব করার দরকারটা কি? সে বলে, "জন্মের থেকেই আমরা এক অদৃশ্য কাঠগড়ায় বন্দী। দুই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন শাসকের অধীন। একজন হলো অমোঘ মরন পর্যন্ত হাতে তোমার জন্যে নির্দিষ্ট 'সময়', আর অন্যজন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনুশাসন, সামাজিক নিয়ম। পায়ের এই দুই বেড়ি নিয়ে আমি এখন শুধু চাই এই শরীরটাকে নির্ঝঞ্ঝাটে যতদিন সম্ভব

চলমান রাখার জন্যে তিনবেলা বেঁচে থাকার এক বাধ্যবাধকতাহীন নিরুপদ্রব ব্যাবস্থা। তাই বৃদ্ধাশ্রম।"

তার এই গুরুভার দার্শনিকতা লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, কিছু আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধব বুড়োর সাহায্যে হাত বাড়ায়। তার অসামাজিক আচরণে যারা নিজেদের এতকাল অভিমানে দুরে সরিয়ে রেখেছিল তাদেরি কয়েকজন বুড়োর অসহায় অবস্থা দেখে সমবেদনায় স্বেচ্ছায় বুড়োর ভার নিতে চাইল।

অবশ্য সংসারে দুর্জনের অভাব নেই। তারা বলে বেড়াতে লাগলো, "ওদের আসল নজর বুড়োর সম্পত্তির ওপর।"

সমব্যাথীদের একজন বলল, "ছাদের ঘরটা খালি পড়ে আছে। নিজের মত থাকবে। চলে এসো কাকু ।"

আরেকজন বলল "চিন্তা কিসের মামাবাবু। এই গরীব বোনপোটা থাকতে বৃদ্ধাশ্রমে যাবে কেন? বলতো কালই তোমার মালপত্তর নিয়ে আসি"

বন্ধু স্থানীয় একজন বলল, "রাখ তোর দর্শনতত্ত্ব। আমাদের একজন হয়ে থাকবি। বৌটার মনটা ভালরে। সেদিক দিয়ে আমি খুব লাকি। দেখিস পাতান ভাসুরের দেখাশোনাতে কোন ত্রুটি রাখবে না।"

এত স্নেহচ্ছায়ার হাতছানিতে বুড়ো দ্বিধায় পড়ে। পরখ করে দেখার ইচ্ছে হয়। গত মে থেকে এই ছ'মাসে কম করে চারজনের অনুরোধে তাদের সংগে থেকেছে। দিন পনের কুড়িতেই প্রতিটি আশ্রয় নানাভাবে ওকে বুঝিয়েছে এই জীবনব্যাবস্থা ওর জন্যে নয়।

ডিসেম্বর ১৫ - বুড়ো

এ বাড়িতেও আমি অবাঞ্ছিত। আড়ি পেতে শোনা স্বভাবে নেই। অত নীচে নামার প্রবণতাকে মনেপ্রাণে ঘেন্না করি। তবু রাতের অস্থির ঘুমের শেষে সবে তন্দ্রার গাঢ়তা যখন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সেই সময় পাশের ঘর থেকে ভাগনে বৌয়ের কষ্টসাধ্যে চাপা গলার বিরক্তি ভরা ক্ষুব্ধআওয়াজ শুনতেই হলো, "যত সব উটকো ঝামেলা। সারাদিন ওর জন্যে বেগার খাটতে শরীর গেল। এতদিন কোন খোঁজ খবর নেয়নি। এখন কষ্টে পড়ে এসে জুটেছে।" কাণে বালিশ চাপা দিই।

আমার মামার ব্যাপার আলাদা। পঁচিশ বছর আগে যখন অবসর নেন, তখনকার পৃথিবী আর এখনকার পৃথিবীর অনেক তফাৎ। তখন মানুষের শরীরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে মোবাইল ছিলনা। এযেন জীব কুলের ক্রমবিকাশ সংযোজনে আর এক ডারউইনি ধাপ। মল মেট্রোর এত চল, ঘরে বসে ল্যাপটপে অফিসের কাজ করে রুজি রোজগার করা এসব স্বপ্নেও তখন কেউ ভাবতে পারেনি। সাধারণ মানুষ সাধারণই ছিল, খণ করে ঘি খাওয়ার প্রবনতা এতটা ছিলনা, জীবনে টাকা পয়সা প্রয়োজনের হাজারগুন বেশী আহরণের এত লোভ বা আমোদ প্রমোদের এত নেশা সর্বসাধারনের মন তখনও কলুষিত করেনি।

সে সময় ভালবাসা দিয়ে মানুষের মন জয় করা যেত, তারা সুজনকে হৃদয়ে শ্রদ্ধার প্রীতির আসনে বসাত। এখন হৃদয় জয় নয়, মানুষের কলজেটা হাতের মুঠোয় কব্জা করাই হলো উদ্দেশ্য। তার জন্য এখন দরকার বৈভবের আলোকচ্ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া, দরকার নজরকাড়া প্রভাব প্রতিপত্তির অশালীন প্রদর্শনে ভয়ের এক আবহাওয়া সৃষ্টি করা, যার ফলে সবাই মাথা নত করে অলিখিত দাসত্বের হলফনামা গচ্ছিত রাখে।

শহর থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দুরের গ্রামের একাংশের সবার দাদাবাবু হিসাবে মামা ভালবেসেই মন জয় করে নিয়েছিলেন, সেই অত বছর আগে। সবার কি আপন লোকটাই না হয়ে গিয়েছিলেন তিনি! একরকমের ভবঘুরে মানুষ, অকৃতদার, বিরাট নামকরা বিদেশী ওষুধ কোম্পানির সবচেয়ে অধস্তন ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতার পদ থেকে অধ্যাবসায়, নিষ্ঠা, সততা ও যোগ্যতার গুণে, ধাপে ধাপে খুব অল্প সময়ে বিপণন ও বিতরণ বিভাগের সর্বোচ্চ পদে পৌছেছিলেন। বৈভব, বিক্রেতাদের আনুষ্ঠানিক জমায়েতের অঙ্গ হিসাবে নানা প্রলোভন তার মূল্য বোধ ও সাত্বিক জীবন যাত্রায় বিন্দুমাত্র ফাটল ধরাতে পারেনি। এহেন মামা যখন অবসর নিয়ে ঠিক করলেন শহরের যান্ত্রিক প্রাণহীন জীবন থেকে তখনও কিছুটা টিকে থাকা ছায়াঘন গ্রামের অলস পরিবেশে বাকী জীবনটা কাটাবেন, তখন কেন জানি কেউই অবাক হয়নি।

মে ৫- কবুতর

বুড়োটা আমাদের অবাক করেছে। এই জায়গাটা আমাদের অনেক বছরের। এখান থেকে আমাদের অনেক বাছারা বড় হয়ে আকাশে উড়েছে।এঘরটায় অনেক জন এলো গেল। কেউ আমাদের নিয়ে অত মাথা ঘামায়নি। কারন বোধহয় পাশের বাড়িটা একদম গায়ে গায়ে লাগান। দু'বাড়ির জানালার পাল্লা একই সময় খোলা মুশকিল। খুললে ঠোকাঠুকি হবার জোগাড়। যথেষ্ট আলো হাওয়া আসে না। সেইজন্যে জানালাটা কোন কাজের নয়, থেকেও নেই। আগের বাসিন্দারা বড় একটা খুলত না। মুশকিল হলো নতুন বাসিন্দা বুড়োটাকে নিয়ে।

এই বুড়োটা অন্য রকম। সব সময় জানালা খুলে রাখা বাতিক। আলো বাতাস প্রসঙ্গ নয়। আজ সকালে উঠেই আবার দারোয়ানটাকে ধমকাল। "কাল সারাদিন কি ঘুমাচ্ছিলে? আজ বাসাটা ভাঙতেই হবে। না হলে ওপরতলায় নালিশ যাবে।" ওপরওয়ালার নামে দারোয়ানটা ভয় পায়। আবার অনেকভাবে চেষ্টা করে। জানালার পাল্লাটাই আসল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ওটা খুললেই বাসাটা খোলা পাল্লার পিছনে আড়াল হচ্ছে। তলা দিয়ে হাত যাচ্ছেনা । আবার খোলা পাল্লার বেড় ঘুরে চেষ্টাও বিফলে যাচ্ছে। হাত তো আর রাবারের নয়, যে ইচ্ছামত দুমড়ে মুচড়ে লম্বা করে ঠিক জায়গায় পৌছে যাবে। দারোয়ানের সঙ্গে ঘর পরিষ্কারের চাকরানিটিও হাত লাগায়। কোন কাজই হয়না। বিকালে ম্যানেজার এলেন। তার ঠাঁট বাঁট, চলন বলন গুরুগম্ভীর। কথা বলেন কম, ভাবেন বেশী। তবে যখন বলেন, তখন নায়েগ্রা প্রপাত। দারোয়ান বুঝিয়ে দিল কেন ওর চেষ্টায় কাজ হচ্ছেনা। ঠিক হলো পাল্লাটা খুলতে হবে। ছুতোর মিস্ত্রীর ডাক পড়লো। মিনিট পনের লাগলো মিস্ত্রীর আসতে। এই পনের মিনিট ম্যানেজার কাজে লাগালেন। তার মনে হোল ম্যানেজার হিসাবে তার পদমর্যাদার সম্মান, দায় দায়িত্বের গুরুভার, বুড়োটাকে জানান দরকার। সবে এসেছে। "এটা সামান্য ব্যাপার। পায়রার ডিম! তাই নিয়ে ওকে অহেতুক ফোন করা। এটা নিজের বাড়ি নয়- বৃদ্ধাশ্রম। সব কিছু মনোমত হয়না। মানিয়ে নিতে হয়।" ম্যানেজারের বকৃতৃতা তখনো শেষ হয়নি। এমন সময় ছুতোরের আবির্ভাব। বুড়োরও প্রতিক্রিয়া মাঝপথে, আরেকটু সময়ের দরকার ছিল। তাহলে এই বকৃতৃতাবাজকে বুঝিয়ে দিত ওর মত হেজিপেঁজি চাকুরে ও অনেক দেখেছে। ছুতোর এসে সমস্যাটার কথা শুনল। সমস্যাটা খতিয়ে দেখল। বুঝল, বিজ্ঞের মত ঠোঁট কামড়ে ভাবল। চার মিনিট সব চুপচাপ। সমস্যাটার সমাধানের সব দিকটা চিন্তা করল।তারপর মুখ খুলল। বাজে কথার মানুষ সে নয়। তার সময়ের দাম আছে। ইতিমধ্যে তিন বার তার মোবাইল বেজেছে। বলল, "পাল্লাটা খুলতে হবে। খোলা, আবার লাগানোও খুব সোজা। আঠারোটা সৃক্রু। সামান্য একটা সৃক্রু ড্রাইভারের কাজ। আঠারো বার বাঁ দিক, আঠারো বার ডান দিক। সাকুল্যে ছত্রিশ বার ঘোরাতে হবে। কেবল সাড়ে সতের মিনিটের ব্যাপার। তবে সমস্যাটা অন্য খানে। পাল্লাটা নিয়ে। যার জন্যে কাজটা কঠিন। আর বেশ খরচ হবে। ছুতোরের কথায় বেশ ধাঁধার আভাষ। একবার বলছে সহজ, আবার বলছে কঠিন। তার সঙ্গে বলছে বেশ খরচ! বুড়ো, ম্যানেজার, দারোয়ান আর উপস্থিত দর্শক চাকরানিটি। চারজনই হতভঙ্বের পাথুরে মুর্তি। মাথায় কারুর কিছু ঢুকছে না। ছুতোরের মুখের ওপর সবার চোখ আটকে। খানিকবাদে নীরবতা ভাঙলো ছুতোরই। "পাল্লাটা না হয় মিনিট ন'য়েকে খুলে ফেলব, তারপর খুলে রাখবোটা কোথায়? ঘরে যে রাখবো, সেটা হবেনা। কারণ জানালার লোহার রডগুলো বড় কাছাকাছি। পাল্লাটা ঢুকবে না। খান দু'য়েক রড খুলে যে পাল্লাটা ঘরে ঢোকাবো, তাও হবেনা। রডগুলো জানলার কাঠের ফ্রেমে ভালমতন ঢোকান। ফ্রেম কাটতে হবে। তার কথাই ওঠে না। বাইরে যে পাল্লাটা রাখবো, জায়গা কোথায়? ওটাতো আর শূন্যে ভাসতে পারেনা?" এক নাগাড়ে কথা বলে ছুতোর থামে। এবার সবাই বুঝতে পারে ব্যাপারটা জটিল। সরল সমাধান খুঁজতে জনে জনে মাথা চুলকোতে থাকে। যেন একই সঙ্গে সবার চুলে উকুন দাপাদাপি করছে। ছুতোর সবাইকে বোকা বানাতে পেরে খুশী। চাপা আনন্দে মুখ চোখ ঝকঝক

করছে। সে আবার শুরু করে। যেন সবাই এখন তার স্কুলের ছাত্র। গলাটা যতটা সম্ভব গম্ভীর করে বলে, " তিনতলা সমান উঁচু একটা মই হলে চলে যেত। কিন্তু অত বড় মই পাওয়া যায়না। সবাই এরকম উঁচুতে কাজের জন্যে মাচা করে। বাঁশের বা লোহার পাইপ দিয়ে মাচা। নয়তো ছাদ থেকে দোলনা মাচা ঝুলোয়। ওগুলো উঁচু উঁচু বাড়ির বাইরেটা রং বা প্লাষ্টারের কাজে লাগে।" ম্যানেজার এতক্ষণ এই নীচের তলার কর্মীটির জ্ঞান দেওয়া মুখ বুজে সয়েছে। এখন দেখছে লোকটাকে বড় বেশী লাই দেওয়া হচ্ছে। এতে ওর নিজের কতৃত্বে ঘা পড়ছে। তাই ছুতোরকে এক ধমকে থামিয়ে দেয়। বলে, "এটা কি সারা বাড়ি রং দেবার কাজ? এহটুকু কাজের জন্যে ওসব ভাবিস কি করে? খরচ কত জানিস?" বুড়ো ওদের কথাবার্তা শুনে দমে ঘায়। যেন অকুল সমুদ্রে ওকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ও বুঝতে পারে ওকে এ ডিমের সঙ্গেই বাস করতে হবে। হলোও তাই।ম্যানেজার রায় দিলেন, "স্যার, কিছু করার নেই। সামনের বছরে দেওয়ালটা রং হবে। তখন জায়গাটা পরিষ্কার করে "বার্ড ট্র্যাপ' লাগিয়ে দেব।" হতাশ গলায় বুড়োটা বলে, "তাহলে, আমায় অন্য একটা ঘর দিন।"

"ঘরতো খালি নেই। খালি হলে দেখা যাবে," বুড়োকে পুরো আশ্বাস দেয়না। "কটা দিনতো মাত্র। একটু সইয়ে নিন। আসলে কি জানেন, এই ঘরের আগের কোন বাসিন্দা পায়রা, বাসা, ডিম এসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে কোনদিন মাথা মাথা ঘামায়নি। পাখী দুটো থেকেছে ওদের মত, বাসিন্দারা থেকেছে নিজেদের মত।"

এই ক'দিনেই চাকরানিটির বুড়োর ওপর মায়া পড়ে গেছে। সে ম্যানেজারকে বলে, "স্যার,দু'বালতি জোরে জল ঢেলে দেখবো ডিমটা যায় কিনা?"

"হ্যাঁ, পাশের বাড়ি জল পড়বে, আর বাপ বেটা লাঠি হাতে তেড়ে আসবে। এমনিতেই জমি দখলের কেস ঝুলছে।" ম্যানেজার খেঁকিয়ে ওঠেন।

তারপর তিনি দারোয়ানটাকে সঙ্গে নিয়ে গট গট করে জুতোর আওয়াজ তুলে চলে গেলেন। পেছন পেছন মাথা নীচু করে চাকরানিটি। রাগে হতাশায় বুড়োটা মাথা দু'হাতে চেপে ধরে ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ে।

জানুয়ারী ৩ মামা

বৌমা চলে যাবার পর বুড়ো খুবই অশান্তিতে আছে। কিযে হলো, তারপর সেখানের বাড়িটা বিক্রী করে সংসার গুটিয়ে, মালপত্র নিয়ে ছেলেবেলার শহরে ভাড়া বাড়িতে এসে উঠলো। আসলে মানুষ যেখানে প্রথম আলো দেখে, বা যে ভূমিতে শৈশব কাটায়, কিংবা রক্তের টানের গন্ডী পেড়িয়ে বয়সের সাথে সামাজিক সংযোগ যেখান দৃঢ় হতে থাকে, সেখানের প্রতি এক ভীষন দুর্বলতা মনের গভীরে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত বয়ে বেড়ায়। সে যতই ভ্রাম্যমান হোকনা কেন, ওই মাটির টান চুম্বকের মত ওকে আকর্ষণ করবেই, অমান্যের শক্তি তার থাকেনা। বৌমা চলে যাবার পর সেই আকর্ষণটা বুড়ো বোধহয় আর ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। বৌমার চলে যাওয়াটা বড় দুঃখের। যেদিন হাসপাতালে ভর্তি হলো, তারিখটা এখনও মনে আছে, সাতাশে এপ্রিল সন্ধ্যা প্রায় সাতটা হবে। মণির মা রোজের মত রাতের রুটি তরকারী রান্না করে সবে গেছে। দরজাটা ভেজিয়ে সান্ধ্য আহ্নিকে বসেছি এমন সময় মোবাইল বেজে উঠলো। মোবাইলটা বারবার বেজে চলছিল, মনে হচ্ছিল শব্দটা শান্ত পরিবেশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আহ্নিকে মনোসংযোগ করতে পারছিলুম না। ফোনটা ধরলাম। উল্টোদিকে বুড়ো, খবর দিল বৌমা হাসপাতালে। তবে হ্যাঁ, এই সময়ে বুড়োর গলার স্বরটা যা হওয়া উচিত ছিল, কান্নায় ভারাক্রান্ত, কষ্টের, যার ফলে ফোনের অন্য দিকের মানুষটা খবরটা শুনে চিন্তিত হবে, আশ্বাস দেবে "সব ঠিক হয়ে যাবে", বিভিন্ন ভাবে সমবেদনা জানাবে, গলার স্বর সে রকম ছিলনা। স্বর টা ছিল প্রচন্ড রাগে ফেটে পড়ার স্বর, একটা কোনঠাসা হিংস্র জন্তুর জিঘাংসার, বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদের কুপিত স্বর। বুড়োর প্রতিটি কথায় চরম ঘৃণা মিশিয়ে উঠে আসছিল 'জানোয়ার' 'জানোয়ার' শব্দটা, বল্গাহীন হিষ্টিরিয়া রুগীর মত চিৎকার করছিল। পরে জেনেছিলাম কারণটা, বুঝেছিলাম ওর ওরকম ক্রোধ

কতটা সঙ্গত ছিল, বুঝেছিলাম ওর অবস্থায় পড়লে যে কোন স্বাভাবিক মানুষই একই ধরনের আচরণ করতো, ক্রোধাগ্নিতে একই ভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। বৌমার হাঁপানি ছিল, গুরুতর কিছু নয়। ডাক্তারের পরামরশমত চলত, মাঝে মাঝে ইনহেলার নেবার দরকার পড়ত। ওষুধেই ভাল থাকত। মাঝেমধ্যে সমস্যাটা মাথা চাড়া দিত। আর সব রুগীদের মত আধশোয়া, চোখ দু'টো ঠেলে বেড়িয়ে আসছে, ঠোঁট দু'টোতে গ্রীষ্মের খরা, ঘন ঘন তৃষ্ণা, মুখ খুলে হাঁপরের মত বাতাস টানা, তার চেয়েও অবিরাম আর্ত আকুতি 'অক্সিজেন'.. 'অক্সিজেন'.. 'অক্সিজেন'...এরকম কিছু হতোনা, ওর থাকত সামান্য সাধারন কষ্টের আভাষ। কিন্তু সেদিন ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয়, যেটা ওর পক্ষে ছিল অস্বাভাবিক। আগে কখনো ঘটেনি।

বাইরে গ্রীষ্মের আগুনের হলকা, অতিমারী কোভিড সমাজ, স-ভ্য-তা, মানব জীবনের অহঙ্কার বিজ্ঞান, অগ্রগতিকে উপহাস করে রমরমিয়ে সুনামি গ্রাসে ছড়িয়ে পড়ছে, সবাই ঘর বন্দী, চিকিৎসক কারও বাড়ি কোন রকম অসুখেই, এমনকি রুগীর প্রাণ সঙ্কট অবস্থায় তাকে দেখতে আসছেন না। ফোনে ফোনে চিকিৎসা। কথায় কথায় নির্দেশ 'হসপিটাল' নিয়ে যান। বৌমার বেলাতেও তাই। নিয়মিত চিকিৎসক বুড়োকে ফোনে উপদেশ দেন, " অক্সিমিটার কিনে নিন। নাইনটির নীচে গেলে অক্সিজেনের ব্যাবস্থা করতে হবে।-- না, আমার ক্লিনিকে কোন সিলেন্ডার নেই। -- তেমন ভাবে কোন সাপ্লায়ার জানিনা, দুঃখিত, জানলেও বলা মুশকিল, দিনকাল খারাপ, মিথ্যে 'কাটমানি'র ঝামেলা দরজায় হাজির হবে --- রেসিডেন্ট ম্যানেজারকে বলুন। রাখছি, ফোনে আর এক রুগী অপেক্ষা করছে।"

নব্বয়ের নীচে অক্সিমিটার রিডিং একনাগাড়ে চলে গিয়েছিল। বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে রেসিডেন্ট ম্যানেজারকে ফোন করে। 'গেটেড কমিউনিটি' তে বুড়োর নিজস্ব ছিমছাম ভিলা। সেখানে আবার ছোট দু'বেডের মেডিক্যাল ইউনিট, সব সময়ের একজন নার্স, সপ্তাহে একদিন বাইরের ডাক্তার ভিজিট করে। আজকের দিনের আধুনিক জীবনযাত্রার শোকেস হিসাবে অনেক কিছুই আছে, কিছু কাজ করে, কিছু শুধু ঝকঝকে সাইন বোর্ডে তাদের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে। মেডিকেল ইউনিট অক্সিজেন সিলিন্ডার রাখে, সেটা ও জানত। ওর জানার কথা নয়, কারন এই কমিউনিটিতে কিছু লুকিয়ে ব্যাবস্থা আছে যা শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের জন্যে। পুরাতন জমিদারী আমলের সাধারনের মনোভাব, যেমন তথাকথিত প্রভাব প্রতিপত্তিশালীদের পায়ে পরা, তাদের খুশী রাখতে একদেশদর্শীতা দেখান এইসব, বুড়োর কমিউনিটির ম্যানেজমেন্টের এখনও আছে। কমিউনিটিতে লুকানো কিছুই থাকেনা। সত্যান্বেষীরা ভেতরের ব্যাপার অনুসন্ধানি আঁকশি দিয়ে ঠিক বার করে নেয়, সবাইকে জানিয়ে দেয়। রেসিডেন্ট ম্যানেজার ছুটিতে অন্য শহরে। ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব না দিয়ে নার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলল। বুড়োর ফোনের উত্তরে নার্স বলেছিল, "সিলিন্ডার আমরা দরকারে আনিয়ে নিই।" ..... ডিলারের কাছেও সিলিন্ডার নেই। আজ সকালেই ফোন করেছিলাম। বলেছিল বাজারে কোন সিলিন্ডার নেই।"..... আজ আমার অফ ডে। এমার্জেন্সী ছাড়া ভিজিট করিনা। মাডামের তো মাইল্ড, ইনহেলার ব্যাবহারেই ঠিক হয়ে যাবে।"

সেদিন সিলিন্ডারের ব্যাপারে নার্স মিথ্যা বলেছিল। ইউনিটে সিলিন্ডার সেদিন ছিল। সেদিন রাতেই এক বিশিষ্ট আবাসিকের দরকারে সিলিন্ডার তার ভিলাতে পৌছে দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয় নার্সের উপস্থিতিতেই তাকে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছিল। জানাতে এসে গর্বের সঙ্গে সেই বিশিষ্ট ব্যাক্তিটির স্ত্রী এই খবর দিয়ে যান। ম্যানেজমেন্ট এমনই পিশাচ।

সেদিন সন্ধ্যায় সাতটায় বৌমা হাসপাতালে বেড পায়। কোভিডের লোলুপ থাবা সর্বত্র। কোথাও বেড নেই। ফুটন্ত দুধের উপচে পড়া ফেনার মত হাসপাতালগুলো উপচে রোগীরা ছড়িয়ে পড়ছে বাইরে। খোলা চত্বর, ফুটপাথ, সাইকেল-গাড়ি রাখার জায়গা - সবখানে মানুষ। রোগীদের সঙ্গে ঠাঁই নিয়েছে আত্মীয় পরিজন, রাস্তার ঘেয়ো কুকুর ও গোয়াল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া জাবর কাটা গরু, মোষ, বারোয়ারি ষাঁড়ের দল। হাসপাতালের ভেতরে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সব কটা বেডে

কোভিড রোগী। হার্ট, কিডনি, বুক, পেট, মাথা, এমনকি চোখ, কাণ, দাঁত - সব ওয়ার্ডের সব বেড রাতারাতি কোভিড বেড হয়ে গেল আর তার সঙ্গে অ-কোভিড রোগীরা হয়ে গেল অচ্ছুৎ, ব্রাত্য। অবশ্য বিশিষ্টজনদের যেমন আমলা, নেতা, বিরাট শিল্পপতি বা তাদের তাঁবেদারদের জন্যে অন্য ব্যাপার। তাদের জন্যে সব জায়গায় সব সময় দরজা খোলা। সব ওয়ার্ডে রাতকে দিন করা উজ্বল আলো, ফর্সা সাদা ধবধবে চাদর ঢাকা বিছানা, রোগীদের গায়ে গরম কম্বল, নাকে অক্সিজেনের মুখোশ, এসি র ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপট, মহাকাশ যানযাত্রীদের মত সারা শরীর ঢাকা সাদা বা হালকা নীলের সজ্জায় সদাব্যাত্ত ডাক্তার, নার্স। এ যেন স্বপ্নপুরী, রূপকথার জগৎ। তবে রোগীদের নীরক্ত ফ্যাকাশে মুখ, কোটরাগত অস্বচ্ছ চোখ, শূন্য দৃষ্টি, শ্বাসের বিষম কষ্ট্রের জন্যে বুকের হাপড়ের ওঠানামা মনে করিয়ে দেয় আসলে এ এক মৃত্যুপুরী।

এ এক অবাক পৃথিবী। বাইরের লোকেরা মনেপ্রাণে চাইছে ভেতরের রোগীদের তড়িৎ মৃত্যু, তাহলে ওরা বেড পাবে, আর ভেতরে মরণ বাঁচন লড়াই চলছে মৃত্যুকে ঠেকাতে। এরকম ডামাডোলের অস্থির সময়ে বৌমার হাসপাতালে বেড পাওয়া কখনই সম্ভব হোতনা। দয়াপরবশ হয়ে নার্স মহিলা ব্যাবস্থা করে দেন। এ বিশেষ হাসপাতালের ওপরওয়ালার সঙ্গে তার এবং রেসিডেন্ট ম্যানেজারের ভাল জানাশোনা, তাই যে কোন সময়ে বেড পাওয়া যায়। অবশ্য লোকে বলে ওরা কমিশন পায়। প্রমাণ হিসাবে দেখায়, আবাসিকদের সামান্য হাঁচি কাশি গা ব্যাথা হলেও ওখানে পাঠায়। এম্কুলেন্সে ঘন্টাদুয়েক অপেক্ষা করার পর বৌমাকে এমার্জেন্সীতে নিয়ে যাওয়া হয়, সঙ্গে বুড়ো একা। আবাসিকরা কেউ আসেনি, কোভিডের ভয়ে। বৌমা স্বাভাবিক, কথাবার্তায় কোন জড়তা নেই, সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল । খালি শ্বাসকষ্টতে একটু কাহিল। কে বলবে ও হাসপাতালের রোগী। নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে অ-কোভিড রোগী হিসাবে আইসিইউতে ভর্তি করে। কেবলমাত্র অ-কোভিড রোগীদের জন্যে আট বেডের আইসিইউ। তখন ভোর সাড়ে চারটে। অনাহারে, অনিদ্রায়, বিভিন্ন পরীক্ষার অত্যাচারে ও তখন সত্যিকারে অসুস্থ, অচেতন। সেদিনটা ছিল আঠাশে এপ্রিল। সেদিনই সকাল এগারটার সময় বুড়োর ডাক পড়লো "কাউন্সেলিং রুমে'। ঘরটা বড়। নরম এলইডির আলো, একপ্রান্তে মোটা ফোমের ঘি রঙের সোফা, তার সামনে বিরাট পালিশ করা ডিম্বাকৃতি টেবিল, তাকে ঘিরে এক ডজন চেয়ার। সেখানে সিনিয়ারকে ঘিরে ছ'জন জুনিয়ার। এই সেই ঘর যেখানে আইসিইউ এর প্রতিটি রোগীর অবস্থার সঙ্গে ডাক্তারদের দৈনিক যুদ্ধের ফলাফল রোগীর প্রতিনিধিদের জানান হয়। সেদিন বুড়ো ঘরটা থেকে যখন বেড়িয়ে এলো তখন তার পায়ে স্প্রিং, হাওয়ায় উড়তে উড়তে বৌমাকে খবর দেয়, তার অবস্থা আইসিইউইয়ের যোগ্য নয়, সাধারন অক্সিজেন বেডই যথেষ্ট। আজই ওকে সেখানে পাঠাবে। উদ্ভাসিত হাসিতে বৌমা বুড়োকে বলেছিল, “দেখবে, দু'দিনে বাড়ি ফিরে তোমায় মাংস রেঁধে খাওয়াব।" দুর্ভাগ্য, বৌমা আর ফিরে আসেনি। শুধু বুড়ো ওর সৎকার শেষে একা বাড়ি ফিরে এসেছিল। দিনটা ছিল মে' র তিন তারিখ। আঠাশে এপ্রিল থেকে তেসরা মে. এই ছ'দিনে বুড়োর জীবন ওলট পালট হয়ে গেল সামান্য একটা অক্সিজেন সিলিন্ডারের জন্যে। হাসপাতালে সাধারন বেড খালি থাকা সত্বেও বৌমাকে আইসিইউতেই রেখে দিয়েছিল। কারণ যথেষ্ট সিলিন্ডার ছিলনা। গুদামে যেকটা ছিল সেগুলো পাঁচটা আইসিইউ ইউনিট ও বারোটা আপাততঃ খালি ভিআইপি বেডের জন্যে। আটাশ গেল বিফলে, উনত্রিশে সিনিয়র বুড়োকে বলল, “কেস খুবই সাধারন, সিলিন্ডার জোগাড় করুন, ছেড়ে দেব। আমরাও খুশী হব।যাদের সত্যিকারের দরকার তাদের বঞ্চিত করে সামান্য অক্সিজেনের জন্যে একটা আইসিইউ বেড ম্যাডাম আটকে রেখেছেন।” সিনিয়ারের কথা বলার ধরণ ওর একদম পছন্দ হয়নি। এবার শুরু হলো তার জীবনের ভীষণতম 'চ্যালেন্জ্" ও একা, হাসপাতাল অপারগ, এমনকি যোগাযোগের ঠিকানাও দিলনা, দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ। কাছের ওষুধের দোকানগুলো চারটে ডিলারের ফোন নাম্বার দিল, সঙ্গে উপদেশ, “ ক্যাশ রাখবেন, কম করে একটার জন্যে লাখখানেক ঘদিও হাজার পনের বাজার দর।”

কমিউনিটির আবাসিকদের, স্থানীয় বন্ধুদের বুড়ো ফোন করে। লক ডাউনে সবাই ঘরবন্দী। আরও কিছু ডিলারের নাম্বার মিলল। ফোনে সব

ডিলাররা একই আশ্বাস দিল, “কাল একবার ফোন করবেন। ভাগ্যে থাকলে পেয়ে যাবেন।” পরপর চারদিন কেটে গেল, ওর ভাগ্য আর খুলল না। শুধু ওর শহরে নয়, সারা দেশজুড়ে তখন সিলিন্ডারের জন্যে হাহাকার। সিলিন্ডার নিয়ে মারপিট, দোকান ভাঙচুর, লুঠ, হাসপাতালে হাসপাতলে আইসিইউয়ের দরজা বন্ধা। মৃতের সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে, স্তুপীকৃত নাম গোত্রহীন মৃতদেহ, সৎকারের-কবরস্থানের জায়গা অকুলান। মৃতের দেহ গাদা করে পেট্রল ঢেলে পোড়াচ্ছে, কিংবা তারা শিয়াল, শকুন, কুকুরের খাদ্য। পরিত্যক্ত বেওয়ারিস শয়ে শয়ে মৃতদেহ নদীর জলে, জঙ্গলের ধারে। ওদিকে ব্যাবসায়ীদের অক্সিজেন, ব্যাবসায়িদের কালো টাকার গদি মোটা হচ্ছে। প্রতিদিনের কাগজের, টিভির এইসব বিভীষিকাময় খবর, তার সঙ্গে বমন উদ্রেককারী ছবি বুড়োকে হতাশার অতলে টেনে নামায়। দোসরা মে, সকালেই সিনিয়র তার ঘরে বুড়োকে ডাকে। অভাবনীয় ব্যাপার, সিনিয়র তার ঘরে কাউকে ডাকেনা। বুড়োকে বসতে বলে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। তারপর সিনিয়র দুঃসংবাদটা দেয়, “স্যার আমি খুব দুঃখিত। ওনার নিউমোনিয়া হয়েছে। বোধহয় আইসিইউয়ের ইনফেকশান, কোন ওষুধেই রেসপন্স করছেন না। " তারপর চোখ নামিয়ে বলেন, “খারাপ খবরের জন্যে তৈরী থাকুন।” তার চল্লিশ বছরের সঙ্গী, অস্তিত্বের অর্ধাংশ..... আজ থেকে ওর জীবন মরুময়, সবচেয়ে প্রিয়জনের মৃত্যু। কে দায়ী? দেশের দায়বদ্ধতায় ব্যর্থতা? ভিতরে বসে থাকা লোকটার চিকিৎসায় ব্যার্থতা? রোগী সম্পর্কে উদাসীনতা? সমাজে অর্থের লোলুপতা?

সে কাঁদেনা। কান্না আসেনা, রোষাগ্নিতে সে এখন ভিসুভিয়াস, ধমনীর প্রতিটি লোহিতকণা আগ্নেয় লাভা, অস্ফুটে বলে চলে, "ওকে ওরা খুন করেছে..... খুন করেছে..... সময়ে

মার্চ ১০ - বুড়ো

সকালেই ফোন বেজে উঠলো। মামা নেই। কমল ফোনটা করেছিল। মামার পাড়ার মাতববর, পলিটিক্যাল দাদা কমল। মাত্র মাস দেড়েকের পরিচয়। সেবারও সকালে ওর ফোন। বলে “মাঝ রাতে লেপ জড়িয়ে খাট থেকে পড়ে মামা কোমর ভেঙেছেন, ফলে চলৎশক্তিহীন, সারারাত পৌষের শীতে ঠাণ্ডা মেঝেতে পড়ে কাতরেছেন, সকালে চা দিতে গিয়ে মনির মা দেখে, কমলের উদ্যোগে তার পরিচিত নিকটতম নার্সিং হোমে মামা ভর্তি হয়েছেন।” আমরা চার ভাগ্নে, মামার আর কেউ নেই, শহরের চার জায়গা থেকে নার্সিং হোমে পৌছে যাই। আমাদের দেখে মামা ভীষন খুশী। ঘুমের ওষুধ খেয়েছেন, তন্দ্রাচ্ছন্ন। ওদিকে কমলের আদর আপ্যায়নের শেষ নেই। ভাবটা এমন যেন আমরা রোগী দেখতে আসিনি, কোন উৎসবে এসেছি। ওই দেখি কাগজপত্র সই করছে, ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করছে, মামার চিকিৎসা বিষয় ঠিক করছে। ওর ফাইফরমাস খাটার জন্যে একদল যুবক বাইক নিয়ে সব সময় প্রস্তুত। কোন ব্যাপারেই কমল আমাদের থাকতে দিলনা। একটু বেলা হতেই দেখি মামাকে দেখতে দলেদলে পাড়ার লোকেরা আসছে। হবে নাইবা কেন? যে মানুষটা ওদের বিপদে-আপদে, অসুখে-বিসুখে, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার, বিয়ে- সাদির ব্যাপারে, সবসময় সাধ্যমত পাশে, সে যে হাসপাতালে! যে মানুষটা দশ বিঘা জমির বাগানের ঝুড়ি ভরে আম-জাম ফলটা, ঝাঁপি উপচে চাঁপা-উগর ফুলটা, চুপড়ি ছাপিয়ে রুই- কাতলা মাছটা সারা বছর ঘরে ঘরে এককালে বিলিয়েছেন, এখন নয় অবস্থা পড়েছে, সবই বিক্রী করে শুধু দেড় বিঘা জমি সমেত দু’ঘরের বাড়িতে সাত্বিক জীবন কাটাচ্ছেন, তাই বলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার সম্ভ্রমের ভালবাসার আসনটুকু হারিয়ে যাবে? মামা একদম শয্যাশায়ী, নড়াচড়া বন্ধ। ওনাকে শহরের বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। ডাক্তারেরা ছাড়লেন না, বললেন " স্পাইনাল কর্ডের ব্যাপার, বেশী নড়াচড়া করলে কেসটা আরও সিরিয়াস হয়ে যাবে। ছোট একটা অপারেশান করবো, তারপর তিন মাস টোটাল বেড রেষ্ট, একদম সেরে যাবেন।”

কমলের জেদ, “ আমাদের দাদাবাবু, আমাদের মধ্যেই থাকবেন।” পরের দিনই অপারেশান হল। তিনদিন বাদে মামাকে ছেড়ে দিল। আমরা মাঝে মাঝেই মামাকে দেখে আসতাম। মামা বাড়িতে বিছানায় একভাবে শোয়া, চিৎ হয়ে, পাশ ফেরা বারণ। মণির মা আর পাড়ার একজন মহিলা

দেখাশোনা করত। মামা ভালমতন সেরে উঠছিলেন। মৃত্যুর আগের দিনওছোটভাই দেখে এসেছে। ফিরে এসে ফোনে বলেছিল মামা একদম ফিট। ফোনে কমল বলেছিল হার্ট ফেইলিয়র। মামার হার্টের কোন সমস্যা ছিলনা। সুগার, প্রেসারও ছিলনা। বস্তুত মামাকে কোনদিন ওষুধ খেতে দেখিনি, খুব ভাল স্বাস্থ্য ছিল। পৌছে দেখি বাড়ি ভর্তি লোক, সবাই গভীর ভাবে শোকাহত। খাটিয়ায় শয়ান মামা, গায়ে নতুন সাদা ধুতি পাঞ্জাবি, ফুলে ফুলে শরীর ঢাকা, কপাল জুড়ে চন্দনের ফোঁটা, বাতাস অগরু সেন্ট আর ধূপের গন্ধে ভারী। কমলেরই সব আয়োজন, দলের ছেলেরা সব কাজ করছে। এতদিন মামার চিকিৎসার খরচ, ওষুধ পথ্যের খরচ, এমনকি মামাকে সর্বক্ষণ দেখার জন্যে রাখা দু'জনের মাইনে, থাকা খাওয়ার খরচ কমলই করেছে। আমরা কিছু দিতে গেলে শুধু বলেছে পরে। মামা মৌন মুক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে আমাদের দিকে চেয়ে থেকেছেন। আন্তেষ্টির পর আমরা সবাই এক গাড়িতে ফিরলাম। সবাই চুপচাপ, মাথার ওপরের একমাত্র জীবিত গুরুজনের চলে যাওয়ায় সবাই খুবই ব্যাথিত। নীরবতা ভেঙে মেজভাই প্রথম কথা মুখের অনেকখানি শরীরের সঙ্গে প্রচুর ফুলে ঢাকা ছিল, তাই সেটা কারো চোখে পড়েনি। মেজ আমাদের হয়ে ফুলের মালাটা পড়াতে গিয়ে দেখেছে। ছোট বলে, “মামার মুখে চিরকালের সেই শান্ত ভাবটা দেখলামনা। কি রকম একটা কষ্টের ভাব। হার্ট ফেইলিয়রে বোধহয় ওই রকম হয়।” আমরা সবাই অনেকক্ষণ নির্বাক। নীরবতা ভেঙে মেজই আবার বলল, " আমার কেন যেন মনে হচ্ছে মামা দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে।" আমাদের সবার মনে এই সন্দেহটাই হয়েছিল, কিন্তু সত্যি ভাবতে ভয় হয়েছিল। মেজোর কথায় আমরা পাথর হয়ে গেলাম। আমাদের সন্দেহটা আরও বদ্ধামূল হলো যখন দু'দিন বাদে কমলের ফোন এলো। মদ্যপ গলার স্বরে হুমকি দিয়ে বলে, “ভাল করে শুনুন, দাদাবাবু আমাকে সব লিখে দিয়ে গেছেন। ব্যাপারটা নিয়ে বেশী ঘাটাঘাটি করবেন না। করলে কোন লাভ হবেনা, বরং ক্ষতিই হবে। শ্রাদ্ধের যা কিছু করার আপনারা করে নেবেন। এদিকে আর পা মাড়াবেন না।” আমাদের কোন কথা বলতে না দিয়ে ও ফোনটা অফ করে দিল। আমরা আর কোনদিন ওদিকে যাইনি।

মে ২৮- বুড়ো

আট তারিখে যেদিন ডিম ফুটলো, ফুটে বাচ্চাটা বার হলো, সেদিন আমার হতাশার অপেক্ষার দিন শেষ হয়ে আনন্দের দিন শুরু হলো। আর মাত্র কয়েক দিন, পাখা গজালেই ঘর ছাড়বে, আর আমিও ওই জায়গাটা এমন জ্যাম করে দেব যাতে আর ভবিষ্যতে ডিম পারতে পারবেনা । আমার ডায়েরী অনুযায়ী বাচ্চাটার বারই মে চোখ ফুটলো, কুতকুতে চোখ আর তেইশ তারিখে পালক। ওর প্রতিটি বড় হবার ল্যান্ডমার্ক আমার আনন্দ বাড়িয়ে চলেছিল। আমি প্রায় হাওয়ায় ভাসতে শুরু করেছিলাম, আসছে, আসছে আমার মুক্তির দিন,যেদিন আমি নাকে রুমাল ছাড়া জানালাটা খুলে ঘরটায় থাকতে পারব। ওদিকে পায়রা দু'টোরও দু'জনে একসঙ্গে আকাশে ওড়ার দিন কাছে আসছে জেনে আনন্দে সারাদিন বকম বকম শুরু করেছে। বেচারারা পাহারা দেবার জন্যে বহুদিন একসঙ্গে আকাশে ওড়েনি। আজ কি ভুলই না ওরা করল। আর ক'টা দিন সবুর করতে পারলোনা? আজই প্রথম বাচ্চাটাকে একলা রেখে দুজনে একসঙ্গে আকাশে উড়েছিল, আর ধূর্ত বাজপাখীটা সুযোগ বুঝে এক ছোঁয়ে বাচ্চাটা ঠোঁটে নিয়ে উধাও। ওরা ফিরে খালি ঘর দেখে পাগলের মত বাড়িটার প্রতি কোন, আশপাশ খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ আগের উচ্ছুলতার আগুন মিইয়ে গিয়ে হারান শীতলতা ওদের গ্রাস করে। পাখনার উদ্দামতায় ক্লান্তি, প্রিয়সম্ভাষণের কূজন স্তব্ধ, দৃষ্টি ধূসর অসহায়।, অনেক খুঁজে না পেয়ে নিশ্চুপ দুজন শুকনো ডাল, কাঠি, খড়কুটো দিয়ে বানানো বাচ্চার ঘরটায় পাশাপাশি এসে বসে। বোধহয় হারান সন্তানের স্মৃতি রোমন্থন করে কিংবা ওকে ঘিরে এখন ফুরিয়ে যাওয়া স্বপ্নের কথা ভাবে। সময় বয়ে যায়, সূর্য্য যখন পাটে বসে, ধীরে ধীরে আঁধার যখন নামছে ওরা আবার আকাশে পাখা মেলে দিগন্তের দিকে উড়ে যায়, ক্রমে ছোট্ট, আরও ছোট্ট ফুটকি হয়ে হারিয়ে যায়।

মে ৩১- বুড়ো

আজ তিনদিন, ওরা নেই। বাসাটা শূন্য পড়ে আছে। আমি জানি ওরা আবার ফিরে আসবে। আমি যেমন শৈশবের টানে ফিরে এসেছি, ওরাও সেরকম স্মৃতির টানে ফিরে আসবে। মানুষের মত জীবেদেরও কোথাও না কোথাও ফিরতে হয়। আমি এবার নিজের প্রচেষ্টায় শূন্য বাসা ভেঙে দেব, নতুন বাসার জন্যে অপেক্ষা করব। প্রতিবারের মত ওরা আবার সঙ্গে আকাশ ছোঁবে। আমি দেখব কোন বাজ পাখী ওদের স্বপ্ন চুরমার করে, কোন ম্যানেজার দেওয়াল রং করার সময় বাসা ভাঙে। গত এক বছরে তিনটে মৃত্যু আমায় বুঝিয়েছে যদিও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, ঘটবেই, প্রকৃতির নিয়মে, কিন্তু প্রকৃতি তা ঘটায় না। ঘটায় রাষ্ট্র, সমাজ, মানুষ চারপাশের জীবকুল। ঘটায় তাদের লোভ, লালসা আর জিঘাংসা। শান্তিতে স্বাভাবিক মৃত্যু এরা ঘটতে দেয়না। এরা শক্তিমান, মৃত্যু এদের সম্পদ, পুঁজীকরণের হাতিয়ার। তাই অন্যের মৃত্যুর পরোয়ানা এরা নিজেদের হাতে তুলে নেয়।

আমি অন্তত ঐ কবুতর দু'টোর সন্তানদের বেলায় তা আর হতে দেবনা।

বাঁক পেরিয়ে রাজপথ

সিতাংশু শেখর বিশ্বাস

আমার ছেলেবেলা ছিল বড়ই বৈচিত্রময়, জন্মের পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় কেটেছে শৈশব, আমার বয়স বারো বছর পেরিয়ে গেলে আর তেমন করে কলকাতার বাড়িতে থাকা হয়নি, তারপর থেকে কলেজ যাওয়া অব্দি পিতামহের ভিটেতেই দিন কেটেছে, আমার পৈতৃক বাড়ি কলকাতা থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে বনগাঁ পৌরসভার অন্তর্গত একটি ছোট্ট শহরে, জয়েন এট্রান্স পর্যন্ত সেখানেই পড়াশুনা, তারপর ১৯৯৯ সাল থেকে পরবর্তী চারবছর পড়াশুনা শিবপুর বি ই কলেজে, ২০০৩ সাল থেকে কার্যত আর তেমন করে ঘরের ভাত খাওয়া হয়নি, দেশ বিদেশে বস্তুত প্রবাসেই দিন কাটছে এই অবধি, কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে স্মৃতির পাতায় অনেক কিছু ভেসে ওঠে, ভেবে সেই দিনগুলোতে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়, মনে হয় মানুষের জীবনেও যদি একটা রিওয়াইন্ড বোতাম থাকতো কত ভালোই না হতো, যাই হোক আমার স্মৃতির পাতা থেকে একখানি তেমন ই ঘটনা আজ আপনাদের বলতে বসেছি, হয়তো ভালো লাগবে |

বি ই কলেজে আসার পর চারটে বছর হোস্টেল নম্বর আট, হোস্টেল নম্বর চোদ্দ, ম্যাকডোনাল্ড হল আর শেষ বছর উলফেন্ডেন হলে থেকেছি, হাজার স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেই দিনগুলোর সাথে, সেগুলো লিখতে গেলে হয়তো সব গুছিয়ে লিখে উঠতে পারবো না | কলেজ আসার পর থেকে, পৈতৃক বাড়ি খুবই কম যেতাম, মাঝে মাঝে কলকাতার বাড়িতে যেতাম, পিসিমনি তখন বেঁচে ছিলেন, আমার কলকাতার বাড়ি বাঁশদ্রোণীতে, পৈতৃক বাড়ি যাওয়া একদম কম হতো, হয়তো দেড় কি দু মাসে একবার যেতাম | বি গার্ডেন থেকে "এম-এস ৩৫" ধরে শিয়ালদা, তারপর শিয়ালদা থেকে বনগাঁ লোকালে প্রায় দেড় ঘন্টা, কলেজ টা খুব প্রিয় ছিল আমার, অনেক শিখেছি ওখান থেকে, তখন কলেজে সারারাত ল্যাব খোলা থাকতো, তা ছাড়া ২০০০ সাল থেকে আমি কিছু পার্ট টাইম উপার্জন ও করতাম, উইক ডেজ গুলোতে ক্লাস সেরে, ৬ নাম্বার মিনিবাস ধরে চৌরঙ্গী নামতাম, তারপর পায়ে হেটে পাঁচ মিনিটে চাঁদনীতে এক নামকরা কম্পিউটার এর দোকান এ পার্ট টাইম কম্পিউটার এসেম্বেল আর অপারেটিং সিস্টেম লোড করতাম, ওই ৬ টা থেকে ৯ টা, মাসে ৬০০০ টাকা মাইনে পেতাম, আমার হাত খরচা, ঘোরাঘুরি স্বচ্ছন্দে হয়ে যেত, আমাদের কলেজ এর একটু সামনে, বকুলতলাতে এক দাদা গণেশ চন্দ্র এভিনু তে এক বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতো, ও ফেরার সময় আমাকে চাঁদনী থেকে তুলে নিতো, আমরা বাইকে করে এসপ্ল্যানেড, রবীন্দ্রসদন, হেস্টিংস হয়ে বিদ্যাসাগর সেতু ধরে ফিরতাম, ব্রিজের উপরটা থেকে হাওড়া ব্রিজ, ইডেন, রেসকোর্স, ভিক্টরিয়া, বাবুঘাট খুব মনোরম লাগতো, দাদা আমাকে কলেজ ছেড়ে, লিপি সিনেমার পাশের রাস্তাটা দিয়ে ঘর ফিরত, কলকাতা থেকে হোস্টেল ফিরে রাতের খাওয়া সেরে বেশিরভাগ দিন ই রাত একটা কি দুটো অব্দি ল্যাবে থাকতাম, ম্যাটল্যাব, সি, পি স্পাইস, ভি এল এস আই, এগুলো কার্যত ওই কলেজের ল্যাব থেকেই শেখা, যার সুফল আজ কর্মজীবনে প্রতিনিয়ত উপভোগ করি | যেটা বলছিলাম, সপ্তাহের পুরো দিনগুলোতে কলেজ, তারপর রাতে ল্যাব, এইসব করে সপ্তা শেষে আবার বনগাঁ লোকালে করে যাওয়া, কষ্ট হত খুব, তাই ছুটির দিনগুলোতে হোস্টেলে ঘুমিয়েই কাটাতাম, সপ্তা শেষে হোস্টেল একদম ফাঁকা হয়ে যেত, আমার মতো আর দু একজন ছিল, তারাও খুব কমই ঘর যেত, ওদের সাথে একটু বিকেলের দিকে বি গার্ডেন এ ঘুরতে যেতাম, ওই সেই অনেক পুরোনো বট গাছের ধারে একটু বসে, ফেরার সময় গার্ডেন গেট থেকে ফুচকা খেয়ে হোস্টেল ফিরতাম, কিন্তু যখন বনগাঁতে যেতাম, রাতের বেলাটাই বেশি পছন্দ করতাম, ভিড় ভাট্টা একটু কম থাকতো, শুক্রবার ক্লাস সেরে সন্ধ্যার দিকে বেরোতাম, রাত ১০ টার ভিতর ঘর পৌঁছে যেতাম | আবার যথারীতি রবিবার বিকেলের দিকে বেরিয়ে পড়তাম, কিন্তু বনগাঁ লোকালে খুব ভিড় হতো, তাই পুরো সফর টা বনগাঁ লোকালে করতাম না, হাবড়ায় এসে নেবে যেতাম, ওখানে বেশ ভালো কচুরি আর ঝাল মুড়ি পাওয়া যেত, ওগুলো একটু খেয়ে, ২ নম্বর প্লাটফর্মে এসে এক দাদুর চায়ের দোকানে চা সিগারেট খেয়ে আয়েস করে হাবড়া লোকাল এ করে শিয়ালদা আসতাম, এমন ই একদিন ২ নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে চা সিগারেট খাচ্ছি, দেখি একজন সমবয়স্ক ছেলে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে, হয়তো একটু বড়ই হবে আমার চেয়ে, কিছুক্ষন পরে একটু হেসে ও আমার কাছে এসে

বললো, দাদা কোথায় থাকেন? আমি বললাম আমার বাড়ি এখানেই কিন্তু কলকাতায় হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করি, শুনে ওর চোখটা যেন ছল ছল করে উঠলো, বললো দাদা আমায় কি আপনার সাথে একটু থাকতে দেবেন, যে কাজ দেবেন করে দেব, আমি বললাম ভাই আমিতো হোস্টেলে থাকি, ওখানে বাইরের লোক ঢুকতে দেবে না, ও তো নাছোড় বান্দা, কাকুতি করেই চলেছে, বললো দাদা আমায় আপনার ঘরের বাইরে দরোজার পাশে একটু থাকতে দিলেই হবে, আর দুবেলা একটু খেতে দেবেন, বুঝলাম ও সত্যিই সাহায্যপ্রার্থী, আমি বললাম কি নাম তোমার? এমন কেন বলছো? তোমার কি ঘর বাড়ি নেই? বলতেই কেঁদে ফেললো, ওর নাম অম্লান, গ্রাজুয়েট করতে করতে ছেড়ে দিয়েছে অভাবের তাড়নায়, এতদিন দাদা বৌদির সাথে মা কে নিয়ে থাকতো, দুমাস হলো ওর মা মারা গ্যাছে, তাই বৌদি আর রাখবে না, তাড়িয়ে দিয়েছে, গত দুদিন নাকি এই প্ল্যাটফর্মেই কাটিয়েছে, শুনে আমার মনটা দুঃখে ভরে উঠলো, ভাবলাম কিছু না কিছু করতেই হবে, আমাদের কলেজের এক সিনিয়ার দাদা, শুভেন্দুদা, উলুবেড়িয়াতে ওর কাস্টিং এর ফ্যাক্টরি, অনেক পয়সার মালিক, আমাকে খুব ভালোবাসে শুভেন্দুদা, মাঝে মাঝে রবিবার গাড়ি নিয়ে চলে আসতো, আমরা দুজনে গিয়ে কলেজের থার্ড গেটের সামনে গঙ্গার ঘাটে বসতাম আর দাদাকে শ্যামা সংগীত শোনাতাম, আমার কোনো অসুবিধা হলে শুভেন্দুদা কেই ফোন করতাম। যথারীতি শুভেন্দুদা কে ফোন করলাম, সব খুলে বললাম, দাদা বললো ওসব ঝক্কি নিতে যাস না, তুই সরল সাদাসিধা, কিন্তু গোটা দুনিয়ার অধিকাংশই ফ্রড, কোথাকার কে না কে তার জন্য একদম দরদ যেন উথলে পড়ছে, ওসব বাদ দে। আমি বললাম দাদা দেখে তো খারাপ লাগছে না, তুমি তো বলেছিলে তোমার ফ্যাক্টরির গেটে দারোয়ান চলে গ্যাছে, ওকে একটু থাকতে দাও না, এক মাস দেখে যদি না পোষায় বা খারাপ দ্যাখো তাড়িয়ে দিও, দাদা বললো তুই যখন এতো করে বলছিস, আসতে বল, দেখি কি করা যায়, আমার মুখে হাসি ফুটলো, আমি অম্লানকে সব খুলে বললাম যে এই ধরণের কাজ, শুধু থাকা খাওয়া কনফার্ম, মাইনে পাতি আমি কিছুই বলতে পারবো না। ও তো বলছে দাদা, এ তো মেঘ না চাইতেই জল, আমি একদম রাজি, আমি আমার ঠিকানা দিয়ে বললাম সামনের বুধ বারে আসতে, ও বললো দাদা, ওই সামনের কচুড়ির দোকানে প্লেট ধুয়ে দুতিন দিনের খাবার হয়তো জুটে যাবে কিন্তু আপনার ওখানে যাওয়ার মতো ভাড়ার টাকা যে আমার জোগাড় হবে না , আমি ওকে তিরিশ টাকা দিলাম আর আমার সেল নাম্বার দিলাম, সেটা ছিল আমার জীবনের প্রথম সেল ফোন, হাচ এর নাম্বার, ওকে কি করে আসতে হবে বি গার্ডেন বুঝিয়ে দিলাম আর বলেদিলাম এসে যেন আমায় ফোন করে, আমি ডেকে নেবো, এই করতে করতে হাবড়া লোকাল ঢুকলো, ও ছুটে গিয়ে জানালার পাশে আমার একটা জায়গা রেখে দিলো, আমি একটু পরে উঠে গিয়ে বসলাম, অম্লান জানালার ধারে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ ট্রেন না ছাড়লো আমার সাথে কথা বলতে লাগলো। কত কথা, তার সুখ দুঃখের। ১০ মিনিট পর ট্রেন ছেড়ে দিলো। ও আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে গ্যালো। আমি ও গত সপ্তাহের ঘটে যাওয়া সব মজার ঘটনা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা, হৃদয় পুর গিয়ে ঘুম ভাঙলো, দেখি ভালোই ভিড়, আমি উঠে দাঁড়ালাম, সামনের লোকটিকে বসতে দিলাম, তারপর শিয়ালদা পৌঁছে, এম জি রোড দিয়ে হাওড়া, তারপর ৫৫ নম্বর বাসে করে জিটি রোড দিয়ে কলেজ পৌঁছে গেলাম, ততক্ষনে সন্ধে সাড়ে সাত টা হয়ে গ্যাছে, আমি ফ্রেশ হয়ে একটু পড়াশুনা করে সাড়ে নটায় খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে গেলাম, সকাল সাত টা পঞ্চান্নতে আবার কলেজ |

আবার সেই ব্যস্ততা সোমবার থেকে, সারাদিন কলেজ, বিকেলে চাঁদনী, এসবের মাঝে ভুলেই গেছিলাম অম্লানের কথা, একদম বেমালুম ভুলে গেছি। বুধবার আমি তখন কলকাতায়, দেখি একটা ফোন, তুলতেই বলছে দাদা আমি অম্লান, বি গার্ডেন এসে গেছি, আমি তো একদম অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম, সত্যি বলতে রবি বারের পর থেকে শুভেন্দু দার সাথে কোনো কথাই হয়নি অম্লানের ব্যাপারে, এবার আমার টনক নড়লো, আমি বললাম ভাই আমি এখন কলকাতায়, তুমি বাইরে একটু ঘোরাঘুরি করো, তারপর সাড়ে নটা নাগাদ বি ই কলেজের ফার্স্ট গেটে এসে দাড়াও আমি ওখানে আসবো, আমার ফিরতে একটু দেরি ই হলো দশটা পনেরো হয়ে গ্যাছে, দেখি অম্লান দাঁড়িয়ে আছে, কি করি এবার, কোথায় রাখি ওকে? ভাবলাম নিয়েই যাই হোস্টেল এ, তারপর যা হয় দেখা যাবে, তখন ম্যাকডোনাল্ড হলের কেয়ার টেকার কার্তিক দা, যাকে আমরা গোপনে লঙ্কা বলে ডাকতাম, আমি সব খুলে বললাম ওনাকে, বললাম ও আমার পাড়ার ছেলে, আজকের রাত টা থাকুক আমার কাছে, কাল ভোরেই চলে যাবে, বড়ো বিপদে পরে এসেছে ও। উনি আর

কোনো আপত্তি করলেননা| অম্লান স্নান করে এলো, আমি আসার সময় নিউ মার্কেট আমিনিয়া থেকে চিকেন বিরিয়ানি প্যাক করে এনেছিলাম, রাতে তাই ই খেয়ে নিলাম দুজনে, অম্লান তো দারুন খুশি| আমার কিন্তু একটু ভয় হতে লাগলো, এই প্রথম হোস্টেল এর রুমে আমার সাথে কেউ অচেনা লোক থাকছে| আবার ভাবলাম, গেট তো রাতে বন্ধ, কি আর হবে, খেয়ে দেয়ে, শুভেন্দু দা কে ফোন করলাম, বললাম দাদা সেই ছেলেটা এসে গ্যাছে, কাল ভোরের দিকে এসো একটু, ওকে নিয়ে যেও, দাদা বললো ঠিক আছে, আমি শুভেন্দু দা কে শুভরাত্রি জানিয়ে শুয়ে গেলাম |

সকালে দেখি সাড়ে পাঁচটায় শুভেন্দু দার ফোন, বলছে টিনু গাড়ি নিয়ে আজগর দার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে, টিনু শুভেন্দু দার গাড়ির ড্রাইভার, আর আজগর দার আমাদের কলেজের ফার্স্ট গেটের সামনের কোল্ড ড্রিংকসের দোকান, আমি বললাম ও যাচ্ছে ১৫ মিনিটের ভিতর, তুমি অম্লানকে কাজ টাজ বুঝিয়ে দিও, আমি শনিবার আসবো তোমার ফ্যাক্টরিতে, বৃহস্পতিবার বিকেলে শুভেন্দু দা বললো যে ওকে ওই মেন্ গেটের ভিতর যে দারোয়ানের ঘর ছিল ওখানে থাকতে দিয়েছি, টাকা পয়সার কথা কিছু আলোচনা হয়নি, ওই দারোয়ানের ঘরে তো মশারি খাট বিছানা সব আছে, আপাতত এখানে দারোয়ানের কাজ ই করুক তারপর দেখবো কি করা যায়, আর খাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই, ফ্যাক্টরির ক্যান্টিনেই খাবে, আমি বললাম এই ই অনেক দাদা| ছেলেটার থাকা খাওয়ার কোনো ঠিক ছিল না, তোমার দৌলতে তো হলো সেটা, তারপর আস্তে আস্তে সব বুঝে, ও কেমন কি কাজ করতে পারবে সেটা জেনে কাজ দিও, আর সাথে সাথেই তেমন দায়িত্ব দিও না, আগে বিশ্বস্ততা অর্জন করুক তোমার কাছ থেকে, তারপর বুঝে শুনে ব্যবস্থা নিও|

শনিবার বিকেলের দিকে আমি শুভেন্দুদার ফ্যাক্টরি পৌছালাম| দেখি একেবারে গেটেই দাঁড়িয়ে অম্লান, কি খুশি ও| বড়োই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল ওকে, আমার ও খুব ভালো লাগছিলো ওর জন্য কিছু করতে পেরে, কিছুক্ষন পর শুভেন্দু দা এলো, আমি ওর অফিসে গিয়ে বললাম, দাদা ছেলেটা একেবারে মূর্খ নয়, গ্রাজুয়েশান করতে করতে ছেড়ে দিয়েছে অর্থ সংকটে, যদি ভালো বোঝো পরে কাজ বদলে দিও| দাদাও বললো হ্যাঁ, ছেলেটাকে দেখে ভালোই মনে হচ্ছে, আর কিছুদিন যাক তখন ভেবে দেখবো| আমি বললাম হ্যাঁ সেটাই ভালো, আমি ওখানে এক দু ঘন্টা থেকে, মন্দির তলা থেকে বাটাটা পুরি খেয়ে হোস্টেল ফিরলাম |

তারপর সব ইতিহাস, শুভেন্দু দার উত্থান পতনের মাঝে, অম্লান ছিল সর্বদা, আজ অম্লান ই সেই ফ্যাক্টরির অঘোষিত মালিক, আর একটা কথা বলা হয়নি, শুভেন্দু দা আমাদের কলেজেরই মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার| ও তার নিঃস্বন্তান বিধবা কাকিমার কাছে মানুষ| কাকিমাকে নিয়েই থাকতো, খুব ভালো মানুষ শুভেন্দু দা| অনেক বড়ো মনের মানুষ| আমি কলেজ ছেড়েছি ২০০৩ এর এপ্রিল কি মে- ঠিক মনে নেই, আমার কাছে কলেজ এ সন্তোষ কোম্পানির একটা সিডি প্লেয়ার ছিল, পরে অম্লানকে দিয়েছিলাম, গান শুনতো ওতে, আমি পাকাপাকি ভাবে কলকাতা ছাড়ি ২০০৪ এর শুরুতে, তখনও ওদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, কলকাতা ছাড়ার আগে শেষ হয়তো ২০০৪ এর ফেব্রুয়ারিতে একবার ওদের ফ্যাক্টরিতে গেছিলাম, দেখা করতে। তখন অম্লান ফ্যাক্টরির জুনিয়ার ম্যানেজার, আমায় বললো দাদা তোমার সাথে হয়তো আর কখনো সেভাবে দেখা হবে না| একটা ইচ্ছে আছে, তোমার একটা ছবি দিও, তখন এতো ক্যামেরার প্রচলন ছিল না, আমার মানি ব্যাগে একটা পাসপোর্ট ছবি ছিল সেটা দিলাম ওকে, অম্লান বললো, দাদা আজ “সিক্স বালিগঞ্জ প্লেসে” খাবো কিন্তু আমরা এক থালায় খাবো, শুনে আমার চোখে জল চলে এলো, তখন সিক্স বালিগঞ্জ সবে খুলেছে হয়তো, এখনও আপছা মনে পড়ে সাদা ধপধবে একটা বাড়ি, আমরা একথালায় খেলাম, খুশিতে মন ভোরে গেছিলো সেদিন দুজনের |

সেই ২০০৪ এর পর থেকে ওদের কারো সাথেই আর যোগাযোগ নেই, আমার ও তেমন করে আর কলকাতায় যাওয়া হয়না| সত্যি কথা বলতে কলেজ ছাড়ার পর আর সময় করে উঠতে পারিনি যে একবার কলেজটা তে যাবো, কনভোকেশান এর সময় আমি বিদেশে ছিলাম, মা বাবা গিয়ে আমার ফাইনাল সার্টিফিকেট নিয়ে আসে |

আজ শুভেন্দু দা আমাদের মধ্যে আর নেই, প্রায় বছর নয়েক আগে "কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে" তে এক সড়ক দুর্ঘটনায় শুভেন্দু দা প্রাণ হারায়, তার কারখানার মালিক এখন অম্লান ই, অম্লান শুভেন্দু দার কাকিমার কাছেই থাকে, লোক মুখে শুনছিলাম এই কদিন আগে, অম্লানের ঘরে আমার সেই দেওয়া পাসপোর্ট সাইজের ছবিটা বড়ো করে বাঁধানো আছে, হয়তো আর তেমন করে দেখাও হবে না অম্লানের সাথে কোনো দিন, কিন্তু সেই কুড়ি একুশ বছর আগের হাবড়া স্টেশনের দিনটা, আমার সাথে কাটানো অম্লানের দু তিনটে বছর, মনে লিখেই রেখে দিয়ে গেলাম।

ভালোবাসার খোঁজে

নবনীতা মুখার্জী

জীবনটা সবার সমান ধারাতে চলে না। কখনো ভালো থাকা, আবার কখনো মন্দ থাকা - এই দুই নিয়ে জীবনের পথ চলতে হয় আমাদের সবাইকেই। শুধু ভালো থাকলেই চলে না, ভালো রাখাটাও আমাদেরই কর্তব্য। আমাদের সকলের জীবনই চড়াই উতরাইতে ভরা।

২০১৪ সাল, সঞ্জয় তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ওর জীবনটা বন্ধুবান্ধব আর পড়াশুনাতেই আবদ্ধ ছিল। সেই সময় হঠাৎই দেখা হয়ে গেল মালবিকার সাথে। মালবিকা তখন প্রথম বর্ষের ছাত্রী। সঞ্জয় আর মালবিকা দুজনেই একই কলেজে পড়াশুনা করতো। কারণে অকারণে মাঝে মাঝেই দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হতে লাগলো। সঞ্জয় নির্দ্বিধায় মালবিকাকে নোটস দিয়ে পড়াশুনায় সাহায্য করতে লাগলো আর মালবিকাও ওর সাহায্য হাসিমুখে নিল। কিছুদিনের মধ্যেই সঞ্জয়ের ভালো লেগে গেল মালবিকাকে। এটা কিন্তু শুধুই ভালো লাগা ছিল,ভালোবাসা নয়। ওরা কথা বলা শুরু করলো। সারাদিন কথা বলা, সারা রাত কথা বলার একমাত্র সাক্ষী হয়ে থাকলো কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস আর ওদের মোবাইল ফোনটাই। এইভাবে সময় এগিয়ে চললো নিজ গতিতে। কেটে গেল তিন-চার মাস। আস্তে আস্তে তাদের ভালো লাগাটা ভালোবাসাতে পরিণত হলো। তার একমাত্র সাক্ষী হয়ে থাকলো ২০১৪ সালের কলকাতা বইমেলা। দিনটা ছিল ১০ই ফেব্রুয়ারি, সঞ্জয় আর মালবিকা, ওদের ভালোবাসার কথা একে অপরকে বলেই ফেললো নির্দ্বিধায়।

ভালো মন্দ নিয়েই ওদের জীবনটা কাটতে লাগলো নিজের ছন্দে। তারই মধ্যে সঞ্জয় কলেজ পাশ করে একটা বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরী নিয়ে চলে গেল দিল্লী। ওদের ভালোবাসার মাঝে এই প্রথমবার কেউ একজন এলো। এই কেউ টা ছিল সঞ্জয়ের জীবনের প্রথম চাকরী। সঞ্জয়ের চাকরীর ব্যস্ততা আর মালবিকার পড়াশুনা এই প্রথম ওদের ভালোবাসায় সামান্য একটু দূরত্ব সৃষ্টি করলো। দেখা সাক্ষাৎ কমে গেলেও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কথা বলা চলতো সময় সুযোগ করে। হয়তো ওরা প্রমাণ পেল ওদের ভালোবাসাটা কতটা গভীর হয়েছে। সঞ্জয় হয়তো বুঝলো সে মালবিকাকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না। দিন এগোতে থাকলো নিজের গতিতে। ওদের ভালোবাসা আস্তে আস্তে আরো গভীর হলো। মালবিকাও বুঝে গেল সেও সঞ্জয়কে ছাড়া বাঁচতে পারবে না।

ধীরে ধীরে ওদের ভালোবাসার সাথে ওদের নিজেদেরও বয়স বাড়তে লাগলো। সঞ্জয় চাকরী বদল করেছে অনেক দিনই হয়ে গেছে। এখন সে কলকাতাতেই একটা বেসরকারি ভালো কোম্পানিতে কর্মরত। মালবিকাও কলেজ পাশ করে একটা বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত। ওদের কর্তব্য বেড়েছে নিজেদের প্রতি, নিজের পরিবারের প্রতি এবং ওদের পূর্ণতা পাওয়া সম্পর্কটার প্রতি।

আজ ওদের সম্পর্কটা প্রায় সাত বছর হতে চললো। ভালোবাসাটা এখন আর আগের মতো আছে বললে বলাটা ভুল হবে। না না কমেনি, বরং আগের থেকে অনেক গভীর হয়েছে। আজও ওরা একে অপরকে পাগলের মতো ভালোবাসে। শুধু জীবনের ব্যস্ততার জন্য, সময়ের অভাবে আজ ওরা মাঝে মাঝে একটু বেশীই ঝগড়া করে ফেলে। কিন্তু দুজনের ভালোবাসাটা আজ ওদের একটু হলেও ভালো রেখেছে।

ওরা আজ দুজনেই খুব ব্যস্ত কারণ ওরা যে ঠিক করেছে বিয়ে করবে। দুজনের বাড়ির সহমত নিয়েই ওরা এগিয়ে গেছে বিয়ে করার সিদ্ধান্তে। আগামী ছয় মাসের মধ্যেই বিয়ের তারিখও ঠিক হয়ে গেছে। তাই ওরা

নিজেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নিজেদেরকে রাগ, ঝগড়া, অভিমান আর ভালোবাসার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। আজ ওরা সময়টা কম পায় নিজেদের জন্য। তাই দেখা না হলেও বিজ্ঞান - প্রযুক্তি ওদের দেখা করিয়ে দেয়। মানে ওরা আজ whatsapp এর ভিডিও কলিং এর মাধ্যমে বেশীরভাগ দেখাটা সেরে নেয়। তাতে ওরা ভালো না থাকলেও ভালো থাকার চেষ্টাটুকু করে। আজও কলকাতা বইমেলা, কফি হাউস ওদেরকে খোঁজে। জায়গাগুলোও হয়তো বুঝে গেছে যে ওরা এখন সময়ের জালে আটকে নিজেদের ভালো রাখতেও ভুলে গেছে।

সময়ের স্রোতে ওদের জীবন এগিয়ে চলে। অবশেষে হাজির হয় ওদের সেই বহু প্রতীক্ষিত বিয়ের দিন। চারিদিকে সানাই বাজছে, মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনের আশীর্বাদ ও ভালোবাসা নিয়ে ওদের ভালোবাসার সম্পর্ক, চিরদিনের একসাথে থাকার অঙ্গীকার - বিবাহ দ্বারা সম্পন্ন হয়।

এখন ওরা দুজনেই সুখী দম্পতি। ওদের জীবন নানান চড়াই উতরাইতে ভরা। এখন শুধুই ওদের ভালো থাকার চেষ্টা আর ভালো রাখার চেষ্টা। এইটাই হয়তো প্রকৃতির নিয়ম। এইটাই হয়তো পরিপূর্ণ ভালোবাসা। তাই ওরা আজও ছুটে বেড়াচ্ছে ভালোবাসার খোঁজে।

অশান্ত সময়ের স্মৃতিকথা

প্রীতিলতা বিশ্বাস

সত্তরের দশকের শুরু। আমরা থাকি পলতা বেঙ্গল এনামেল পোস্ট অফিসের কোয়াটার্সে। আমরা মানে, মা-বাবা সহ আমরা তিন ভাইবোন। বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার। আমার দাদা-দিদি তখন মিডিল-স্কুলে—মানে সপ্তম-অষ্টম শ্রেনি। আর আমি মাত্র বছর চারেকের। এই বয়সের স্মৃতি সাধারণতঃ মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু বেশ কিছু জিনিস আমার ভীষণ ভালো করে মনে আছে। আসলে স্মৃতিটা আমার একার নয়, পারিবারিক স্মৃতি এবং আমাদের ঘরোয়া আলোচনায় বার বার ঘুরে-ফিরে এসেছে ঘটনাগুলো। আমি যত বড় হয়েছি তত এই ঘটনাগুলোর যোগসূত্র আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে। আজ লিখতে বসে যুদ্ধ পীড়িত বা দেশ ভাগের শিকার হওয়া শিশুদের কথা মনে হচ্ছে—কেমন হয় তাদের শৈশবের স্মৃতি? আমার জানা নেই। আমি শুধু নিজের অভিজ্ঞতাটুকুই বলতে পারি।

গঠনঃ পলতা তখন ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি জনপদ। বেঙ্গল এনামেল ফ্যাক্টারি ছাড়াও আছে মোহিনী কটন মিল ও জুটমিল। গৃহস্থ বাড়িতে স্টিলের বাসন তখনও কাঁসার বাসনপত্রকে প্রতিস্থাপিত করতে পারেনি। কাঁসার বাসনের পাশে সস্তার বাসনপত্র হিসাবে এনামেলের বাসনের চাহিদা তখন যথেষ্ট। এছাড়া হাসপাতালের ট্রে, বেডপ্যান, ইউরিনপট ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস তৈরি হয় এনামেলের, এমনকি সৈন্যদের জলের বোতলের মতো জিনিসও। এছাড়াও পাবলিক সেক্টর হিসাবে পরিচিত ক্ষেত্রগুলিতে বাসন মানেই তখন এনামেল। স্টিলের উৎপাদন সস্তা হবার সঙ্গে সঙ্গে এনামেল কারখানা ক্রমে রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়ে হারিয়ে যায়।

পলতা স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে নেমে লেভেল ক্রসিং এর সামনে থেকে শুরু হয় বেঙ্গল এনামেলের বাউন্ডারি ওয়াল, শিয়ালদহের দিকে ভাঙাচোরা লম্বা প্রাচীরটা আজও টিকে আছে। লেভেল ক্রসিং এর দিকে একটা গেট, রেল লাইনের দিকে একটা গেট। আর প্রধান ফটক, যেটা দিয়ে মালবাহী লড়ি যাতায়াত করত সেটি ঘোষপাড়া রোডের উপর। বিশেষ দরকার ছাড়া সবগুলো গেটই বন্ধ থাকত। প্রধান ফটকের বাঁ পাশে একটা ঘর, যেটা প্রধান ফটক থেকে কিছুটা বাইরের দিকে এগিয়ে এসেছে, সেই ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকে কারখানার ভিতরে আসতে হত। এই ঘরটাকে টাইম অফিস বলা হত। দেয়ালে অনেকগুলো ঘড়ি আর তার সঙ্গে কার্ড পাঞ্চ করার মেশিনের ব্যবস্থা ছিল। শ্রমিকদের যাওয়া-আসার সময়ের উপর নজরদারি করার এই ব্যবস্থা তখন সব কারখানাতেই, বলা যেতে পারে এখনকার বায়োমেট্রিক এন্ট্রি-ডিপার্চারের একটা প্রাচীন দশা। প্রধান ফটকের ডান দিকে প্রথমে পোস্ট অফিসের দু-তিনটে কাউন্টার তারপর কোয়াটার্সের জানলা। ওই দেওয়ালের সঙ্গেই লাগোয়া ছিল কারখানার বাউন্ডারি ওয়াল। কোয়াটার্সের জানলাগুলো সাধারণ বাড়ির মত নয়। ওগুলো লম্বায় ছোটো কিন্তু চওড়ায় বড়। ঘরে আলো-বাতাস যথেষ্ট আসলেও চেয়ারে না উঠলে জানলা বন্ধ করা যেত না, বাইরেটা দেখাও যেত না। তবে আকাশ দেখা যেত খুব ভালো করে। আর পাল্লাগুলো ছিল স্যুয়িং করানো। ঘরের ছাদ সাধারণ বাড়ীর তুলনায় উঁচু, দৈর্ঘ-প্রস্থেও বিশাল। আসলে প্রয়োজনের তাগিদেই এনামেল ফ্যাক্টরি গোডাউনকে পোস্ট অফিস ও কোয়াটার্সে পরিবর্তিত করেছিল। পোস্ট অফিসের জানলাগুলো পাল্টে কাউন্টার তৈরী হলেও কোয়াটার্সের

জানলাগুলো আর ভাঙ্গেনি। পোস্ট অফিস বা কোয়াটার্সের কোনও স্বতন্ত্র প্রবেশপথ ছিল না। দারোয়ানের পাহারায় থাকা টাইম অফিসের দরজাটাই ছিল সকলের যাতায়াতের পথ।

অফিস আর কোয়াটার্সের মধ্যে ছিল একটা দরজা, যেটা দিয়ে আমি হামেশাই অফিসে চলে যেতাম। পোস্ট মাস্টারের পরিবার আর অফিস স্টাফদের সামাজিক সম্পর্ক ছিল অনেক বেশি আন্তরিক, অনেকটা এক্সটেনডেড পরিবারের মত। আঁটো-সাঁটো নিয়মের বেড়াজাল সেখানে ছিল না।

পলায়নঃ শিল্পাঞ্চল হবার কারণে পলতায় শ্রমিক সংগঠন ছিল খুব সক্রিয়, এমনকি এনামেল ফ্যাক্টারির মধ্যেও। নকশাল আন্দোলনের উত্তাল সময় তখন। প্রশাসনিক দমন-পীড়নও মাত্রা ছাড়া। পশ্চিমবঙ্গের রাস্তাঘাটে যত্র-তত্র চলছে সিআরপিএফ এর টহলদারি। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন সিআরপিএফের টহলদার ভ্যান বেঙ্গল এনামেলের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। কারখানার ম্যানেজারের কাছে খবর গেল। সিআরপিএফ কারখানার ভিতরে ঢুকে তল্লাশি করতে চায়। তারা সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে কারখানার ভিতরে ঢুকতে দেখেছে। ম্যানেজার এই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং তল্লাশির কোনও কাগজ না থাকা অবস্থায় তিনি কীভাবে তল্লাশি করতে দেবেন—ইত্যাদি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। সিআরপিএফ-এর জওয়ানরা কালবিলম্ব না করে রাইফেল উঁচিয়ে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আমাদের উঁচু জানলাগুলোর প্রত্যেকটির নিচে একজন করে জওয়ান রাইফেল পয়েন্ট করে দাঁড়িয়ে গেল। রাইফেলের সামনে রয়েছে বেয়োনেট। পোস্ট অফিসের কাউন্টার নিমেষে ফাঁকা, সেখানে দখল নিয়েছে রাইফেলধারীরা। বাবা অফিসের কাউন্টার বন্ধ করতে বলে ঘরে এসে জানলা বন্ধ করে দিলেন। দিদি স্কুলে চলে গিয়েছিল। কিন্তু দাদা সেকেন্ড হাফে পরীক্ষা দিতে যাবে বলে তখন খেতে বসেছে। দাদা করুণ দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে—কীভাবে যাবে স্কুলে—সামনের গেট দিয়ে যাতায়াত তখন বন্ধ করে দিয়েছে। মায়ের চোখ-মুখে আতঙ্ক। বাবা একটু ভাবলেন, তারপর দাদার স্কুলের দিকে চিঠি বিলি করেন যে পোস্টম্যান কাকু তাকে বললেন সেদিন দাদাকে সাইকেলে চাপিয়ে কারখানার পিছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতে। তার জন্য অবশ্য কারখানার ভিতরেই অনেকটা রাস্তা যেতে হবে। যাই হোক, অনেকটা অনিশ্চয়তা সঙ্গে নিয়ে এবং দুশ্চিন্তাকে পিছনে রেখে দাদা বেরিয়ে গেল। দাদা বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে দেখলাম বড় গেট খুলে গেল, সিআরপিএফের ভ্যান ভিতরে ঢুকল। তল্লাশি চলল, বেশ কিছুক্ষণ বাদে ভ্যান বেরিয়েও গেল। না, কাউকে পাওয়া যায় নি। অফিসের কাউন্টার খোলা হল, খোলা হল আমাদের ঘরের জানলাও। পোস্টম্যান কাকু দাদাকে ঠিকমতই পৌঁছে দিয়ে, চিঠি বিলি করে, দিনের শেষে অফিসে ফিরে এসেছিলেন। বাড়তি কোনও কথা ব্যয় করেন নি। কোনও বিষয় নিয়ে সরগরম আলোচনা তখন একেবারে অনুপস্থিত। থমথমে বাকি দিনটা শেষ হল।

দিদি সেদিন একটু তাড়াতাড়ি ফিরেছিল। আমি দিদিকে অবাক করে সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করলাম। বেলার দিকে যা যা হয়েছে তার কারণ তখনও পর্যন্ত আমাদের অজানা। একটু বাদে বাড়ি ফিরল দাদা। দাদা বাড়ি ফিরে, গলার স্বর নামিয়ে বলল—তোমরা কী জানো সকালে ফ্যাক্টারির ভিতরে কে ঢুকেছিল? আমরা সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের কাছাকাছি চলে আসলাম, উৎসুক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছি। একটু থেমে দাদা বলল—আমার সঙ্গে একই গেট দিয়ে শ্যামাপদ চৌধুরী(নাম পরিবর্তিত) তখন কারখানা থেকে বেরোলেন। ভাগ্যিস ওদিকে কোনও পুলিশের গাড়ি ছিল না। বাবাও ততক্ষণে অফিস থেকে ঘরে চলে এসেছেন। বাবাও দেখলাম বিষয়টা জানেন এবং বাকিটা বাবাই বললেন। একটা মিটিং সেরে ঘোষপাড়া রোড দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন

সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের(সিটু) রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্যামাপদ চৌধুরি, যাকে পুলিশ ইতিমধ্যেই খুঁজছে। সেই সময় সিআরএফ এর টহলদার ভ্যানের নজরে পড়ে যান উনি। একই সময় এনামেল ফ্যাক্টরি থেকে লরি বেরোচ্ছিল বলে বড় গেটটা খোলা ছিল। উনি সুযোগ বুঝে লরির আড়াল দিয়ে সাইকেল চালিয়ে সোজা কারখানার ভিতরের দিকে চলে যান। দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন শাখা শ্যামাপদবাবুর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে নেয়। ইতিমধ্যে গেটে সিআরপিএফ এর সঙ্গে কথোপকথনে ম্যানেজার সময় পার করতে থাকেন। কারখানার ইউনিয়ন সদস্যরা সব দেখে-শুনে পিছনের গেট দিয়ে ওনাকে বার করে দেন। একই সময় পোস্টমাস্টারের ছেলেও ঐ গেট দিয়ে বেরিয়ে স্কুলে যায়। শ্যামাপদবাবুর নিরাপদে বেরিয়ে যাবার সঙ্কেত পৌঁছানোর পর ম্যানেজার সিআরপিএফ কে ভিতরে এসে তল্লাশি করার অনুমতি দেয়। এই ছিল সেদিনের ঘটনা। সবশেষে বাবা দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন দাদা কোনও বন্ধুকে এসব কথা বলেছে কিনা। দাদা মাথা নেড়ে না বলল।

দহন১ঃ এখনকার মতো সকলের হাতে হাতে ফোনের কথা সেদিন কল্পনার মধ্যেও ছিল না। এমনকি সরকারী অফিস-কাছারি বাদ দিলে উচ্চবিত্ত গুটিকয়েক মানুষের বাড়িতে পাওয়া যেত ল্যান্ডফোন। যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে পোস্ট অফিসে তখন ল্যান্ডলাইন তো বটেই, এমনকি মিউজিয়ামে চলে যাওয়া টেলিগ্রাফেরও অস্তিত্ব ছিল। শ্যামাপদবাবুর ওই ঘটনার পরে, মাঝরাতে একদিন পোস্ট অফিসের দরজায় এবং আমাদের জানলার কাছে লোকজনের ছোটাছুটি এবং ডাকাডাকি—মাস্টারমশাই! ও মাস্টারমশাই! অফিসটা খুলন। ডাকাডাকিতে সকলে উঠে পড়লাম। উঠেই খোলা জানলা দিয়ে দেখা গেল আকাশে আগুনের হল্কা, লাল হয়ে গেছে চারিদিক। পোস্ট অফিস এবং সংলগ্ন কোয়াটার্সের উল্টোদিকেই ঘোষপাড়া রোড, রাস্তার ওপারে সিপিএমের পার্টি অফিস দাউ দাউ করে জ্বলছে। ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করার জন্য লোকজন বাবার দ্বারস্থ হয়েছে। ফায়ার ব্রিগেড আসতে কিছুটা সময় নিল। সে রাতে আর শোয়া হল না। মানুষজন একটু আধটু চেষ্টা করতে থাকল আগুন নেভানোর। জানলার সামনে চেয়ার পেতে আমিও সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলাম ঘরটার পুড়ে খাক হওয়ার দৃশ্য। এরপরে কিছুদিন, পোড়া ঘরটা চেয়ারে উঠে একটু দেখে নেওয়াটা আমার অনেক চুপি চুপি করা কাজের একটা অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। হয়তো অনেক 'কেন' যা আমার বোধের বাইরে ছিল, তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতাম।

দহন২ঃ বেঙ্গল এনামেলের একটা ছতলা বিল্ডিং ছিল যেটার সব তলাগুলোতে নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়নি তখনও। এই বিল্ডিং এর সিঁড়িতে কোনও রেলিং ছিল না, তাই আমাকে ওখানে একা যেতে দেওয়া হত না। মাঝে মধ্যে ওখানে চলে যাওয়াটা ছিল আমার চুপি চুপি করা কাজের আর একটা। তারও অবশ্য কারণ ছিল। এই বিল্ডিং এর তিন তলায় সৈন্যদের জলের বোতলে কাপড়ের ঢাকনা পরানো হত। আমাদের বাড়িতে ঠিকা কাজ করা ইরা মাসিকে বাবা এখানে কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ইরা মাসির কাছে যাবার জন্য আমি ঐ চুপি চুপি কাজটা মাঝে মধ্যেই করে থাকতাম। কিছুক্ষণ থাকার পর ইরা মাসি আমাকে আবার বাড়ি দিয়ে যেত। পার্টি অফিস পোড়ার কিছুদিন বাদে সন্ধ্যে রাতের দিকে, আমি আর দাদা আরও অনেকের সঙ্গে ঐ বিল্ডিং এর ছাদে উঠে গেলাম। আবারও আগুন। এবার পুড়ছে পলতা বাজার। বাজারটা বাড়ি থেকে একটু দূরে ছিল। তাই পোড়াটা চাক্ষুস করার জন্য দাদা ওখানে উঠে গেছে। এসব সময় দাদার পিছন আমি কিছুতেই ছাড়তাম না। আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা কারখানার কর্মচারীদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন। বোমা ফাটছিল বাজারের ভিতরে। দমকল আসলেও বাজার পুড়ল অনেকক্ষণ ধরে। ঘিঞ্জি

আর সরু সরু গলির ভিতরে দমকল ঢুকতে পারছিল না। আগুনের লেলিহান শিখা আর লাল আকাশ দেখতে দেখতে একটা সময় আমি আর দাদা নিচে নেমে ঘরে চলে আসলাম। দিনটা ছিল শনিবার। পরেরদিন রবিবার বাবার বাজারে যাবার দিন। দিদি ভালো বাজার করতে শিখে গেছে ততদিনে। তাই দিদি আর দাদা বায়না ধরল পরেরদিন সকালে ওরা বাজার করতে যাবে। বাজার এমনিতেও লাগবে। আর বাজার করার অছিলায় পোড়া বাজার সরজমিনে দেখে আসার সুযোগ হাতছাড়া করতে তারা একেবারেই রাজি নয়। আপোষ রফা চলছে দু-পক্ষের মধ্যে—একদিকে বাবা-মা আর একদিকে দাদা-দিদি। আমি দেখে যাচ্ছি। কোনও চাপ নেই। কারণ ওদের যাওয়াটা যদি অনুমোদন পায় তাহলে সঙ্গে আমিও যাচ্ছি। আমাকে ফেলে রেখে বাড়ি থেকে ওরা এক পাও বেরোতে পারবে না, সেটা আগের অভিজ্ঞতা থেকে ওদের জানা আছে। আসলে আট-দশ বছরের বড় দাদা-দিদির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে আমি ততদিনে স্বাভাবিকের থেকে বেশি বুঝতে শিখে গেছি। ওদের বলা ইংরাজি শব্দের অর্থ আন্দাজ করে নিজের মতো করে প্রয়োগ করা ছিল আমার নিত্য দিনের চেষ্টা। তাই আমার মুখে 'রেগুলার' শব্দ 'রেবুলার' হয়ে যেত, কিন্তু প্রয়োগ করতাম সঠিক জায়গায়।

যাই হোক, শেষমেশ অনুমতি জুটল, তবে শর্ত সাপেক্ষে। বাবা বললেন—বাজারে যেতে পারো, কিন্তু চোখ আর কান শুধু খোলা থাকবে, মুখ একদম বন্ধ থাকবে। বাজার পোড়া সংক্রান্ত কোনও কথা নিজেদের মধ্যেও বলা-বলি করবে না। চোখ দিয়ে দেখবে, কান দিয়ে শুনবে আর বাজারটুকু করে বাড়ি চলে আসবে। ঐ যে বাবা মুখে তালা-চাবি লাগিয়ে দিলেন, আমরা যাওয়া-আসার পথেও নিজেদের মধ্যে কোনও কথা বললাম না। বাজারে গিয়ে দেখলাম তখনও পোড়া বাঁশের খুটিগুলো থেকে জলে ভেজা একটা ধোঁয়া বেরোচ্ছে। চারিদিকে জল-কাদা আর আঁশটে পোড়া গন্ধ। পোড়া গন্ধের সঙ্গে কেরোসিন তেলের গন্ধও মিশে আছে। তারমধ্যেই বিক্রি না করলে ভাত জুটবে না, তাই বাজার নিয়ে বসেছেন অনেকে। আছেন আমাদের মতো ক্রেতারাও, রবিবারের বাজারটা যাদের ভীষণ প্রয়োজন। তবে তারা সকলেই প্রাপ্ত বয়স্ক। আমাদের মতো তিনটে কিম্ভূতকে লোকে একটু তাকিয়ে দেখল। কিন্তু আমরা তখন নিতান্ত গো-বেচারা, কিছুই বুঝি না। নেহাতই দরকার তাই আসা—এমন ভাব নিয়ে বাজার করছি। বাড়ি এসে আমাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলাম। দাদা-দিদি যতটা পারল মা-বাবার বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিল। আসলে বাজারে আগুন লাগানো হয়েছিল; প্রথমে কেরোসিন ঢালা হয়; তারপরে বোমা মারা হয়। কিছু রাজনৈতিক আলোচনাও হল, সেসব আমার মাথার উপর দিয়ে গেলেও কথা গেলাতে আমি ছিলাম ওস্তাদ। হয়তো ছোটোবেলার এই পরিমণ্ডলই আমাকে পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে সাহায্য করেছে।

মারণঃ পলতায় অনেকগুলি কারখানা খুব কাছাকাছির মধ্যেই ছিল। আর আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে পোস্ট অফিস ছিল শিল্পাঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক ও সমাজিক যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। স্বাধীনতার পর থেকেই ভারত সরকার পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মানুষের স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলির উপর বিশেষ জোর দিয়ে এসেছে। ১৯৬৮-সালে পাবলিক প্রভিডেন্টফান্ড অ্যাক্ট আনা হয়, যা রূপায়েনর মাধ্যম হিসাবে পোস্ট অফিসকে বেছে নেওয়া হয়। তাই পোস্টমাস্টার হিসাবে বাবার দায়িত্ব ছিল প্রকল্পগুলিকে মানুষের মধ্যে নিয়ে যাবার। এরজন্য প্রয়োজন হত জনসংযোগের। এরকমই একটি সূত্রে বাবার মানিককাকুর সঙ্গে আলাপ হয়। মানিককাকু রোজ বিকাল ৩টে থেকে ৪টের মধ্যে বাবার কাছে আসতেন। কিছু কথাবার্তা বলতেন, এক কাপ চা খেয়ে চলে যেতেন। বিকালের এই দুকাপ চা মা ঘর থেকে বানিয়ে অফিস আর ঘরের মাঝখানে যে দরজাটা ছিল সেই পর্যন্ত এনে আমার

হাতে দিতেন। আমি একটুও চা নিচে না ফেলে কাপগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দিতাম। কাজটা আমার বেশ পছন্দের ছিল। অপেক্ষা করতাম কখন সময়টা আসবে তার জন্য। সেদিনও অপেক্ষা করছি মানিককাকুর আসার জন্য এবং চা পৌঁছে দেবার জন্য। কিন্তু মানিককাকু এলেন না। মা তখন সারাদিনের কাজের ক্লান্তি নিয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন। সময়টা অনেকক্ষণ পেরিয়ে যাবার পর মাকে ডেকে বললাম—"দেখো মা, আজ মানিককাকু এলেন না।" মা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন—'সত্যিই তো! মানিক তো সাধারণত এরকম করে না। ঠিক আছে, আমি তোর বাবার জন্যেই চা করে দিচ্ছি, তুই দিয়ে আয়।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলা কোয়াটার্সের খিড়কির দরজা দিয়ে দুজন মহিলা মায়ের কাছে আসলেন। আগেও দু-একবার আমি ওনাদের মায়ের কাছে আসতে দেখেছি। কিন্তু সেদিন তাঁদের আচরণ ছিল একদম অন্যরকম। আমার মনে হল ওনারা আমাদের এখানে আসা-যাওয়া, কথা বলা সব বিষয়েই ভীষণ সতর্ক। মাকে খুব নিচু স্বরে কিছু একটা বললেন একজন, আমি শুনতে পেলাম না। মা আর্তনাদ করে উঠলেন, আমাকে বললেন—'শিগ্গিড়ি বাবকে ডেকে আন।' বাবা তখনও অফিসের কিছু কাজ করছিলেন। বাবা আসলেন, সব শুনলেন, সম্পূর্ণ চুপ করে গেলেন। কথা হচ্ছিল খুব নিচু স্বরে। তবে ততক্ষণে আমিও জেনে গেলাম সত্যিটা। মানিককাকু ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আর ওই দুজন ভদ্রমহিলা ছিলেন ওনার সহকর্মী। ঐদিন সকালে স্কুলের সামনেই একটি ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে বেঁধে মানিককাকুকে কুপিয়ে খুন করা হয়। যারা খুন করেছে তারা সকলেই ছোটোবেলায় তার স্কুলেই পড়ত। সারা পাড়ার মানুষ তখন জানলা দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে ছিল। মানিককাকুর বাড়িতে ছিলেন তার বৃদ্ধ বাবা, স্ত্রী আর ন-মাসের শিশু সন্তান। মা আর তার সহকর্মী দুজন শিক্ষিকা তখন আক্ষরিক অর্থেই কাঁদছেন। আরও একটা ঘটনা পরবর্তী দুদিনে ঘটল। মানিককাকুকে যারা খুন করেছিল শহরের বিভিন্ন জায়গায় তাদের অনেকের লাশ পাওয়া গেল। ধাক্কাটা সামলাতে সময় লেগেছিল আমাদের সকলেরই। বাড়িতে কথা-বার্তাই যেন কিছুটা কমে গেল। বিকালবেলা আমি বাবাকেই শুধু এককাপ চা দিয়ে আসি। টেলিভিশনহীন দুনিয়ায় আমার দিনের অনেকটা সময় যেত অফিসে গিয়ে চিঠি শর্টিং, গালা দিয়ে পার্সেলে স্ট্যাম্প মারা, লাল রঙের মেইল ভ্যানের আসা-যাওয়া ইত্যাদি লক্ষ্য করার মধ্যে দিয়ে। পোস্টম্যানকাকুদের প্রশ্ন করে বিরক্ত করাও ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর পোস্ট অফিস থেকে বেরোলে ছিল কারখানার ম্যানেজারের ঘর। ম্যানেজার ছিলেন একজন নেপালী ভদ্রলোক। তাকে সকলে লামা সাহেব বলে ডাকত। লামা সাহেবের ঘরের প্রতিও আমার খুব কৌতূহল ছিল। ইচ্ছে হলে একবার লামা সাহেবের ঘরে চলে যাওয়াটা ছিল আমার চুপি চুপি করা কাজের আর একটা। উনিও আমাকে বেশ প্রশ্রয় দিতেন। বাচ্চা বলেই হয়তো। বাইরের এই ঘটে চলা অশান্ত পরিস্থিতির আঁচ কারখানার ভিতরে আমরা খুব একটা অনুভব করতে পারতাম না। আমি আর দাদা মাঝে মাঝে কারখানার ভিতরে গিয়ে কীভাবে কাজ হচ্ছে দেখে আসতাম। মাস্টারমশাই এর ছেলে-মেয়েকে চিনত সকলে। কেউ কিছু বলত না। একজন আমাকে কাঠের ছোট্ট চাকি-বেলুন বানিয়ে দিয়েছিলেন খেলার জন্য, পলতা ছেড়ে আসার পরেও যেটা বহুদিন আমার কাছে ছিল। একটা ছোটো স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল, হঠাৎ প্রয়োজন হলে যার পরিষেবা আমরাও পেতাম। কারখানার বিশ্বকর্মা পুজোর ভোগ বাড়িতে দিয়ে যেতেন উদ্যোক্তারা। সেদিন অনেকের বাড়ীর লোকজন পুজো দেখতে আসত। প্রতিদিনের থেকে একটু অন্যরকমের পরিবেশ। এই সময় একমাত্র আমি আমার বয়সি বাচ্চাদের দেখতে পেতাম। বাবা পলতায় বদলী

হবার পর কারখানার এই পরিবেশে আমরা অনেকটাই সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। সেই জীবনে মানিককাকুর ঘটনা ছিল বড়সড় ছন্দপতন। উঠোন পেরিয়ে অনেকটা দূরে রান্নাঘর। মা অনেকদিন পর্যন্ত রাতে রান্না ঘরে একা একা কাজ করতে পারতেন না।

পঠন-পাঠনঃ দাদা-দিদির স্কুলে যাওয়া-আসা চলতে থাকল। ওরা একসঙ্গে স্কুলে যেত। দিদির স্কুল প্রথমে পড়ত, তারপর দাদার স্কুল। পলতায় বায়ুসেনার একটা অ্যারোড্রাম ছিল। সেই রাস্তায় বায়ুসেনার জওয়ানদের পাহারা থাকত। দাদা স্কুলে না গেলে দিদিকে একা এই রাস্তা হেঁটে পেরোতে হত। দিদির খুবই ভয় করত, কিন্তু কোনও উপায় ছিল না। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ-ই বাদামতলার পরে এনামেল ফ্যাক্টারির দিকে আর আসত না। একদিন দাদা-দিদি স্কুল থেকে ফিরল ভয়ানক অভিজ্ঞতা নিয়ে। স্কুল থেকে বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে বাদামতলার পরে হঠাৎ একটা মোড়ে এসে ওরা বুঝতে পারে সেখানে দু-দলের ভিতরে বোমাবাজি হচ্ছে। রাস্তা শুনশান। বাড়ীগুলোর দরজা-জানলা সব বন্ধ। ওরা ভাবছে তখন কী করা উচিৎ। এমন সময় একজন যুবক বেরিয়ে এসে ওদের বলে—'দাঁড়া এখন ওদিকে যাস না।' একটু আড়াল খুঁজে ওদের সেখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে যায়। বোমাবাজি চলছে, ওরা প্রাণ হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ বাদে আবার সেই যুবকটি এসে ওদের কিছুটা রাস্তা এগিয়ে দিয়ে বলে—'যা, এবার চলে যা। আর কোনও ভয় নেই।' সেদিন বাড়ী ফেরার পরও ওরা এত আতঙ্কিত ছিল যে পরের কয়েকদিন আর স্কুল যেতে পারল না।

দুটো থান ইঁট দিয়ে উঁচু করা একটি চৌকির উপর বসে পড়া-শোনা করত দাদা-দিদি। আমার তো পড়া-শোনা নেই। তাই ওরা পড়তে বসে গেলে আমার নিজেকে বড্ড বেকার মনে হত। তার উপর বাড়তি সমস্যা চৌকির উচ্চতা। উপর থেকে হাত ধরে একটু না টানলে একা একা উঠতেও পারতাম না। চৌকির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমানে বলে যেতাম—"আমাকে একটু উপরে তুলে দেনা।" একবার উপরে উঠলে আমি কী কী করব সেটা জানা থাকার দরুন ওরাও আমাকে তুলতে চাইত না। সেসময়ে পড়ার রেওয়াজ হল বই দেখে জোরে জোরে দুলে দুলে। বেশ কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা ও ঘ্যান ঘ্যান করার পর যখন চৌকির উপরে ওঠার সুযোগ পেতাম তখন প্রথমেই কোন্ পাতাটা পড়ছে দেখে নিয়ে দুই হাত দিয়ে দুজনের বই এর পাতা চেপে ধরতাম। প্রথম প্রথম ওরা থেমে যেতে বাধ্য হত। তারপর পুরো বিষয়টাই বিবর্তিত হল। আমি বই-এর পাতা চেপে ধরলে ওরা না থেমে মুখস্ত করা অংশ থেকে বলে যেত। আমিও তখন নিরুপায় হয়ে ওদের মুখ চেপে ধরতাম দুই হাত দিয়ে। বাবা অফিস থেকে এসে আমাকে নিয়ে গল্প না বলা পর্যন্ত আমি এই ভাবেই জ্বালাতাম ওদের। আমার এই দুষ্টুমির গল্প আমার মেয়েরও জানা আছে তার মাসির কাছ থেকে।

এহেন পড়ার ব্যবস্থায় হঠাৎ একটা পরিবর্তন আসল। পূর্ব পাকিস্তান মানে বাংলাদেশে তখন মুক্তিযুদ্ধ চলছে। ভারত সরকার এই মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সাহায্য করছে। নৈতিক সমর্থন নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমবাংলার মানুষ। পলতায় যেহেতু অ্যারোড্রাম ছিল তাই পাকিস্তানের বোমা হামলার সম্ভাব্য নিশানা হতে পারে পলতা। এছাড়াও সমগ্র কোলকাতা শহরের জল সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত পলতার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। বস্তুত টালা ট্যাঙ্কের ফিডার ট্যাঙ্ক ছিল পলতায়। তাই পলতা অঞ্চলে বোমা পড়লে তার প্রভাব অনেক গভীর হতে পারে। এই ভাবনা থেকে সরকার রাতে ব্ল্যাক আউট করে রাখার সতর্কতা জারি করল। ব্ল্যাক আউট মানে বাড়িতে আলোর উৎসগুলো এমনভাবে ঘিরতে হবে যাতে খুব সামান্য আলোই বাইরে যেতে পারে। এর ফলে বোমারু বিমান উপর থেকে জায়গাটা চিহ্নিত করতে পারবে না। বাবা জুতোর বাক্স কেটে কেটে সব ঘরের বাল্বগুলোর জানলার দিকের অংশ ঢেকে দিলেন।

টিউব লাইটের অস্তিত্ব নেই। পঞ্চাশ বছর আগের সেই হলুদ বাল্বের আলো, তাও অর্ধেকটা ঢাকা পড়ল। তখন থেকে দাদা-দিদির কাজ হল আলোর যে শঙ্কুটা বাল্ব থেকে বেরিয়ে আসছে সেটাকে চিহ্নিত করে পড়তে বসা। আমি আর ওদের পড়ার সময় বিরক্ত করতাম না। বাবা তার পুরোনো বই-পত্তর থেকে সবুজ রেক্সিনের কভার দিয়ে সেলাই করে একটা বই আমাকে দিয়েছিলেন, যার একটা ছবি দেখিয়ে বাবা আমাকে একটা গল্পও বলেছিলেন। যে গল্পের মূল কথাটা ছিল একজন মাঝি নৌকা পারাপারের ক্ষেত্রে ইংরেজ সাহেবের অগ্রাধিকার চাওয়াটাকে অমান্য করছে। বাবার গল্প বলার গুনেই সেই মাঝি আমার কাছে একজন হিরো হয়ে গেল আর আমি বইটার নাম দিয়ে দিলাম 'মাঝি বই'। এই মাঝি বই তখন থেকে আমার একান্ত পছন্দের সামগ্রীগুলোর একটি হয়ে গেল। দাদা-দিদি পড়তে বসলে আমিও মাঝি বই নিয়ে বসে যেতাম আর পাতা উল্টে উল্টে নিজের মতো করে বকে যেতাম। ওরা বাবার কাছে অঙ্ক দেখানোর পরে আমিও গিয়ে আবার একবার মাঝি-গল্পটা শুনে আসতাম। ওটা ছিল আমার পড়া বোঝা।

শ্রবনঃ এরমধ্যে বাবা একখানা রেডিও কিনে নিয়ে চলে আসলেন। উদ্দেশ্য একটাই—বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর শুনতে হবে। বাবার আদি বাড়ি ছিল নদিয়া জেলার চুয়াডাঙায়, যেটি বর্ডারের ওপারে পড়েছিল। বহুকাল চুয়াডাঙা ছেড়ে চলে আসা, তবুও মনের গভীরে সেই চুয়াডাঙ্গা অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল। তাই আজ থেকে ৫০ বছর আগে ৪৬৮ টাকা দিয়ে একটা রেডিও কিনে বসলেন, যার জন্য আবার বছরে ৫ টাকা লাইসেন্স ফি দিতে হত। যেদিন পাকিস্তানের সৈন্য আত্মসমর্পণ করল সেদিন এপারে বাস করা বাবার মতো আরও বহু মানুষের মনের বাসনা পূর্ণতা পেয়েছিল। শোনা গেল মুজিবুর রহমন দেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন আর তা আকাশবানী কোলকাতা থেকে সম্প্রচার করা হবে। আমাদের বাড়ির উঠোন ভর্তি হয়ে গেল কারখানার মানুষজনে। সকলে এসেছেন রেডিও তে মুজিবুরের বক্তৃতা শুনবেন বলে। বাবা একটা উঁচু জায়গায় রাখলেন রেডিওটাকে যাতে সকলে শুনতে পারেন।

গ্রহণঃ খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিল সমাজ জীবন। যদিও কারখানার বাইরের নাগরিক সমাজের সঙ্গে আমাদের তেমন কোনও মেলামেশা ছিল না, মেলামেশার তেমন সুযোগও ছিল না। বাবাকে মাঝে-মধ্যে দেখতাম রাত্রে অফিসে গিয়ে লোহার সিন্দুক খুলতে, যে লোহার সিন্দুকে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে হওয়া আর্থিক লেন-দেনের টাকা থাকত। এই সময় একজন কেউ আসত বাবার কাছে। বড় হয়ে জেনেছি পার্টি অফিস আর বাজার পুড়ে যাবার পরে ব্যাপক ধর-পাকড়ের ফলে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক সংগঠনগুলো দুর্বল হয়ে পড়ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির বহু সদস্য তখন গা-ঢাকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন। বাবা সরকারী কর্মচারী হয়ে সরাসরি সরকার বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারতেন না, কিন্তু মানুষ হিসাবে তার সীমাবদ্ধতা নিয়েই পার্টিকে সাহায্য করতেন। তার দায়িত্বে থাকা ওই সিন্দুকে নিরাপদে থাকত পার্টির তহবিল। যেদিন অফিসে ইন্সপেকশান হত সেদিন টাকার থলেটা চলে আসত আমাদের ঘরে।

হঠাৎ কারখানায় লকআউট হয়ে গেল। আমার আর দাদার অবসর সময়ে কারখানায় ঘোরাঘুরিতে ছেদ পড়ল। বন্ধ দরজার বাইরে এখন শ্রমিকদের পিকেটিং আর কারখানার ভিতরে সিআরপিএফের পোস্টিং। প্রায় এখনকার লকডাউনের মতো অবস্থা। তবে সারাদিন তো আর ঘরের মধ্যে থাকা যায় না। আমি আর দাদা কোনও সময় গেটের বাইরে চেনা মানুষগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম, আবার কোনও সময় ফাঁকা কারখানার মধ্যেই একটু ঘুরে বেড়াতাম। ক্রমে সিআরপিএফ-এর লোকগুলোও আমাদের সঙ্গে মিশতে শুরু করল। গেটের বাইরে থাকা মানুষগুলো আর গেটের ভিতরে থাকা মানুষগুলো পরস্পর বিপরীত অবস্থানে থাকলেও

আমাদের সঙ্গে দুই-পক্ষেরই একটা সহজ সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক। দ্বন্দ্বটা অন্য এক স্তরে, যেখান থেকে দু-পক্ষই আমাদের সযত্নে সরিয়ে রাখল। একদিন সিআরপিএফ-এর জওয়ানরা আমাদের চাটনি খাওয়ালো। ভারতের খাদ্য বৈচিত্র্যের ধারনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবোধ এবং নির্বোধ দুজন সেদিন লঙ্কার আচার খেয়ে এসে বাড়িতে বলতেই চোখ-মুখগুলো যেরূপ ধারণ করেছিল তা ঠিক ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না।

পরিবর্তনঃ লকআউট উঠল। কিন্তু কারখানার পরিবেশ আর আগের মতো রইল না। কারখানায় এখন বহিরাগত কিছু মানুষের আনাগোনা। বাইরে বোমাবাজির ঘটনা আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। এক রবিবারে বাবা দিদির দাঁত তুলিয়ে পলতা স্টেশনের দিক থেকে ফিরছিলেন, সেই সময় বোমার হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেল দুজনে। যেসব বহিরাগতরা কারখানার ভিতরে যাওয়া-আসা করত তাদের একজনের ডানহাত কব্জি থেকে উড়ে গেল ওইদিনের বোমাবাজিতে। কিছুদিন বাদে কাটা হাত নিয়েই তাকে আবার কারখানার ভিতরে স্বমহিমায় ঘোরা-ফেরা করতে দেখা গেল। আমি যখনই ওকে দেখতে পেতাম ভয় মিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে ওর কাটা হাতের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

১৯৭২-এর বিধানসভা ভোট মিটে গেল। কাটা-হাতের রিগিং এবং দৌরাত্ম দুই-ই দেখল মানুষ, যা শুধু পলতা নয়, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র অনুভূত হল। গণতন্ত্রকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যারা সেদিন নির্বাচিত হয়েছিল, পরবর্তী বছরগুলোতে তাদের রাজনৈতিক কর্ম পদ্ধতি লেখা আছে ইতিহাসে। বাবার বদলীর চিঠি এসে গেল। কী করে বাবা গা-ঢাকা দেওয়া পার্টি কর্মীদের কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন জানা নেই, তবে একদিন 'সেই একজন' এসে তহবিল নিয়ে গেল। আমাদের পলতার বাস উঠল। আমার সঙ্গে সেই চাকি-বেলুন আর মাঝি-বই থাকল মূল্যবান সংগ্রহ হিসাবে। আমি পড়তে শিখলেও মাঝি-বই কোনদিন পড়ি নি। তবে বাসা বদলের সময় কখনও মাঝি-বই হাত ছাড়াও করিনি। বাবা মাঝে মাঝে আমার মাঝি-বই নিয়ে গল্প শোনার পাগলামি মনে করে হাসতেন। বাবার স্নেহ মিশে ছিল ওর মলাটে, পাতায় পাতায়। তাই মনে হয় ওর অক্ষরগুলো আমার কাছে তেমন গুরুত্ব পায় নি। ২০০১-এ বাবা চলে গেছেন। তারপর হঠাৎ একদিন মনে হল মাঝি বইটা পড়ব। কিন্তু তখন আর বইটা বাড়িতে খুঁজে পেলাম না।

হারিয়ে যাওয়া একটি রান্নার গল্প

নন্দিনী পাল

১৮৭১ সালে ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে চালু হয়। সেই সময়, কলকাতা থেকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে যেতে হলে, শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে গোয়ালন্দ যেতে হত (অঞ্চলটি অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) শিয়ালদহ থেকে ট্রেনটি রাত্রে যাত্রা শুরু করত এবং পরের দিন খুব ভোরে গোয়ালন্দ পৌঁছত। গোয়ালন্দ অঞ্চলটি ছিল পদ্মা নদী ও ব্রহ্মপুত্রের সংযোগ স্থলে। এখান থেকে স্টিমারে নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল, সিলেট যাওয়া হত । স্টিমারে গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছতে সারারাত লাগত। স্টিমারের মাঝি ও সারেংরা নিজেদের খাবার জন্য রান্না করত। বেশির ভাগ মাঝি ছিল মুসলমান। তারা অল্প কয়েকটি উপকরন দিয়ে মুরগি রান্না করত। সেই সময় বাঙালি হিন্দু ঘরে মুরগির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, এই রান্নাটিকে মুরগির ঝোল বলা হত। সরষের তেলে রান্না করা হত। লাল রঙের পাতলা ঝোল হত এটি। সেই সময়ে ব্রয়লার মুরগি ছিলনা, দেশি মুরগিই রান্না হত। প্রথম দিকে এতে ডিম বা আলু দেওয়া হতনা। এই রান্নাটির সুঘ্রাণ সারা স্টিমারে ছড়িয়ে পড়ত। শিয়ালদহ থেকে সারারাত যাত্রা করে যাত্রীরা খুব ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত থাকত। মাঝিদের রান্নার সুঘ্রাণ পেয়ে, যাত্রীরা এই মুরগির ঝোল তাদের কাছ থেকে চেয়ে খেত। এই ভাবে এই রান্নাটির জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। এরপর গোয়ালন্দ স্টিমার ঘাটে অনেক খাবারের দোকান তৈরি হয়েছিল, যেখানে জনপ্রিয় এই রান্নাটি রান্না করা হত। ১৯৬৪ সালে যুদ্ধের সময়ে এই রেলপথ বন্ধ হয়ে যায় । যারফলে গোয়ালন্দ স্টিমার ঘাট তার গুরুত্ব হারায় এবং এই রান্নাটিও ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়।

২১ শতকে, রন্ধন বিশেষজ্ঞ পৃথা সেন এটির ইতিহাস খুঁজে বের করেন। তিনি এই রান্না টির খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারেন, একটি পাতলা, লাল রঙের মশলাদার ঝোল, যার উপরে বেশ তেল ভেসে থাকে। মুসলমান মাঝিরা এর মধ্যে ছোট চিংড়ি শুটকি দিত।

এই মুরগির ঝোল স্টিমারের যাত্রীদের দেওয়া হত। সব স্টিমারে শীল-নোড়া থাকত। এই রান্নায় শুকনো লঙ্কা, রসুন, আদা শীল-নোড়াতে থেঁতো করা হোত এবং পেঁয়াজ কুচিয়ে দেওয়া হত।

সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখায় এ পদটির খুব প্রশংসা আছে। তিনি লিখেছিলেন - “বিশ্বের খাবারের ইতিহাসে বাঙালির অবদান যদি কিছু থাকে তা হল গোয়ালন্দ স্টিমার কারি এবং হিন্দু বিধবার নিরামিষ রান্না “।

প্রায়শই নারায়ণগঞ্জ অভিমুখী স্টীমার গুলিতে একটি মুরগির ঝোল পরিবেশন করার কথা উল্লেখ করেছেন।

মুজতবা আলী, আক্ষেপ করে বলেছিলেন “আমি অবাক হয়ছি যে, বিক্রমপুরের তরুণী (বিক্রমপুরের মহিলারা সারা বাংলার সেরা রাঁধুনি হিসেবে পরিচিত ছিল) গোয়ালন্দ ষ্টীমারে কলকাতায় তার কলেজ হোস্টেলে যাতায়ত করে, জাহাজে ভাত, তরকারি খায়, তবুও সাধারণ নৌকাওয়ালদের দ্বারা রান্না করা স্টীমার ফাউল কারী তৈরি করতে সক্ষম হয়নি “।

সেই সময়কার প্রকাশনা যেমন, বেঙ্গল গেজেট, ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ারে প্রায়শই গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ষ্টীমারে গরম অথচ হালকা মুরগির তরকারি পরিবেশনের কথা উল্লেখ করা হয়ছে।

কলকাতার সুপরিচিত খাদ্য লেখক এবং ব্লগার ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ী বলেছেন, "এর জন্য প্রায় কোনো প্রামাণিক নথিভুক্ত রেসিপি নেই "।

বেঙ্গালুরুর একজন ফুড ব্লগার ইন্দ্রানী মুখার্জি বলেছেন "রান্নাটির সাথে সংযুক্ত দেহাতি উপাদান এবং অবশ্যই শুকনো লাল লঙ্কা এবং সর্ষের তেলের অতিরিক্ত পরিবেশন এটাকে অনন্য একটি মোচড় দেয়" ।

কলকাতার কয়েকটি রেস্টুরেন্ট এই রান্নাটি পরিবেশন করে। এলুমিনিয়ামের হাঁড়িতে মুরগি, শিল - নোড়াতে থেঁতো করা আদা - রসুন, শুকনো লঙ্কা এবং পিঁয়াজ কুঁচি, কুঁচো চিংড়ি বাটা এবং অনেকটা সরষের তেল দিয়ে রান্নাটি হোত। সব উপকরন একসঙ্গে মেখে হাঁড়িতে দিয়ে উনুনে বসিয়ে দেওয়া হোত। এই রান্নায় কোন জল ব্যবহার হতোনা, দেশী মুরগী ব্যবহার করা হোত। হাঁড়ির মধ্যে ধীরে ধীরে রান্নাটি হোত। এইভাবে ষ্টীমারের খালাসিদের সাধারণ একটি রান্না তার স্বাদ গন্ধের জন্য অসাধারণ হয়ে উঠেছিল।

গোয়ালন্দ স্টীমার কারি এইভাবে হারিয়ে গেলেও আজও মানুষের মনে তার জায়গা করে নিয়েছে। সেই সময় হিন্দু যাত্রীরা অনেকে গোয়ালন্দ থেকে ষ্টীমারে যাত্রা করত শুধুমাত্র এই মুরগির ঝোল খাওয়ার জন্য, কারণ সেইসময়ে তাঁদের বাড়িতে মুরগির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল ।

এইভাবে এই রান্নাটি বাঙালির রান্নার ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে।

আজও গোয়ালন্দ স্টীমার কারি নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই।

মুঠোফোনে মুঠোবন্দী

সবুজ বিশ্বাস

সেলফোন যাকে বাংলায় আদর করে মুঠোফোন আর তামিলে যাকে বলে কাইপেসি তা যে আজকাল সারা ভারত মানে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা অবধি প্রতিদিনকার জীবনের সাথে যাকে বলে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আর সবার কথা তো বাদই দিলাম, আজকাল মন্দিরের পূজারী থেকে রাস্তার ভিখিরি সকলের হাতে, মানে মুঠোতে ঐ একই যন্ত্র, সেলফোন। স্বয়ং ভগবান আগে জানলে মানুষের দুই হাতের জায়গায় তিনটে হাত দিয়ে মর্ত্যে পাঠাতেন, একটা হাত ওই এক্সলুসিভ সেলফোন ধরার জন্য। ধোপা, সবজিওয়ালার কথা তো বাদই দিলাম, এমনকি রদ্দিওয়ালার হাতেও দেখবেন ওই সেলফোন। উইকিপিডিয়াতে দেখছিলাম সারা ভারতে নাকি ২২০ মিলিয়ন সেলফোন ব্যবহারকারী আছে। চীনের পরেই নাকি ভারতের স্থান সেলফোন ব্যবহারে। এমনকি আমেরিকার উপরে ভারত। দেখছেন না গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র কেমন সেলফোন ছেয়ে গিয়েছে।

এমনটা কিন্তু ছিল না বছর পনেরো আগেও। এমনকি খোদ অ্যামেরিকাতেও ১৯৮৩ সালে একটা সেলফোনের দাম ছিলো ৪০০০ ডলার । আর এখন দুশো টাকাতেও সেলফোন পাওয়া যাচ্ছে ইন্ডিয়াতে।তাই আজকাল কাজের লোকের হাতেও দেখবেন ওই মোবাইল,এমন কি ওরা হোয়াটস আপ কল করে জানাবে আজ আসতে পারবে না কাজে।মোবাইল ছাড়া যেন আমাদের জীবন ইমমোবাইল। এই তো মিজানুর এসেছিলো বউকে দেখাতে। ওর বউয়ের চোখ মাঝে মাঝেই একটু লাল হয়। আর মিজানুর ওর বউএর চোখ একটু লাল হোলো কি না হোলো আমাকে ফোন লাগাবে মোবাইলে। সেদিনকে ফোন করে বললো সাবান দিয়ে স্নান করার পর ওর বউয়ের চোখ লাল হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম সাবান দিয়ে স্নান করলে আমারও চোখ লাল হয়। পত্নিপ্রেমে মিজানুর শাজাহানকে পর্যন্ত টেক্কা দিতে পারে। মনে আছে আগে একটা ইনটারন্যাশনাল কল করতে কত ঝামেলা ছিলো।অপারেটরকে কল করে প্রথমে টোকেন নামবার নাও, তিন ঘন্টা পর আপনার টারন আসতো।শুধু তাই নয় অনেক টাকা লাগতো একটা আই এস ডি কলের জন্য। এখন সব হাতের মুঠোয়।এস টি ডি কোড টিপে নম্বর লাগান।সাথে সাথে ফোন লেগে যাবে। সেলফোন ছাড়া কাজ চলতো না তখন? চিঠিতে লিখে দেওয়া হোতো ট্রেন থেকে নেমে ইঞ্জিনের পাশে বা হিগিনবোথামের বইয়ের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে।না, কেউ হারিয়ে গিয়েছে এমনটা চেনা জানার মধ্যে শুনিনি কখনো।আমারো অনেকদিন পর্যন্ত সেলফোন ছিলো না।অনেকে বলছিলো একটা সেলফোন নিয়ে নিতে।শেষমেষ বাংলাদেশের এক বৃদ্ধা মহিলা যখন বললেন, “দাদা, একটা সেলফোন লইয়া নিন, অতদূর থেকে আর আসতে পারুম না। সেলফোন হইলে জানাইতে পারুম কেমন আছে চক্ষুটা”।কথাটা ফেলতে পারিনি। প্রথমে নিয়েছিলাম একটা ডাব্বা ফোন নোকিয়া। ‘কানেক্টিং পিপল’। ফোনটা বাথরুমে পড়ে জল লেগে নষ্ট হয়ে যায়। তারপর কিনলাম একটা মোটোরোলা। সেটা একদিন আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে গেলো।এই ফোন্ গুলোর মাথায় যে কি থাকে ভগবান জানে। এরপর কিনলাম ব্ল্যাকবেরি। নখ না থাকলে ওই ফোন ভুলেও কিনবেন না। কিপ্যাডটা এত ছোটো যে কি বলবো। বন্ধুবান্ধব থেকে ছাত্ররা পর্যন্ত বলতে শুরু করলো “কি সাবেকি ফোন ইউজ করছেন স্যার!” না স্মার্ট হোতে হবে

তোমাকে স্মার্ট। তোমাকে নিতে হবে স্মার্ট ফোন। তাই নিলাম স্যামসাং গ্যালাক্সি স্মার্ট ফোন একবছর আগে। এতে নাকি এ্যাপ দিয়ে গান শোনা থেকে ট্যাক্সি ডাকা পর্যন্ত যায়। যাকে বলে জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ।

সত্যিই মোবাইল ছাড়া ইমমোবাইল আমাদের জীবন।ঘনঘন ফোন আসবে, আসতেই থাকবে।সব থেকে ফ্রিকোয়েন্ট ডায়ালগ ওই একটাই, " হোয়ার আর ইউ?" একদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম আমি এখন নেপচুনে। নেপচুনের নাম শোনেন নি।মানুষ আজকাল পারেও বটে। এত কথা, এত কথা।রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটা লাইন আছে না, " এত কথা আছে এত গান আছে, প্রাণ হয়ে আছে ভোর"। প্রথমটুকু তো খুবই সত্যি।একটা এ্যাডভ্যারটাইজমেন্ট দেখেছিলাম এয়ারটেলের। হিল স্টেশন। চারধারে কিছু পাহাড়ী লোকজন। একটা তরুন দুই হাত মেলে দিয়ে, আনন্দে বলে উঠছে, 'এখানে 4G নেই'। তখন একটা পাহাড়ী ছেলে দূর থেকে দৌড়ে ওদের কাছে এসে বলছে, " দেখো 4G এসে গেছে"।

আমরা সিকিমের একটা হিল স্টেশন রাবাংলায় গিয়েছিলাম। আমার এয়ারটেলের কানেকশন পাওয়া গেলো না।হোটেলের রিসেপশনের লোকেদের সাহায্য নিয়ে ট্যাক্সি ডাকতে হয়েছিলো বৈকি। কিন্তু জায়গাটা এত ভালো লেগেছিলো যে কি বলবো। তার একটা কারন একবারও সেলফোন ধরতে হয়নি।আমাদের ডাক্তারদের জীবনে দরকারে অদরকারে সেলফোনে কল আসে।মাঝে মাঝে তাই মোবাইলহীন দুনিয়াতে থাকতে খারাপ লাগে না। কিন্তু আজকালকার টিন এজারদের কথা একদম আলাদা। ওদের মোবাইল হাতে না থাকলে মনে করে যেন অথৈ জলে পড়েছে। এটাকে নাকি নেমোফোবিয়া নাম দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের জীবন কন্ট্রোল করছে ওই মোবাইল নামক যন্ত্রটি।মিসড কল আর এস এম এস। তার সাথে এক নোতুন আপদ জুটেছে হোয়াটস এ্যাপ।যাতে করে চোখের ছবি, এমন কি ভিডিও, এক্স রে মায় সিটি স্ক্যান অবধি পাঠানো যায়। পেশেন্টরা প্রায়ই বলে ডাক্তারবাবু সব রিপোর্ট পাঠিয়েছি। সতেরোটা রিপোর্ট ছিলো, ইউরিন থেকে এ্যাঞ্জিওগ্রাম অবধি।

আমাদের ছেলেবেলার জীবন এমন ছিলো না কিন্তু। মনে আছে বাবা কুড়ি বছর গভরমেন্টের চাকরি পর টাকা জমিয়ে , আমাদের দুর্গাপুজোর জামাকাপড় কেনার খরচ কমিয়ে কিনেছিলেন মারফি ট্রানজিস্টার। তাতে পাওয়া যেতো দুটো স্টেশন, কলকাতা ক আর কলকাতা খ। বুধবার সাড়ে নটায় ছিলো অনুরোধের আসর আর শুক্রবার সাড়ে নটায় ছায়াছবির গান। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়ের সংবাদ সমীক্ষা। রবিবার দুপুর দেড়টায় বাংলা নাটক। মহালয়ার দিন ভোর রাতে মহিষাসুরমরদিনী।নোতুন ব্যাটারি লাগানো ট্রানজিস্টারে শুনতাম" যা দেবী সর্বভূতেষু"। আমরা কি খুব কষ্টে ছিলাম?আজকাল সুবিধা বেড়েছে, সাথে সাথে চাহিদাও। এখন আমাদের শান্তিতে পেচ্ছাপ করারও উপায় নেই। শুধু বাজলে কথা ছিলো, ভাইব্রেশন মোডে থাকলে তো বেশ মুশকিল। তবু ফোন মানে স্মার্ট ফোন না হলে চলে না আজকের জীবন।কী নেই এতে, কন্টাক্ট লিস্ট থেকে, ক্যামেরা, ক্যালকুলেটর, মিউজিক,ভিডিও, গেমস, হোয়াটস এ্যাপ,মেসেজ, ইমেল। এমনকি সেদিন দেখলাম আমার অফথ্যালমোলজিস্ট কলিগ চোখ দেখছে সেলফোনের টর্চ দিয়ে। তাই আজ আট থেকে আশি অবধি সবাইকে মুঠোবন্দী করে ফেলেছে এই সেলফোন থুরি মুঠোফোন।সমীক্ষায় দেখা গেছে আজকের দিনের টিন এজাররা ষোলো ঘন্টায় অন্তত একশ আট বার মেল কিংবা মেসেজ চেক করে।আমার এক কলিগের দেখলাম আঙুলের ডগাটা ক্ষয়ে গেছে এস এম এস করতে করতে। মাথাই তুলতে চায় না আজকালকার দিনের ছেলেমেয়েরা মোবাইল থেকে।কথা

বললে মনোসিলেবলে উত্তর দেয়, "ওয়েট"। আমার এক বন্ধু তার ফ্যামিলি নিয়ে এসেছিল এক রবিবার বিকেলে নির্জলা আড্ডা দিতে। ওর সাথে এসেছিল ওর কুড়ি বছরের মেয়েটি । আমরা ঘন্টা দুয়েক গল্প করেছিলাম নানা বিষয় নিয়ে। মেয়েটি মুখ ডুবিয়ে রেখেছিল ওর স্যামসাং মোবাইলে। গুগল থেকে ইউটিউবে, ইউটিউব থেকে হোয়াটস এ্যাপ,হোয়াটস এ্যাপ থেকে মেসেজ, এই নিয়ে ব্যস্ত ছিল মেয়েটি সারা দুঘন্টা।শুধু যাবার সময় বলেছিলো, "বাই আঙ্কল"। এটা খারাপ কিছু বলছি না। আমিও তো এখন জিমে গেলে সেলফোনে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনি ট্রেডমিল করতে করতে। আমার সেলফোনে তিনশো কুড়িটা গান লোড করে দিয়েছে আমার কন্যারত্নটি। মনে আছে বছর পনেরো আগেও ওয়াকম্যান কোমরে বেঁধে জগিং করতে যেতাম।এক সাইডের ক্যাসেট শেষ হলে থেমে গিয়ে পাল্টাতে হোতো ক্যাসেট। এখন ওসবের দরকার হয় না। স্মার্টফোনই আপনার জন্য ম্যাচ করা গান খুঁজে দেয়। আজকাল ড্রাইভারকে বসিয়ে রাখলে ওদের কোনো অসুবিধাই হয় না। এই তো সেদিন দেরী হয়ে গেলো, একঘন্টা বলে তিনঘন্টা পরে এলাম মিটিং শেষ করে।ফিরে এসে ড্রাইভারকে সরি বলতে যাচ্ছিলাম, ও বললো না স্যার, আমি মোবাইলে একটা তামিল মুভি দেখছিলাম রজনিকান্তের। সুবিধাই হয়েছিলো ওর। স্মার্ট ফোন আজকাল সব পারে। এয়ারপোর্ট,রেলস্টেশন, বোরিং মিটিংএ আপনাকে আর ভুগতে হবে না সময় কাটানোর জন্য। আঙুলের ডগার ছোঁয়ায় এনটারটেইনমেন্টের সমুদ্রের গভীরে চলে যেতে পারবেন। সময় কোথায় কেটে গেলো বুঝতেই পারবেন না।অসুবিধাও আছে।ওই আঙুলের ডগার ছোঁয়ায় কমবয়সী ছেলে বা মেয়েরা গুগল ধরে এমন সব সাইটে চলে যাবে যা নজরে পড়লে ষাটের দশকের আপনি ছোটো খাটো হার্ট এ্যাটাকের সম্মুখীন হতে পারেন। আমার পঁচাশি বছরের শাশুড়িমাতা কথামৃত, গীতা নয়, এই মুঠোফোনে পাশের বাড়ি থেকে প্যারিসের ছেলেকেও নেট ওয়ার্কে ধরে নিয়েছেন। লিভ উইথ দা টাইম ম্যান। মুঠোফোনে শুধু মুঠো মুঠো সুখই নয়, দুঃখও পেতে পারেন মুঠো মুঠো। সবাই এখন বিজি। বিজি উইথ হোয়াট ? সেলফোন।শুনতে পাবেন সেলফোন বলছে, " দা পারসন ইউ আর টকিং, ইজ বিজি টকিং উইথ সামওয়ান এলস। কে সেই সামওয়ান এলস আপনি জানতে পারবেন না। তিরিশ বছর আগে ছাত্র অবস্থায় আমেরিকায় গিয়েছি। ডায়াল করার পর ল্যান্ডলাইনে এই মেসেজটা শুনেছিলাম, " প্লীজ চেক দা নামবার এ্যান্ড কল এগেন" মনে আছে আমি বলেছিলাম , " আই হ্যাভ চেকড দা নাম্বার"। তখন কি জানতাম ওটা রেকর্ডেড মেসেজ।এখন সব থেকে অমধুর মেসেজ, "দা পারসন হুম ইউ আর কলিং ইজ নট এ্যাকসেপটিং ইয়োর কল"।সেটা যদি আপনার মেয়ে অথবা বৌয়ের সেলফোন থেকে আসে,তবে মনে হয় বাড়ি গিয়ে একহাত নিয়ে আসি। এটাও শুনবেন, "দা পারসন হুম ইউ আর কলিং ইজ নট আভেইলেবল ফর ইয়োর কল রাইট নাউ"।কেন?জানতে ইচ্ছে করবে আপনার।ফোন তুলতে কি অসুবিধা হচ্ছে ওনার? হাত কি ভেঙ্গে গেছে? উনি কি এখন অন্য গ্রহের বাসিন্দা হয়ে গেছেন?সব থেকে খারাপ আপনি মিসড কল পেয়ে যখন কল ব্যাক করলেন তখন তিনি "দুসরি কল পর ব্যাস্ত রহা হ্যায়"। মনে হয় দৌড়ে গিয়ে একটা চাঁটি মেরে আসি।শুধু এসবই নয় , আরো আছে।আপনার সেল নাম্বার অনেক সময় আপনার ফোন কোম্পানী পয়সা নিয়ে বিক্রি করে দেয় বিভিন্ন কোম্পানী বা সংস্থার হাতে। মারুতি গাড়ির সেলসম্যান থেকে প্রোপারটি ডিলারআপনাকে। কল করবে যখন তখন। আজে বাজে ব্যাংক চাইবে আপনাকে লোন দিতে। ক্রেডিট কার্ড কোম্পানী জানতে চাইবে কদিন আগে আপনি যে সাত হাজার টাকা খরচ করেছেন সেটা সস্তা ই এম আই এ কনভার্ট করতে চান কিনা। এসব

কল আসবে যখন আপনি ওপিডিতে পেশেন্ট দেখছেন, কিম্বা সায়েন্টিফিক মিটিঙ্গে আছেন।পরের টকটা আপনার। বুঝতে পারবেননা কোনটা দরকারি কোনটা অদরকারি ফোন। এমনকি শুনেছি ভারতের রাস্ট্রপতির কাছেও নাকি এরকম ফোন আসে। অবশ্য শোনা কথা।

সেলোফোন নিয়েছেন। চলছে, ভালো কথা।কিন্তু একবার খারাপ হলে বিশাল ঝামেলা।এদিক ওদিক ঘুরতে হবে সঠিক জায়গা পাবার জন্য যেখানে সারাতে পারবেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ওটার মায়া ত্যাগ করতে হবে। বলতে হবে ' হে বন্ধু বিদায়'।আসলে এরা কাজের লোকের মত। ওই চার পাচ বছর কাটাবে আপনার সাথে।

সেলফোন হানিকারক কিনা বা বেশী ইউজ করলে ক্যান্সার হতে পারে কিনা এসব নিন্দুকেরা বলাবলি করে। না, ক্যান্সার সেলফোন থেকে হতে পারে না।এতে এত কম রেডিয়েশন হয় যে সেটা নগন্যই বলা যায়। তবে সেদিন মেডস্কেপ নামে একটা ওয়েবসাইটে দেখছিলাম শুয়ে শুয়ে সেলফোন ব্যাবহার করলে নাকি টেম্পোরারি ভিসন লসের সম্ভাবনা আছে, কতদূর সত্যি তা আমি জানিনা।তবে আমার এক শ্রদ্ধেয় লেখক বন্ধুর বউ নিজের সেলফোনটাকে ভুল করে জামাকাপড়ের সাথে ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে দিয়েছিলেন।সেলোফোনের এত অপমান আগে শুনিনি।

সেলফোন আছে ভালো। কিন্তু হারালে বিষম বিপদ। ক্রেডিট কার্ড কিংবা এমনকি বউ হারানোর সংগে তুলনা করা যেতে পারে।বছর তিনেক ধরে জমানো চারশো লোকের কনট্যাক্ট হারিয়ে ফেলবেন এক মুহূর্তে। পড়বেন যাকে বলে অথৈ জলে।তাই সেলফোনের কন্টাক্টদের একটা কপি করে কোথাও রেখে দিন। এমনকি নোটবুকে রাখুন না। কেননা সেলফোন হারাচ্ছে আকছার।প্লেনের সিটের পকেটে,কাপড়ের দোকানের ট্রায়াল রুমে, অটোতে, ট্যাক্সিতে রোজ কেউ না কেউ ফোন হারাচ্ছেন।

সেলফোনে কল আসছে ঠিক আছে। এস এম এস কিন্তু সাবধানে করবেন। আমি জানি জিমে ট্রেডমিল করতে করতে এস এম এস করার চেষ্টা করতে গিয়ে একজন পড়ে গিয়ে পা ফ্রাকচার করে ফেলেছিলেন। সেদিন একটা অটোতে উঠেছিলাম। অটো ড্রাইভার অটো চালাতে চালাতে টেক্সট করতে শুরু করেছিলো। আমি পয়সা দিয়ে নেমে পড়েছিলাম।

সেলফোন এ্যাডিকশন আজকালকার দিনের এক নোতুন ব্যাধি। বিশেষ করে ইয়াং জেনোরেশনের।সমীক্ষায় দেখা গেছে শতকরা ৬৭ ভাগ সেলফোন ইউজার ফোন না বাজলেও চেক করেন তাদের স্মার্ট ফোন।জাপানে নাকি নাইনটি পারসেন্ট ইয়াং জেনোরেশন সেলফোন ইউজ করেন এমন কি শাওয়ারের সময়ও। তাই ওদেশের অধিকাংশ সেলফোন ওয়াটারপ্রুফ।সেলফোনের পাল্লায় পড়ে পড়াশুনো গোল্লায় যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের এ কথা এখন সবাই বলতে শুরু করেছে। অধিকাংশ স্কুলে বাচ্চাদের সেলফোন নিয়ে ঢোকা বারন করে দেওয়া হয়েছে। তাই এই ছোট্ট যন্ত্রটা আপনি ব্যাবহার করছেন না যন্ত্রটা আপনাকে ব্যাবহার করছে সেটা ভেবে দেখবার সময় এসেছে।সময় এসেছে উত্তর দেওয়ার যে সেলফোন আজকে বুন (BOON)না বেন(BANE)।আশীর্বাদ না অভিশাপ ? উত্তরটা আপনিই দিন।

প্রবাস জীবন এবং তার আধার

পারমিতা রায়

বছরের বেশীর ভাগ সময়েই চেন্নাই তে প্রখর তাপ, ঝাঁঝালো রোদ। গ্রীষ্মকালে তো কথাই নেই। চেন্নাই এর আবহাওয়া সম্মন্ধে একটি প্রচলিত কথা : এখানে তিন ঋতু, গরম, বেশী গরম আর অত্যধিক গরম। চেন্নাইতে প্রবাসী বাঙালি হয়ে থাকার দরুন, একরকম ভুলেই গেছি বাংলার গ্রীষ্মের সেই দামাল ঝোড়ো বিকেলের হাওয়া, ভুলে গেছি এক পশলা বৃষ্টির ধারার সাথে কালবৈশাখী ঝড়, বাংলার আম, জাম, লিচুর সাথে কাটানো ছোটবেলার সেই গ্রীষ্মকালের দুপুর, বিকেলের সময়গুলো। আম জাম এখানেও পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে তো আর বাংলার স্বাদ থাকে না! বাংলার হিমসাগর, ল্যাংড়া, ফজলি, পেয়ারাফুলি আরো কতশত নামের আম, সে আর কোথায় হেথা?

ছোটবেলার ডানপিটে সেই আমি, আর আমার ফেলে আসা সেই মেয়ে বেলা মনে করিয়ে দেয় "ওরে গাছে চড়িস নে, পড়ে গেলে হাত পা ভাঙলে তোর বিয়ে দেব কেমন করে? ওরে পেয়ারা গাছের থেকে নেমে আয়, নেমে আয়। ওরে মাটিতে পড়ে থাকা আম জাম আর কুড়োস না, ঘরে চলে আয় তাড়াতাড়ি চলে আয়"। মনে পড়ে সেই বাবার ডাক "গরমকালের এই ভরা দুপুর বেলা নামিস না আর জলে শালুক ফুল তুলতে, ডুব সাঁতার দিতে।" মনে হয়েছে বার বার, আমারি হাত পা ভাঙলে বিয়ের সমস্যা, দাদা ভায়েদের কোনো সমস্যা নেই? অনেক সময় লেগেছে বুঝতে যে সমাজের অধীনে ছিলেন আমাদের বাবা মায়েরা, কিন্তু হয়তো আমরা তাদের থেকে বেশী মুক্ত। আমার মেয়ে থাকলেও আমি আজ আর সেই পার্থক্য করতাম না। অনেক সময় লেগেছে, বাবা মায়ের সেই অবস্থানকে বুঝতে, মানিয়ে নিতে।

পাঁকে পা আটকাবার অজানা আশঙ্কাতে.... থাক সেকথা, এখন ফিরে আসি বর্তমানে, প্রবাসী বাঙালির চেন্নাইতে। দীর্ঘ কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি - আমরা বাঙালিরা সর্বত্রই খুঁজে বের করে নিই আমাদের শস্যশ্যামলা, রবিঠাকুর, নজরুল, সুকান্তের সেই সোনার বাংলাকে। আমরা প্রবাসেও বাঙালিরা বিশেষত চেন্নাইতে - সব ঋতুতেই আনন্দ উপভোগ করি। শীতের মিষ্টির আনন্দ, পিঠেপুলির আনন্দ উপভোগ করতে আমরা জড়ো হয়ে যাই টি নগর বেঙ্গল এসোসিয়েশনের প্রাঙ্গনে, আমাদের সকলের আবেগের জায়গাতে। তাইতো প্রবাসে বাঙালিরা আনন্দ উপভোগ করেন সকল ঋতুর, কারণ বাঙ্গালীরা সম্ভবত সেই কম্পিউটার সফটওয়্যার এর মতো যেখানেই থাকুক, বাংলাকে ইনস্টল করে নেয়।

শীতের আনন্দ উপভোগ করার জন্য আমরা জমা হই, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজিত পৌষ পার্বণ মেলাতে। আমরা নাচ গান কবিতা পাঠেরও আনন্দ উপভোগ করি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বাংলা বিহারের ছৌ নৃত্য, অ্যাসোসিয়েশনের গায়ক-গায়িকাদের মিষ্টি গানের সুরে, বাংলার লোকনৃত্য, নাটক কবিতাতে ভরে ওঠে আমাদের মন প্রাণ। আমাদের জীবন আনন্দমুখর হয়ে ওঠে, আমাদের কর্মরত, একঘেয়ে ব্যস্ত জীবন আনন্দঘন হয়ে ওঠে।

কেটে যায় সকল ক্লান্তি, একঘেয়েমি। সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে আমাদের প্রাণ-ভোমরা।

বেঙ্গল এসোসিয়েশন এর মেলা প্রাঙ্গন আমাদের সুযোগ করে দেয় নানান স্টলের মাধ্যমে নিজেদের আঁকিবুকি, ঘর সাজানোর সামগ্রী, সেলাই করা হাতের কাজ, ঘরে আঁকা মাটির প্রদীপ, হাতে তৈরি নানান গহনা, ক্লে জুয়েলারি, ফেব্রিক জুয়েলারি, এমনকি রান্নাবান্না বাকি সদস্য এবং দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরার জন্য। পুজোর সময় আনন্দমেলা এবং আরো দু একটি উপলক্ষে নানান ধরনের ঘরে বানানো খাবারের স্টলেরও সুযোগ করে দেয় আমাদের এই বেঙ্গল এসোসিয়েশন। এককথায় বলতে গেলে, বেঙ্গল এসোসিয়েশন বেশ কয়েকটি ভিন্ন স্বাদের, মঞ্চ উপহার দেয় তার সদস্যদের, যে যেটি বেছে নেয়। দোতলার মঞ্চ দেয় পরিবেশন শিল্পকলার সুযোগ। পুজো আর্চাতে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে বাংলার পুজোর মৌসমে। খাবার দাবার রান্না এবং পরিবেশনের সুযোগ থাকে আনন্দমেলা এবং পুজোর ভোগ বিতরণের মাধ্যমে, ক্ষুদ্র শিল্পের সুযোগ আছে স্টলের মাধ্যমে। যারা ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী তারা থাকেন কার্যনির্বাহী সমিতিতে।

শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির আনন্দই শেষ কথা নয়। এইতো সেদিন পিভিআর সিনেমা হলের প্রেক্ষাগৃহে দাপিয়ে মুক্তি পেলো একটি বাংলা চালচিত্র। এই তামিলনাড়ুতে নানান তামিল এবং দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের মাঝেও বাঙালিরা জড়ো হয়েছিলেন অ্যমপা স্কাইওয়াকে "দ্য অ্যাকেন" চলচ্চিত্রটি দেখার জন্য। সাথে দর্শকরা উপহার হিসেবে চলচ্চিত্রের শেষে একেন বাবু, অনির্বাণ চক্রবর্তী সাথে ছবি তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন শুধুমাত্র বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে। সেই মুহূর্তটি সকল দর্শকদের কাছেই সারা জীবন আনন্দমুখর মুহূর্ত হয়ে থাকবে।

আসলে বাঙালিরা ঠিক সেই চারা গাছ গুলির মত, যেগুলো পুষ্ট সেই মাটির উপর ঠিক মাথা তুলে স্বনির্ভর ভাবে নিজেদের ইচ্ছেমতো বেঁচে থাকে। নিজেদের ইচ্ছে গুলোকে সহজ সতেজ করে তুলি পৃথিবীর সর্ব কোণ থেকে। ওই যে বললাম বাংলা ইনস্টল করে নিই আমরা। সমস্ত চোখ রাঙ্গানিকে জীবনের চলার পথে অগ্রাহ্য করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টুরিস্যম এন্ড ট্রাভেল ম্যানেজমেন্ট এর ছাত্রী হবার দরুণ একটু ভিন্ন চোখে দেখেছি তামিলনাড়ুর আনন্দ উৎসব, সংস্কৃতি এসবের সাথে বাংলার সংস্কৃতিকে মিলেমিশে একাকার হতে, বিশেষত আমাদের মহালয়ার অনুষ্ঠানের সময়, দুর্গোৎসবের সময়ে, বিদ্যাদেবীর আরাধনার সময়ে আয়োজিত নানান সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। চেন্নাইতে ভ্রমণের প্রধান স্থল ম্যারিনা বীচ আর তার পাশেই বিবেকানন্দের মহল, মিউজিয়াম। এই V House এর আগে নাম ছিল Ice House. কেন জানেন? উনবিংশ শতাব্দীর মাঝের দিকে ফ্রেডেরিক টুডোর তিনটি Ice House বানিয়েছিলেন তিন বন্দর শহর কলকাতা, মুম্বাই এবং চেন্নাইতে। চেন্নাইয়েরটি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে। বরফ সংরক্ষণ করার জন্য। সেকালে ফ্রীজার ছিল না। বাকি দুটি আজ আর নেই। জাহাজ ভর্তী করে বরফ আনা হতো ইংল্যান্ড থেকে এবং তা মাসাধিক কাল সংরক্ষিত থাকতো এই Ice House এ। শতাব্দীর শেষের দিকে যখন বরফ তৈরীর প্রযুক্তি জন্ম নিলো, তখন ডকে উঠলো টুডোর সাহেবের ব্যবসা। বাড়ী বিক্রি হলো তৎকালীন ডাকসাইটে উকিল বিলিগিরি আয়েঙ্গার মহাশয়ের কাছে। বিলিগিরি মহাশয় বাড়ীর নাম পাল্টে রাখলেন Castle Kernan, তাঁর বিশেষ বন্ধু এবং মাদ্রাস্ হাই কোর্টের বিখ্যাত বিচারক জাস্টিস কার্নানের স্মরণে। এখানে একসময়ে আশ্রয়

পেয়েছে, গরীব এবং পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা। তারই সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন আমাদের স্বামীজী, তার শিকাগো যাত্রা থেকে ফেরার পথে। তার পরেই রামকৃষ্ণ মঠ এই বাড়ীর দায়িত্ব নেয় এবং নাম পাল্টায় আবার, এবার বিবেকানন্দ হাউস। তাই তো মেরিনা বীচের সামনেই গর্বের সাথে আমরা দাঁড়িয়ে দেখি আমাদের মহামানব স্বামীজিকে এক সুন্দর মূর্তি রূপে, সেই মূর্তির শোভা দেখতে নির্বিশেষে তামিল, বাঙালি এবং অন্যান্য নানান রাজ্যের ভ্রমণার্থীরা জড়ো হন। বাঙালি হিসেবে গর্ববোধ হয়। স্বামী বিবেকানন্দের সেই মিউজিয়ামে বহু মানুষ শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে মন শান্ত করতে আসেন।

বাংলার দক্ষিণেশ্বরের আদলে গড়ে ওঠা আমাদের কালীবাড়ি শোভা পাচ্ছে চেন্নাইয়ের ওয়েস্ট মাম্বালমের বুকে। সেখানেও বাঙালি পুরোহিতের কাছে নির্বিশেষে তামিল বাঙালি সকলেই পুজো দিয়ে দেবীর কাছে তাদের মনস্কামনা পূরণের আবেদন জানান। চেন্নাইতে আরেকটি সুন্দর স্থান হল ময়লাপুরে রামকৃষ্ণ মঠ। সেখানেও নানান ভাষাভাষীর মানুষেরা জড় হয়ে একসাথে ভগবানের উদ্দেশ্যে নাম গান করেন স্নিগ্ধ পরিবেশে। রামকৃষ্ণ মঠের শোভা বাড়াতেও বহু বাঙালি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, বাঙালি সন্ন্যাসীরা রয়েছেন বিশিষ্ট পদে কর্মরত। বহু মানুষের ভিড়ের স্থান এই রামকৃষ্ণ মঠ। বাঙালির গর্ব শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। বহু ভাষাভাষীর মিলনস্থল এই রামকৃষ্ণ মঠ।

তাই এই দ্রাবিড়েও বাংলার বাইরে দক্ষিণ ভারতে চেন্নাইতে আমরা বুদ্ধিজীবী প্রবাসী বাঙালিরা দুঃসহ স্পর্ধায় মাথা তুলে দৃঢ়তার সাথে, জোরালো গলার আওয়াজএ, আত্মবিশ্বাস নিয়ে রয়েছি দাপটের সাথে।

আমি কলকাতায় বড় হয়েছি। আমি বরানগর রাজকুমারী বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছি, মহারানী কাশীশ্বরী কলেজ থেকে ট্যুরিজম এন্ড ট্রাভেল ম্যানেজমেন্ট এ অনার্স নিয়ে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন করেছি। ছোট থেকেই অনেক আঁকার ডিগ্রিও করেছিলাম, লেখালেখিও টুকিটাকি করতাম। কিছু লেখা স্কুলের ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হতো। বিয়ের পরে সংসারের চাপে যেমন বেশিরভাগ মহিলারাই নিজের গুণগুলোকে চাপা দিয়ে ফেলে, সেরকম আমারও হয়েছিল কাগজের পাতায় লিখতাম কোথায় তারপরে হারিয়ে যেত সে পাতাগুলো আর খুঁজে পেতাম না। দক্ষিণের দর্পণ সাহিত্য পত্রিকার মাধ্যমে লেখা প্রকাশিত হবার একটা নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের আশায় আবার লেখা শুরু করলাম। আরো অনেক লেখার ইচ্ছে রইলো মনে।

একটি সাদামাটা বিয়ের গল্প (শ্রুতি নাটক)

ডঃ তিমির ভট্টাচার্য্য

(চরিত্রঃ রমেশবাবু- পাত্রের বাবা, তপন- পাত্রীর দাদা, অলকা- তপনের স্ত্রী, অপর্ণা- পাত্রী, রঞ্জন- অপর্ণার প্রেমিক)

রমেশবাবুঃ আচ্ছা এবার আমরা উঠি। অনেকদূর যেতে হবে। তাহলে ঐ কথাই রইল - আগামী বৈশাখ মাসের ১২ তারিখ আপনার বোনের সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে।

তপনঃ আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব।

রমেশবাবুঃ না না এর জন্য আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না। ধন্যবাদ দেবেন ওপরওলাকে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ মানুষের জীবনের এই তিন বিশেষ ঘটনা সম্পূর্ণভাবে ওপরওয়ালার ইচ্ছে অনুযায়ীই হয়। এতে আপনার বা আমার কারুর কোন হাত নেই।

তপনঃ ঠিক বলেছেন। একদম ঠিক কথা বলেছেন।

রমেশবাবুঃ দেখুন ভাই তপন। আপনার মা মরা বোন। আপনার কাছে সে মানুষ। আমরা তাই আপনার কাছ থেকে কোন নগদ চাইছি না। আপনার বোন আমাদের পছন্দ হয়েছে এইটাই শেষ কথা। আজকালকার দিনে বিয়েতে এত দেনা পাওনার কথা হয় আমার একদম পছন্দ হয়না।

তপনঃ আপনি সত্যি মহানুভব।

রমেশবাবুঃ আসলে কি জানেন। সবসময় সবকিছুতো শুধু আপনার কথায় হয় না। আপনার আত্মীয় পরিজন, স্ত্রী, পুত্র সবাইকে নিয়েইতো সংসার।

তপনঃ হ্যাঁ সে তো একশবার ঠিক।

রমেশঃ কাজেই আপনি যা চাইছেন তা আপনি সবসময় করতে পারবেন না।

তপনঃ তা ঠিক তা ঠিক।

রমেশঃ এই দেখুন না আজকে আমার বাড়ী থেকে বেরবার আগে আমার শালাবাবুর ফোন এলো। কি বলে জানেন?

তপনঃ কি?

রমেশঃ বলে কি, জামাইবাবু- মেয়ে দেখতে যাচ্ছেন যান কিন্তু গিয়ে বলবেন না যে আমাদের কোন দেনা পাওনা নেই। আপনার ছেলে তো সব কথা আমাকে আর ওর মাকে বলে। ওর ইচ্ছে ওকে মেয়ের বাড়ী থেকে একটা মোটর সাইকেল দিক।

তপনঃ মটোর সাইকেল!!

রমেশঃ আর বলবেন না। আবার তিনি মোটর সাইকেলের নামও বলে দিয়েছেন। কি যেন কি ফিল্ড বুলেট না কি যেন নাম।

তপনঃ এনফিল্ড বুলেট!! সে তো অনেক দাম!

রমেশঃ কি বলি বলুন। কত করে বোঝালাম। কেউ বুঝলো না। না ছেলের মামা, না ছেলের মা, না ছেলে নিজে।

তপনঃ এতো টাকা আমি কোথায় পাবো বলুন? আমিতো একজন অটো ড্রাইভার। অটো চালিয়ে সংসার চালাই। এত টাকা আমি কি করে জোগাড় করব?

রমেশঃ তাহলে তো সত্যিই খুব মুশকিল। ছেলের মামা আমাকে পরিস্কার বলে দিয়েছে যে কানের, গলার হাতের -যা দেবার সে তো লাগবেই তার সঙ্গে ঐ ফিল্ডের বুলেট গাড়ী। না হলে আমাকে রাজী হতে মানা করে দিয়েছে। আমি কি করব বলুন।

তপনঃ আমি হাতজোড় করে বলছি, এত টাকা আমার কাছে নেই। গয়না, গাড়ী, খাট, বিছানা, ড্রেসিং টেবিল এইসব কিনতে যে টাকা লাগবে তা জোগাড় করতে আমার ঘরবাড়ী, মায় অটোও বিক্রী করতে হবে। আপনারা দয়া করে আমার অবস্থাটা একটু বুঝুন।

রমেশঃ তাহলে তো আমিও খুব মুশকিলে পড়ে গেলাম। ভাই তপন আমার অবস্থাটাও একটু বুঝুন। আমি এখন কিছুতেই বাড়ী গিয়ে বলতে পারবোনা যে আমি সম্বন্ধ পাকা করে এসেছি কিন্তু ঐ এমফিল্ড না এনফিল্ড ঐ টা বাদ দিয়ে। যদি বলি তাহলে আমার যে কি অবস্থা হবে সে তো ভাই আপনি বুঝতে পারবেন না।

অলকাঃ রমেশবাবু, আপনি একদম চিন্তা করবেন না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যান। বাড়ী গিয়ে বলুন যে ওরা সব কিছু দিতে রাজী হয়েছে। হাতের, কানের, গলার, খাট, বিছানা, আলমারী আর ঐ বুলেট গাড়ীও।

রমেশঃ বাঁচালে মা তুমি আমায়। তুমি যখন বলছ তখন আমি নিশ্চিন্ত। ঠিক আছে তাহলে ঐ কথাই পাকা। বৈশাখ মাসের ১২ তারিখ। আমি এবার আসি।

অলকাঃ হ্যাঁ আসুন। সাবধানে যাবেন। (রমেশের প্রস্থান)

তপনঃ অলকা, তুই এটা কি করলি? আমাকে জিগ্যেস না করে তুই কথা দিয়ে দিলি? টাকা কোথায় পাবি? তুই কি চাইছিস অপর্ণার বিয়ে দিয়ে আমরা সবাই গাছতলায় গিয়ে বসি? কোথা থেকে পাবি তুই টাকা? তোর বাবার কি টাকার গাছ আছে?

অলকাঃ আমার বাবার টাকার গাছ না থাকলেও আমার বরের টাকার গাছ আছে। সকালবেলা টাকার গাছটা নিয়ে ভটভট করতে করতে বারিয়ে যায় আর রাত্তির বেলা যখন ফিরে আসে তখন সেই ভটভটি গাছে ভর্তি টাকা। হাঃ হাঃ।

তপনঃ গালে দুই থাপ্পর মারব। আমার সঙ্গে একদম ইয়ার্কি মারবি না। তুই আমার সর্বনাশ করতে চাইছিস। কথাতো ওনাকে দিয়ে দিলি যে সব দেবো - কানের, গলার, হাতের তার সঙ্গে বুলেট! ঐ বুলেট দিয়ে তোর কপাল ফুটো করে দিতে ইচ্ছে করছে। হারামি মেয়েছেলে।

অলকাঃ হারামি বলেইতো তোমাকে বিয়ে করেছি। ভালো মেয়ে হলে কি আর তোমায় বিয়ে করতাম।

তপনঃ ফের মুখে মুখে কথা। (থাপ্পড় মারে অলকাকে) তোর এই পাকামি স্বভাবের জন্যে কোনদিন তোকে আমি মেরেই ফেলব।

অলকাঃ তাই কর। আমাকে মেরেই ফেল। নিজের বোনের বিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই, আমার ওপর রাগ ফলাচ্ছে। আমার যদি একটা দাদা থাকত তাহলে আমার গায়ে হাত তোলা তোমায় দেখিয়ে দিত। (কাঁদতে থাকে)

অপর্ণাঃ বৌদি, বৌদি, তোমার চটিটা কোথায় গো?

অলকাঃ ঐ তো। আলমারির নীচে। কোথায় যাচ্ছো?

অপর্ণাঃ বৌদি - কিছু টাকা হবে তোমার কাছে? এ কি বৌদি তুমি কাঁদছ? কি হয়েছে? দাদা আবার তোমার গায়ে হাত তুলেছে? দাদা তুই আবার বৌদির গায়ে হাত তুলেছিস?

তপনঃ বেশ করেছি। ও কি করেছে জানিস?

অপর্ণাঃ কি করেছে যে তোকে বৌদির গায়ে হাত তুলতে হোলো।

তপনঃ ওকেই জিগ্যেস কর। আমার মাথা গরম হয়ে আছে। আমি বেরোচ্ছি। (তপন বেরিয়ে যায়)

অপর্ণাঃ বৌদি তুমি কি গো? তোমার গায়ে রোজ রোজ দাদা হাত তোলে আর তুমি সহ্য করে যাও। কি এমন অন্যায় করেছো তুমি?

অলকাঃ তোমার যেখানে বিয়ের কথা হচ্ছিল সেই ছেলের বাবা এসেছিলেন। উনি দেনা পাওনার কথা বলতে এসেছিলেন। গয়নাগাটির কথা বললেন তার সাথে একটা মোটর সাইকেল চাই বললেন। আমি বলেছি আমরা সব দেব।

অপর্ণাঃ গয়নাগাটি, মোটর সাইকেল সব?

অলকাঃ হ্যাঁ সব দেব বলে কথা দিয়েছি। আগামী বৈশাখ মাসের ১২ তারিখ তোমার বিয়ে।

অপর্ণাঃ বৌদি এটা তুমি সত্যিই খুব অন্যায় করেছো। দাদা এত টাকা কোথা থেকে জোগাড় করবে?

অলকাঃ দাদা জোগাড় করবে কেন? আমি জোগাড় করব।

অপর্ণাঃ তুমি? তুমি কোথা থেকে এতো টাকা জোগাড় করবে?

অলকাঃ কেন? আমার গয়নাগাঁটিগুলো বিক্রী করে দেবো। আমার মনে হয় আমার যা গয়নাগাঁটি আছে সেগুলো বিক্রী করলে তোমার বিয়ে নিশ্চয় হয়ে যাবে।

অপর্ণাঃ বৌদি তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি আমার বিয়ের জন্যে তোমার সব গয়নাগাঁটী বিক্রী করে দেবে? না না এ হয়না। এ আমি কিছুতেই মানতে পারবো না। এইভাবে আমি বিয়ে করব না।

অলকাঃ অপর্ণা শোনো। আমার গয়নাগুলো আমি তোমার বিয়ের জন্যেই রেখে দিয়েছিলাম। আমার গয়না নিয়ে আমি কি করব? আমাদের তো কোন ছেলেমেয়েও নেই যে তাদের বিয়েতে লাগবে। তুমি না কোরোনা। এইটা তুমি মেনে নাও অপর্ণা। এই কাজটা করতে পারলে আমি খুব খুশি হব।

অপর্ণাঃ বৌদি আমি কিছুতেই এইভাবে বিয়ে করতে রাজী নই। তোমার কাছে কিছু টাকা হবে বৌদি?

অলকাঃ কত টাকা?

অপর্ণাঃ যা দেবে। ১০০-২০০ যা পারবে দাও আমাকে প্লিজ। কবে ফেরত দিতে পারব জানিনা।

অলকাঃ এই নাও ২০০ টাকা। এবার বল কোথায় যাচ্ছ এই বিকেলবেলা?

অপর্ণাঃ রঞ্জনের কাছে। আমি আর বাড়ী ফিরছিনা বৌদি। তোমার গয়না বিক্রী না করে যাতে আমার বিয়ে হয় তার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।

অলকাঃ কি বলছ তুমি? তোমার দাদা জানতে পারলে দক্ষযজ্ঞ বাঁধিয়ে দেবে। এরকম কোরোনা।

অপর্ণাঃ আমি চললাম বৌদি। একটা কথা তোমায় বলে যেতে চাই রঞ্জন যতই গরীব হোক, যত অভাব ওদের থাকুক। আমি যত অন্যায়ই করিনা কেন, রঞ্জন কোনদিন আমার গায়ে হাত তুলবেনা।

আমি চললাম। রাগ কোরোনা বৌদি।

(অপর্ণা বেড়িয়ে যায়)

কিছুক্ষণ বাদে

অপর্ণাঃ কটা বাজে?

রঞ্জনঃ কেন ৫টা। তুমি আমার ঘড়ি দেখো। ঠিক ৫টা।

অপর্ণাঃ এই ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেওয়ার ইয়ারকিটা আর কতদিন চলবে? রাস্তার মধ্যে আধ ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছি। লোকে আজে বাজে remarks pass করছে। একজন তো বলল আর দাঁড়িয়ে থেকোনা সে আজকে আসবে না।

রঞ্জনঃ ব্যাটাকে পেলে দাঁত ভেঙ্গে দেবো এক ঘুসি মেরে।

অপর্ণাঃ থাক তোমাকে আর বীরত্ব দেখাতে হবে না। এখন চলো মোনালিসা কেবিনে। চা আর ফিসফ্রাই খাবো।

রঞ্জনঃ তুমি খাওয়াবেতো? আমার পকেট গড়ের মাঠ।

অপর্ণাঃ হ্যাঁ আমিই খাওয়াবো। তোমার পকেট আবার কবে ভর্তি থাকে।

রঞ্জনঃ মাসের ৫ তারিখ। যেদিন টিউশনির ৫০০ টাকা পাই। ৬ তারিখ থেকে পকেটে ২টাকার বেশী থাকে না। কি ব্যাপার? আজ কি দাদার পকেট মেরেছো?

অপর্ণাঃ চলো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। চা খেতে খেতে সব বলব।

(দুজনে মোনালিসা কেবিনে ঢোকে)

রঞ্জনঃ দুটো ফিসফ্রাই দুটো চা। দুটোই যেন গরম হয়। অপর্ণা তোমাকে আজকে দারুন লাগছে। আর সেন্টের গন্ধটা অপূর্ব।

অপর্ণাঃ আবার ইয়ার্কি শুরু করলে। আজ আমি কোন সেন্ট মাখিনি রঞ্জন।

রঞ্জনঃ তাই? সত্যি তুমি সেন্ট মাখোনি? তাহলে তোমার গায়ের গন্ধটাই খুব মিষ্টি। আসলে কি জানো, তুমি যদি কাউকে খুব ভালোবাসো তাহলে সে কাছে এলেই বাতাসটা একটা মিষ্টি গন্ধে ভরে যায়। এই বলোনা আমি তোমার কাছে এলে তুমি পাওনা একটা মিষ্টি গন্ধ?

অপর্ণাঃ পাই। তোমার ঘামের গন্ধ (হাসে) তবে তুমি কাছে এলে আমার বুকের মধ্যে একটা টুনটুনি পাখি যেন দৌড়তে থাকে আর মিষ্টি সুরে গান গায়।

রঞ্জনঃ তার মানে তুমিও আমাকে খুব ভালোবাসো তাই আমি কাছে এলে তোমার বুকে টুনটুনি পাখি দৌড়তে থাকে।

অপর্ণাঃ রঞ্জন তুমি আমার গায়ে কোনদিন হাত তুলবে না তো?

রঞ্জনঃ কি বলছ তুমি পাগলের মত? তোমার গায়ে আমি হাত তুলবো মানে তোমাকে আমি মারব? তার আগে আমার হাত যেন পঙ্গু হয়ে যায়।

অপর্ণাঃ কথা দিচ্ছ? আমি যতই অন্যায় করি কোনদিন তুমি আমার গায়ে হাত তুলবে না?

রঞ্জনঃ এটা কি কথা দেওয়ার বিষয়। আমার শিক্ষা, দীক্ষা, নীতি, নৈতিকতা সব যদি বিসর্জন দিই তাও তোমার গায়ে আমি কোনদিন হাত তুলতে পারবো না।

অপর্ণাঃ রঞ্জন। আমি খুব টেনশনের মধ্যে আছি।

রঞ্জনঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি বলছিলে অনেক কথা আছে। কি কথা বলো। তুমি টেনশনে আছো শুনে আমার টেনশন হতে শুরু হয়েছে।

অপর্ণাঃ গত সপ্তাহে যারা আমাকে দেখতে এসেছিল তারা আজকে আবার এসেছিলো আমাদের বাড়ীতে। বলে গেল আমাকে তাদের পছন্দ হয়েছে।

রঞ্জনঃ তোমাকে পছন্দ হবে না? তোমাকে যে দেখবে তারই পছন্দ হবে। পছন্দ না করে পারবেই না।

অপর্ণাঃ আরে বাবা পছন্দ করে বিয়ের ডেট ফাইনাল করে গেছে। আগামী বৈশাখ মাসের ১২ তারিখ বিয়ে।

রঞ্জনঃ ও.....এই জন্যে তোমার টেনশন? বলে দাও তুমি এখন বিয়ে করবে না।

অপর্ণাঃ আমি বাড়ীতে বলে দিয়েছি আমি এই বিয়ে করব না।

রঞ্জনঃ কাকে বলেছো? তোমার ঐ রাগী দাদাকে?

অপর্ণাঃ দাদাকে বলার সাহস আমার নেই। আমি বৌদিকে বলেছি আমি এই বিয়ে করছি না। আর আমি এও বলেছি যে আর আমি বাড়ী ফিরছি না।

রঞ্জনঃ সে কি? বাড়ী ফিরবে না তো কোথায় থাকবে রাত্তিরে?

অপর্ণাঃ রঞ্জন আমি বাড়ীতে এই বলে বেড়িয়েছি যে আমি রঞ্জনের কাছে যাচ্ছি। ওকে বিয়ে করে ওদের বাড়ীতেই থাকব আজ থেকে।

রঞ্জনঃ এইসব তুমি কি বলছ অপর্ণা! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এখন আমি কেমন করে বিয়ে করব? তুমি তো আমার অবস্থা জানো। আমি এখন 2nd year এ পড়ি। আমার ওপরে দুই দিদি, তাদের বিয়ে হয়নি। আমার পরে আর একটা বোন সে পড়ে ক্লাস নাইনে। বাবা অসুস্থ। এই অবস্থায় আমার কি বিয়ে করা সম্ভব?

অপর্ণাঃ তুমি আমার অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করো। আজকে যদি বাড়ী ফিরে যাই তাহলে সেই অজানা অচেনা ছেলেটাকে আমাকে বিয়ে করতে হবে।

রঞ্জনঃ তুমি দাদাকে বলে দাও তুমি এখন বিয়ে করবে না।

অপর্ণাঃ দাদাকেতো চেনোনা। আমি যদি বলি এখন বিয়ে করবনা তাহলে আমাকে মারতে মারতে বাড়ী থেকে বের করে দেবে।

রঞ্জনঃ অত সোজা! তোমাকে বাড়ী থেকে বের করে দেবে? তোমার গায়ে হাত তুলবে?

অপর্ণাঃ দাদাকে তুমি চেনোনা। দাদা প্রায় রোজ বৌদিকে মারে। আমার তো অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। বৌদিরও তাই। সেই জন্যে বৌদি মার খেয়েও বাড়ীতে পড়ে থাকে।

রঞ্জনঃ কিন্তু অপর্ণা এখন এই আজকে আমি তোমাকে কিভাবে বিয়ে করব?

অপর্ণাঃ মন্দিরে যাব। তুমি আমাকে সিঁদুর পরিয়ে দেবে।

রঞ্জনঃ তারপর তো তোমাকে নিয়ে বাড়ীতে উঠতে হবে। তুমিতো জানো আমাদের একটাই ঘর। সেই ঘরে আমরা চার ভাইবোন আর মা বাবা থাকি। সেখানে কোথায় নিয়ে তোমায় তুলব? না না এ হয়না। এ হয় না।

অপর্ণাঃ রঞ্জন তুমি বুঝতে পারছো যদি তুমি আমাকে আজকে বিয়ে না করো তাহলে আমাকে ঐ লোকটাকে বিয়ে করতে হবে। আমি অন্য লোকের বৌ হয়ে যাব।

রঞ্জনঃ কিন্তু আমি কি করতে পারি বল?

অপর্ণাঃ কি আবার করবে? বিয়ে করবে।

রঞ্জনঃ অসম্ভব। এ অসম্ভব অপর্ণা। আমাদের নিজেদের থাকার জায়গা নেই। খাওয়ার সংস্থান নেই। এর মধ্যে বিয়ে করে তোমাকে আমি বাড়ীতে তুলব?

অপর্ণাঃ তাহলে এই তোমার শেষ কথা?

রঞ্জনঃ তুমি আমার অবস্থাটা একটু বোঝার চেষ্টা করো।

অপর্ণাঃ আমি সব বুঝেছি। তোমার মুরদ আমার জানা হয়ে গেছে। ফিসফ্রাইটা তুমি খেয়ে নিও। আমি চললাম।

রঞ্জনঃ দাঁড়াও। আমি তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসছি।

অপর্ণাঃ থাক আর দয়া দেখাতে হবে না। এই রইল টাকা। ফিসফ্রাই আর চায়ের দামটা মিটিয়ে দিও।

(অপর্ণা বেড়িয়ে যায়)

(বেল বাজে। অপর্ণা বাড়ী ফেরে)

অলকাঃ একি অপর্ণা তুমি! ফিরে এলে?

অপর্ণাঃ রঞ্জন আমায় ফিরিয়ে দিলো বৌদি। ও বলল এখন বিয়ে করতে পারবে না। ওরা একটা ঘরে থাকে আমাকে কোথায় নিয়ে তুলবে?

অলকাঃ কেঁদোনা অপর্ণা। সত্যিইতো রঞ্জন তো চাকরী করেনা তার ওপর মাথার ওপর দুই দিদি এখন কি করে বিয়ে করে বল?

অপর্ণাঃ রঞ্জন খুব ভালো ছেলে বোউদি। আমাকে ও খুব ভালোবাসে। আমি কাছে গেলে ও মিষ্টি একটা গন্ধ পায়।ও কথা দিয়েছিল আমার গায়ে কোনদিন হাত তুলবে না। আমি যতই অন্যায় করি ও কোনদিন আমায় মারবে না। বৌদি আমার সঙ্গে যার বিয়ে হবে সে আমায় মারবে না তো? যদি মারে, যদি আমার গায়ে হাত তোলে, তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে মার খেয়েও কি করে হাসি মুখে থাকতে হয়। আমার বুকে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বৌদি। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কথা দাও আমাকে তুমি শিখিয়ে দেবে মার খেয়েও কিভাবে হাসি মুখে থাকতে হয়। শিখিয়ে দেবেতো বৌদি, শিখিয়ে দেবেতো। কথা দাও শিখিয়ে দেবে। .....

ফুলের গন্ধে যে কবি হাহাকার পেয়েছিলেন

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

সমর সেনের কবিতা, সিগনেট প্রেস। প্রচ্ছদ সত্যজিৎ রায়।

হাওড়ার এক ধূ ধূ দুপুরে,কাকার টেবিলে পড়েছিল বইটা। হালকা বিবর্ণ হলদে সবুজ জমির ওপর শুকনো রক্তের রঙে পুরনো অক্ষরের ছাঁদে লেখা সমর সেনের কবিতা। পাতা উল্টে প্রথম পাতায় পেয়েছিলুম—

'স্তব্ধরাত্রে কেন তুমি বাইরে যাও
আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকার,
বিশাল অন্ধকারে শুধু একটি তারা কাঁপে
হাওয়ায় কাঁপে শুধু একটি তারা'।

স্বীকার করি, থমকে গিয়েছিলুম। ছন্দ চোখে ধরা দিচ্ছে না। অথচ কবিতাটা আমায় আটকে রাখছে। পরের পাতায়—

'ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি।
বাতাসে ফুলের গন্ধ;
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কিসের হাহাকার'।

একই বাক্য পরপর দুবার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমবার সেমিকোলন পরের বার কমা। যতি চিহ্ন শুধু ছন্দ সৃষ্টি করছে না, কবিতার ভাষাকে পাঠকের কাছে অচেনা জগৎ নিয়ে আসছে। তার কয়েক পাতা পরেই...

'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
রাত্রে ধুসর সমুদ্রে হাহাকার আসে,
ধুসর আকাশ
আমার নিদ্রাহীন অন্ধকারে শুধু যেন শুনি
দুপুরের খর-সূর্যে ক্লান্ত মহিষের পদক্ষেপ
ইস্পাতের কঠিন পথে।

শেষ তিনটি লাইন আমাকে আধুনিক নগর জীবনের মধ্যবিত্ত ব্যর্থ একাকীত্বর সামনে বসিয়ে দিয়েছিল। আমার শহুরে মধ্যবিত্ত চেতনাকে এখনো তাড়া করে—'খর সূর্যে ক্লান্ত মহিষের পদক্ষেপ/ইস্পাতের কঠিন পথে'।

তার ওপর রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইনকে সরাসরিই নিজের কবিতায় নিয়ে আসা? এইভাবে বিখ্যাত এক কবিতার লাইন একদম অন্য চিন্তায় ব্যবহার সেই প্রথম, অন্তত আমার কাছে। এ কবিতা গড়গড় করে পড়ার জন্যে নয়। কিন্তু 'দুরুহ' বলে ফেলে রাখা যাবে না। ঠিক প্রেমের কবিতা মনে হয়নি। যেন একটা চাপা যন্ত্রণা, একাকীত্ব। আর সেই একা থাকার নৈশব্দপুর্ন অন্ধকারের কবিতা। আপাত আবেগহীন জীবনের এক গভীর হতাশা আর নিঃসঙ্গতার,অনুভূতির কবিতা।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে,তখন আমি নিয়মিত কবিতা পড়তে শুরু করছি। তার রস তার রহস্য, তার আলাদা ভাষাতে আগ্রহ জন্মাতে শুরু করছে। কম বয়সের সবজান্তা ভাবও অল্প এসেছে। সেই সবজান্তা এঁচোড়ে পাকামিকে আটকে দিয়েছিল এই শীর্ণ ১৪২ পাতার সিগনেট প্রেসের বই। আমি মোহগ্রস্থের মত ঢুকতে শুরু করেছিলুম। শেষহীন নির্জন দুপুর, অনেক বিক্ষুব্দ রাত, এই বই আমায় টেনে রেখেছে...

... কয়েক পাতা পেরুতেই কবির প্রেমের কবিতার মধ্যে ঢুকতে শুরু করি।

'মাঝে মাঝে তোমার চোখে দেখেছি
বাসনার বিষন্ন দুঃস্বপ্ন
তার অদৃশ্য অন্ধকার প্রতি মুহুর্তে
আমার রক্তে হানা দেয়'।....

কিংবা

'বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে
তোমাকে পাবার বাসনা।
আর মাঝে মাঝে আকাশে হলুদ রঙের অদ্ভুত চাঁদ ওঠে,' ....

কবিতা গভীর প্রেমের। সে প্রেম প্রচন্ড দেহজ এবং সম্পুর্ন রোমান্টিকতাহীন। নেই প্রেমের আনন্দ, নেই শিহরণ, ব্যাকুল মনোরম রঙিন প্রেমের স্থান নেই এই কবিতায়। এমনকি বিরহ কোনমতেই আবেগমাখা নয়। মধুরতো নয়ই।। বাংলাপ্রেমের কবিতায় যে আবেগ, উচ্ছাস প্রগাঢ় মমতা থাকে, তার সচেতন পরিহার। ভাষাও যেন এমন প্রেমের সাথে মিল খাওয়ানো। কাটা কাটা শব্দ দিয়ে তৈরি লাইন।

'বাসনার বিষণ্ন দুঃস্বপ্ন'—এ ধরণের বাক্যবন্ধ বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা বিষ্ণু দের কবিতায় দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলে আশা করাও অন্যায়। আর 'বিষাক্ত সাপের মতো পাবার বাসনা'—একে ফ্রয়েডিয় বলা যাবে কি? ফ্রয়েডের সেক্সচুয়ালিটি এর থেকে অনেক আপাত রোম্যান্টিক। আমি বুঝতে পারছিলুম এক অজানা জগতের ব্ল্যাক হোলের মাধ্যাকর্ষণে আটকা পড়ে গেছি।

সমর সেন কে তখন মুলত তিরিশ-চল্লিশের নতুন মধ্যবিত্ত সমাজের প্রেমের কবি ভাবতে শুরু করছি। ফ্রয়েডিয় যৌন অতৃপ্তির কবি। তখন আমার চোখ পড়েছিল একদম ভিন্ন কবিতায়। কয়েক পাতা পরেই। বোমা ফাটার মত---

'তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো!
কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে,
হে ক্লান্ত উর্বশী ,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্নমুখে
উর্বর মেয়েরা আসেঃ'..... (উর্বশী)

এ কবিতা যখন পড়ছি,তখন আমার 'নহ মাতা নহ কন্যা'-পড়া হয়ে গেছে । এবং ধাক্কাটা সামলাতে বেশ সময় লেগেছিল।

কয়েক পাতা পরে...

'ম্লান হয়ে এল রুমালে
ইভনিং ইন-প্যারিসের গন্ধ—
হে শহর হে ধুসর শহর
কালীঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে শহর হে ধুসর শহর
লুব্ধ লোকের ভিড়ে যখন তুমি নাচো
দশ টাকায় কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্বশী
তখন শাড়ির আর তাড়ির উল্লাসে
অমৃতের পুত্রের বুকে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা
আর দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ ওঠে
হে শহর হে ধূসর শহর।

'আমি নহি পুরুরবা হে উর্বশী'
মোটরে আর বারে
আর রবিবারে ডায়মন্ডহারবারে
কয়েক টাকার কয়েক প্রহরের আমার প্রেম,'...।

আগেই বলেছি এই ভাবে বিখ্যাত কবির অতি বিখ্যাত কবিতার লাইনকে অন্য অর্থে ব্যবহার আগে আমার সামনে আসেনি। তখনো সেই ২০-২২ বছর বয়সে ইয়েটস, পাউন্ড বা এলিয়ট পড়া হয়নি। এডমন্ড স্পেন্সারের ১৬শ শতাব্দির 'পারথামিলন' কবিতার বিখ্যাত লাইন, 'সুইট টেমস রান সফটলি, টিল আই এন্ড মাই সং'- এলিয়ট তাঁর ওয়েস্টল্যান্ড কবিতায় এই লাইন যেভাবে ব্যবহার করেছিলেন, তা আমার জানা ছিল না। তার সাথে এই ব্যঙ্গ, তিরস্কার। জ্বলন্ত চাঁদ কি আমাদের সমাজ? শেষ হতে শুরু হওয়া মধ্যবিত্ত মুল্যবোধের দিকে তাকিয়ে আছে

? ওই ছন্দ? বারবার 'আর' এর মতো শব্দ দিয়ে কবিতা হয়? তার ওপর 'ডায়মন্ডহারবারে'-র মতো শব্দ কবিতার অন্তে!!

আশাভঙ্গের আকর্ষন আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল।। রবীন্দ্রনাথকে এমন করে একদম অন্যভাবে ব্যবহার! আবার ঠিক ডি এল রায় বা শনিবারের চিঠি মার্কা সস্তা কাদা ছোঁড়া নয়। একি কবিতা? এ ছন্দ আমার পড়ার বাইরে। কখন একদম ছন্দহীন, কখন অক্ষরবৃত্তর সাবেকি পয়ার।

আমি যখন এই ১৪২ পাতার বইয়ের প্রথম চল্লিশ পাতার শ্যাওলা আর গভীর জলের ঝাঁজিতে পা আটকে ডুবে আছি, আমার বাবা মৃদু হেসে বলেছিলেন 'জানিস কি এই প্রথম পর্বের কবিতা আঠারো থেকে একুশ বছর বয়সের মধ্যে লেখা'? আর কবিতা লেখা ছেড়েই দিয়েছিলেন তিরিশ বছর বয়সে।'

বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল।

সেই তখন থেকে সমর সেন নামের প্রবাদ বা মিথকে জানার চেষ্টা, তাঁর নানা লেখা, ওনার ওপরে লেখার মধ্যে দিয়ে আমার জার্নি শুরু হয়।

কলেজি পড়ায় তাঁর রেকর্ড নম্বর। ইংরেজি বি.এ, এম.এ দুটোতেই রেকর্ড নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হয়েছিলেন। সতেরো বছর বয়সে বুদ্ধদেব বসুর বন্দীর বন্দনা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। সেই অনুবাদের ইংরেজি ভাষা, তার ছন্দর ওপর দখল দেখে বুদ্ধদেব অবাক হয়েছিলেন। রাধারমণ মিত্র, খুশবন্ত সিং, নীরদ চৌধুরী বারবার তাঁর ইংরেজির স্টাইল তুলনাহীন স্বীকার করেছেন। তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রেসিডেন্সিতে তাঁর সহপাঠী দেবী ভট্টাচার্য্য দুটো ঘটনার কথা লিখেছিলেন-কলেজের আড্ডার সময় এক বন্ধু জিজ্ঞেস করেছিল,

'এটাকি সত্যি, গীতাঞ্জলীর অনুবাদ ইয়েটস করেছেন, রবীন্দ্রনাথ নয়।'

সমর সেন নাকি বলেছিলেন, 'একথা যারা বলে তারা ইয়েটস পড়েনি। পড়লেই বুঝতে পারতো, ইয়েটসের ভাষার স্টাইল একদম আলাদা। আর একবার মার্চেন্ট অফ ভেনিস পড়াবার সময়, অক্সফোর্ড ফেরত সাহেব প্রফেসর ক্লাসে ক্রিটিকাল এ্যানালিসিস করতে বললে, উনি নাকি বলেছিলেন, 'পোর্শিয়া, ছদ্মবেশে ডিফেন্স ল'ইয়ার হয়ে আদালতে গেল। হঠাৎ নাটকের শেষে নিজেই বিচারপতি কিকরে হয়ে গেল? এটা সেক্সপীয়র রেসিস্ট ইহুদীবিরোধী খ্রিষ্টান দর্শকদের খুশী করবার জন্যে করেছিলেন, ফলে নাটকের ক্ষতি হয়েছে।'

তাঁর ঠার্কুদা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রবাদপ্রতিম মনীষী দীনেশচন্দ্র সেন। বাবা ইতিহাসের নামকরা অধ্যাপক অরুণ সেন। অরুন সেন নাকি ঠাট্টা করে ছাত্রদের কাছে বলতেন 'আই অ্যাম এ মেডিকোর সন অফ আ গ্রেট প্রফেসর রাইটার অ্যান্ড মেডিকোর ফাদার অফ এ গ্রেট পোয়েট-স্কলার'। এম এ র রেজাল্ট বেরুনোর পর ঠাকুর্দা বড়লোক ঘরের পাত্রী এনেছিলেন, যারা পাত্রকে বিয়ের পর বিলেত পাঠাবে বলেছিল। শুনে সমর সেন বলেছিলেন, 'নাঃ, পুরুষাঙ্গ বাঁধা দিয়ে বিলেত যাব না।'

জন্মেছিলেন ১৯১৬ সালে। উত্তর কলকাতার বিশ্বকোষ লেনে,কাঁটাপুকুরে। আদি ভিটে বরিশাল হলেও, নিজেকে খাঁটি উত্তর কলকাত্তাইয়া বলতেন। কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন আই.এ পড়াকালীন, ষোল বছর বয়সে। বুদ্ধদেব বসুর মত বিদগ্ধ অধ্যাপক যখন কবিতা পত্রিকা বার করলেন ১৯৩৫ সালে, তখন উনিশ বছরের সমর সেনকে সহঃসম্পাদক হবার জন্যে ডেকেছিলেন। ।

সেই উনিশ বছর বয়সে 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় লেখেন—

'কেতকীর গন্ধে দুরন্ত
এই অন্ধকার আমাকে কি করে ছোঁবে?
পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,

আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের সুদূর, নিঃসঙ'।.

এই ছন্দ, এই শব্দ-বন্ধনী, ক্রিয়াপদহীন বাক্য বাংলা কবিতা আগে দেখেনি। তাঁর কবিতার এই কাটা কাটা বাক্যর প্রবল নীরব উপস্থিতি প্রথম বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বুদ্ধদেবকে লেখেন--'সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রুঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা ট্যাঁকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে'।

রবীন্দ্রনাথের এই কথা আমাকে বিশ্মিত করে। যে রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে এবং জীবনান্দকে কবি হিসেবে স্বীকার করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ব্যঙ্গ করে বলেওছিলেন 'কেউ যদি বিষ্ণু দের কবিতার মানে বুঝিয়ে দিতে পারে তাকে একটাকা দেবেন।' সেই রবীন্দ্রনাথ এই কাটা, ক্রিয়াপদহীন বাক্যছন্দকে কিভাবে স্বীকার করেছিলেন আমি জানিনা। পরে অবশ্য যখন 'আধুনিক বাংলা কবিতা' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হোল,সমর সেন সেখানে স্থান পাননি।

এর পরের বছরে, ১৯৩৬ সালে লন্ডনের Times literary supplement এ এডোয়ার্ড টমসন তাঁর কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন ও তাঁর প্রসঙ্গে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। সেই সময়ে সমর সেন,স্টেটসম্যান,অমৃতবাজার পত্রিকাতে বিষ্ণু দে,বুদ্ধদেব বসুর কবিতার সমালোচনা নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। সে সময় বয়স তাঁর উনিশ পেরুচ্ছে।

তিনি আচমকা এমন নতুন ধারা এনেছিলেন যে ছাপার অক্ষরে বেরুবার সাথে সাথে শনিবারের চিঠির আক্রমন পেয়েছেন। আবার ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত বনেদি বিদগ্ধ সমালোচক থেকে শুরু করে বিষ্ণু দে, সুধীন দত্ত তাঁর কবিতার আলোচনা নানা পত্র পত্রিকায় করতে শুরু করেন। তিনি বামপন্থী শিবিরের কাছের মানুষ হিসেবে নিজেকে ব্যক্ত করতেও শুরু করেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই,'কয়েকটি কবিতা' বেরোয় ১৯৩৭ সালে। উৎসর্গ করেন মুজফফর আহমেদকে। একটু অবাক লাগে। কারন মুজফফর আহমেদকে তখন, ঘনিষ্ঠ কমিউনিস্ট মহলের বাইরে খুব কম লোক চিনতেন। বাকি মানুষের কাছে নজরুলের বন্ধু(লাঙ্গল পত্রিকার সহঃসম্পাদক) হিসেবে গুটি কয়েক মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন। এই সময় সমর সেন খোলাখুলি রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লেখেন "আপনি সুদুরেই থেকে যাবেন। আমরা আপনার কাছে যেতে পারবনা"।

তিরিশের কোলকাতা। এই এক সময় যখন বাংলা কবিতা নতুন ভাষা খুঁজছে। নাগরিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভাষা। জোতজমির সঙ্গে সম্পর্কহীন, তিরিশের মন্দা আক্রান্ত,বাবুয়ানি হারানো মধ্যবিত্তের ভাষা।

পৃথিবীর সব ভাষার কবিতার ইতিহাস, এইরকম নতুন রাস্তার মোড় খুঁজেছে। ফরাসী সিম্বলিজম পুরনোকে ফেলে এগিয়ে গেছে। মাইকেল, ঈশর গুপ্তকে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ মাইকেলি মহাকাব্যের দিকে ফিরেও তাকাননি। একইভাবে ব্রিটিশ কবিতা প্রথম যুদ্ধের সময় থেকে ভিক্টোরিয়ান রসেটি, সুইনবার্নকে ঝেড়ে ফেলে ইয়েটস, এজরা পাউন্ড, এলিয়টের সাহিত্যে জীবনের আয়না খুঁজে পেতে শুরু করেছিল। তিরিশের নতুন নাগরিক বাংলাকেও নতুন কবিতার ভাষা খুঁজতে হয়েছে। তিরিশের মন্দা, ত্রিশের দশকের বেকারিত্ব, জমির সঙ্গে সম্পর্কহীন শহুরে মধ্যবিত্তের সমাজকে নতুন ভাষা নতুন চিন্তা তৈরি করতে বাধ্য করছিল।। এই ভাবে পালটে যাওয়া নগর কোলকাতা তার কবিকে খুঁজছিল। আর ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে বেরুনোর চেষ্টা। সুধীন দত্তের ভাষায় 'we got to be different from Bolpur'। সামনে উপনিষদ, রোম্যান্টিসিজম, ভিক্টোরিয়ান মুল্যবোধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ। সেই

'শান্তিনিকেতনের প্রাচীন বনস্পতির' ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন।

কবি হিসেবে কখনই সমর সেন পপুলার হননি। এই ঘরানার কবিতায়, আবেগআক্রান্ত বাংলায় পপুলার হওয়া যায়না। কিন্তু তন্নিষ্ঠ-সিরিয়াস গভীর পাঠক মহলে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন ১৯৩৮ সালের কাছাকাছি সময়ে। এবং টী এস এলিয়ট।

সমর সেনকে নিয়ে কোন আলোচনা, এলিয়টকে বাদ দিয়ে করা যাবে না। সমর সেন, আবেগকে সংযমের কড়া দড়িতে বেঁধে কবিতার জগতে তুলে এনেছেন। সেই সংযম তাঁকে এলিয়টের বিখ্যাত উক্তি "Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion..., এই চিন্তার .কাছে নিয়ে গেছিল। বুদ্ধদেব বসুকে চিঠিতে লিখেছেন "আমাদের মত বখাটে জেনারেশনের কবি হলেন এলিয়ট।' বিবিসি তে এলিয়টের আবৃত্তির খবর পেয়ে উত্তেজিত হয়ে বিষ্ণু দে কে ফোন করতেন। অনেক কবিতায় এলিয়টের ছায়া এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। তাঁর 'হে শহর,ধূসর শহর' পড়ে এলিয়টের 'city! o old city!' মনে পড়ে। অথবা 'to luncheon at the cannon street Hotel/Followed by a weekend at the metro pole তাঁর কবিতার 'মোটরে আর বারে/আর রবিবারে ডায়মন্ডহারবারে'...। যেভাবে ব্রিটিশ মধ্যবিত্তের মুখোশ নিয়ে এলিয়ট ব্যঙ্গ করেছেন, যে ভাষা ব্যবহার করেছেন বা বলা যেতে পারে ভাষাকে,ছন্দকে তৈরি করেছেন—সমর সেন সেটাকে তিরিশের কোলকাতার মধ্যবিত্তের জীবনের আবেগের ছাল ছাড়াতে আদর্শ মনে করেছিলেন। পরবর্তীকালে স্বীকারও করেছেন। অন্ত্যমিল মাখা অনুপ্রাশের কলখোলা আবেগের তোড়ের ঢেউ আটকাতে ওই এলিয়টী স্টাইল তাঁর কাছে অনেক নিবিড় ছিল।

মিথকে বুঝতে আমি এবং আমার বন্ধুরা আবার ফিরে গিয়েছিলুম ওই কঠিন নাগরিক কবিতায়।

'রিকশার উপরে ক্লান্ত চীনে গনিকা যখন চোখ বোজে
সূর্যের অলস উত্তাপে,
তখন দিনরাত্রির নিঃশব্দতা
তোমার রক্তে আসে
নীল নদীর মতো'।

এরপরে...

'সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গনিকারা কোলাহল করে,
খিদিপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি;
মাঝে মাঝে ক্লান্তভাবে কি যেন ভাবি-
হে প্রেমের দেবতা,ঘুম যে আসে না,সিগারেট টানি;
আর শহরের রাস্তায় কখনো প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি;
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো... '

এই পর্যায়ের আর এক কবিতা—

'তোমার ক্লান্ত উরুতে একদিন এসেছিল
কামনার বিশাল ইশারা!
ট্যাঁকেতে টাকা নেই
রঙিন গনিকার দিন হল শেষ,
আজ জীবনের কুঁজ দেখি তোমার গর্ভে,
সেইদিন লুপ্ত হোক,যেদিন পুরুষ পৃথিবীতে আসে'।...

না। আবার বলছি। এ কবির কবিতা বাংলা ভাষা আগে দেখেনি। গনিকারা সব সময়েই ক্লান্ত এমনকি খদ্দেরকে ইশারা করার

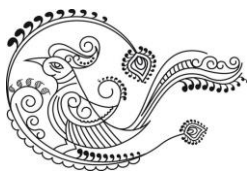

সময়েও। তারা শরৎচন্দ্রীয় জগত থেকে অনেক দুরে। বিন্দুমাত্র 'যৌবন মদমত্তা' নয়। এই গনিকা তাহলে কে? এত আমার দেশের মেয়ে।বেশ্যা নিয়ে অনেক সাহিত্য বাংলায় আছে।আছে অনেক কবিতা।কিন্তু এমন করুণাহীন জ্বালা ধরানো দুঃখ?না আমি পাইনি। কিসব তুলনাহীন মেটাফর-উপমা!!

১)'অধকার ধূসর, সাপের মত মসৃণ'

২)'মাঝে মাঝে আগুন জ্বলছে/'অন্ধকার আকাশের বনে'

৪) 'রাত্রে ধূসর সমুদ্র থেকে হাহাকার আসে'

৫) 'হিংস্র পশুর মত অন্ধকার এলো'

কবিতা পড়ে যে মধ্যবিত্ত পাঠক শান্তি, আনন্দ, লড়ায়ের মেজাজ অথবা নিবিড় দুঃখের অনুভূতি খোঁজেন,তাঁদের জন্যে এ কবি নন। বারবার মধ্যবিত্তকে আয়নার সামনে আনাই এই কবির লক্ষ্য। মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতা, চতুরতা, সুবিধাবাদী মানসিকতা, প্রচ্ছন্ন নীতিহীনতা, ন্যাকামো, মেকি হতাশা, ফাঁপা প্রগতিশীল ভেক। কবিতায় বারবার ফিরে আসে।তার সঙ্গে মিলিয়ে ভাষা,ছন্দ।

'কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি,
কত দীর্ঘশ্বাস,কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো
আরো কত দিন'।

অথবা

'স্বপ্নের মতো চোখ,সুন্দর শুভ্র বুক
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,...

এরকম অনেক উদাহরন দেওয়া যায়। যেখানে লাইনের পর লাইন বাক্য কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ক্রিয়াপদ নেই। এই ছিল তাঁর গদ্যছন্দের বিশেষত্ব। আমি তখন মনে করছি, সমর সেনের এই রিপিটেটিভ স্টাইলটা ধরতে পেরেছি। অগ্রজ জীবনান্দের কবিতার প্রভাব। তবে জীবনান্দের ভাষার একদম অন্য প্রান্তের ধারে। ছন্দে এই যে অনেক সময় ক্রিয়াপদ নেই, তার মধ্যে দিয়ে আধুনিক কবিতার বড় হাতিয়ার 'গুরুচণ্ডালীকে সচেতন ভাবে এড়িয়ে যাওয়া ছিল তাঁর বৈশিষ্ট।এবং কোন বৃত্ত মেনে তাঁর ছন্দকে মাপা যাবেনা।

আমরা তখন ঠাট্টা করে বলতুম-

কোলকাতা তুমি কার?

থামওয়ালা পুরনো কলকাতার,
বিজয়গড়ী রিফিউফি কলোনির
নাকি ফুটপাতের গণিকার?

এই রকম যখন আমার ধারনা গড়ে উঠছে,তখন আমার এক বন্ধু পাতা উলটে পেছনে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল...

'মাস্তুলের দীর্ঘ রেখা দিগন্তে
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে বিষণ্ন নাবিকের গান।.....
কত দিন,কত মন্থর দীর্ঘ দিন,
কত গোধুলি-মদির অন্ধকার,
কত মধুরাতি রভসে গোঙায়নু,
আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ন নাবিকের গান'।

আজ এতদিন পরেও স্বীকার করি, ওই মধ্যযুগের পদাবলীর ব্যবহার-'মধুরাতি রভসে গোঙায়নু', আমাকে মাটিতে পেড়ে ফেলেছিল। তাঁর ছন্দ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। বিষ্ণু দে থেকে বুদ্ধদেব বসু সবাই তাঁকে অন্ত্যমিল ছেড়ে দিয়ে গদ্যছন্দে লিখতে পরামর্শ দিয়েছেন। এতদিন পর মনে হয় অক্ষরবৃত্তের চালটা তাঁর হাতে ছিল। কিন্তু ওই পুরনো অক্ষরবৃত্ত বা এমনকি

মাত্রাবৃত্তের পয়ার দিয়ে আবেগের ট্যাপ খোলা উচ্ছ্বাসকে আটকান যাবে না, তিনি এটা বুঝেছিলেন।

আজ বোঝা যায়,রবীন্দ্রনাথের 'প্রথমে আমার প্রনতি গ্রহন করো পৃথিবী' অথবা 'পশ্চিমের বাগান বন চষা-খেত/মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগনি বাষ্পরেখায়...' এই গদ্য ছন্দ দিয়ে তিরিশের নাগরিক মধ্যবিত্তের ক্লীব জগৎকে কবিতার ভাষায় আনা যাবে না,এটা সমর সেনের আত্মস্ত ছিল।

অথচ কিছুটা অস্বাভাবিকভাবে কবি জীবনের শেষের দিকে একদম পাক্কা অক্ষরবৃত্তে পয়ারে কবিতা লিখেছেন।

'সাপ যত বসে আছে শিকারের তালে।
রাত্রি এল,মৃত্যু লেখা ব্যাঙের কপালে।।
মহাজন গান গায়,নদারৎ ধান।
অন্ধকার প্রেতলোকে ভাবে ভগবান।।
অক্ষম এ রায়বার ঈশ্বরকথনে।
প্রভুর বন্দনা শুনি বেনের ভবনে'।।

মনে হবে ঈশ্বর গুপ্ত ঘরানায় কেউ কবিতা লিখতে চাইছে। তাঁর হাতে এরকম ছন্দ দেখে অনেকেই অনেকদিন ধরে অবাক হয়েছে। কেউ কেউ আশাভঙ্গে হতাশ হয়েছেন। যুবক সুনীল গাঙ্গুলী এমনকি নাম করে নিজের রাগের কথা একটা কবিতায় লিখেছিলেন ১৯৫৮ সালে। কৃত্তিবাস পত্রিকায়।

'যে সমস্ত সৈনিক পুরুষেরা পানিপথ,হলদিঘাট,ফতেপুর সিক্রির ধুলোয়
স্বেদ আর শোণিত ঝরিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে,তাদের
হাতিয়ারের ধারে জ্বলত কলকাতার রোদ উনিশশো
চল্লিশে। পার্কের ঘাসে পিঠ দিয়ে শুয়ে থাকত সমর সেন...।
দেখা যায় সেই কিশোরপ্রতিম যুবাকে...।
একটি কবিতার লাইন যারা আর কখনো আসেনি
এই রাস্তায়,হাঁটেনি আমাদের অনুভূতির জগতে। ছন্দ
ছুঁড়ে দিয়েছিলে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যদের দিকে।তখন ভাবিনি
তুমি নিজেই কোনদিন
সত্যেন দত্তের মতো নির্ভেজাল মাত্রাবৃত্ত কিংবা ত্রিপদী হোয়ে যাবে'।(... সমর সেন/সুনীল গাঙ্গুলী)

এরকমই ছিল সমর সেনের প্রভাব।

কবি জীবন মাত্র বারো বছর। আঠারো থেকে শুরু করে হঠাৎ তিরিশ বছর বয়সে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন কিন্তু তিনি সবচেয়ে আলোচিত কবি। বিদগ্ধ মহলে জীবনান্দ বা বিষ্ণু দের থেকেও বেশী তিনি চোখে পড়ছেন। কবি সুকান্ত ভট্টার্চায্য ১৯৪৪ সালে অরণী পত্রিকায় লিখেছিলেন "গদ্য ছন্দে সমর সেনই দেখা যাচ্ছে আজ পর্যন্ত অদ্বিতীয়"। এই রকম একটা সময়ে কেন হঠাৎ ছেড়ে ছিলেন? কোথাও মুখ খোলেননি। একবার বন্ধু দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করে চিঠি লিখলে স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গে উত্তর দেন। "নাঃ।কবিতা আর আসে না। কোষ্ঠবদ্ধতা আমার সেরে গেছে"।

আড্ডার মৌতাত,
বালিগঞ্জের লপেটা চাল,...
রোমান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়।
যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে।
বছর দশেক পরে যাব কাশীধামে'।

নিজেকে নিয়ে শ্লেষ,ব্যঙ্গ দিয়ে হুইসল বাজিয়েছিলেন।

সমর সেন মারা যাবার বছর দুয়েক আগে ধর্মতলা স্ট্রিট (লেনিন সরণী) থেকে ভেতরে ঢুকে মট লেনে ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার অফিসে তাঁকে দেখেছিলুম, এক বর্ষাধোয়া শেষ বিকেলে। তখন তিনি বহু আলোচিত ইংরেজি সাপ্তাহিক ফ্রন্টিয়ারের কর্নধার/সম্পাদক এবং সব মধ্যবিত্ত ইংরেজি জানা জনগন ও সারা ভারতের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে, ফ্রন্টিয়ার পান্ডিত্যপূর্ণ তুখোড় ইংরেজি সাপ্তাহিক হিসেবে শুধু স্ট্যাটাস নয় মিথে পরিনত হয়ে গেছে। একনাগাড়ে ১৯৬৯ সাল থেকে চলছে। একটি অতি

সাধারন কোয়ালিটির কাগজে কভারহীন সাপ্তাহিক এত সম্মান আদায় করতে পারে ভাবলে বিস্ময় লাগে।

সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠে পুরনো হল ঘরে এককোনে বসে পত্রিকার এডিটিং এর কাজ করছেন। বেশ কিছু অতি বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীর নাম ভেসে আসছে কথাবার্তায়। লেখা এসেছে কিনা, কবে আসবে ইত্যাদি। মহাশ্বেতা দেবী আর গায়তী চক্রবর্তী স্পিভাক শারদীয় সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করছেন।

আমি দূর থেকে দেখছি মানুষটাকে। শীর্ণকায়, জীর্ণ শরীর, মদ্যপাণ জনিত অসুস্থতার লক্ষন। এই লোকটা কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। অথচ গদ্য ছন্দ আর কোলকাত্তাইয়া মধ্যবিত্তর মুখোশ খোলার কবিতা নিয়ে কথা উঠলে এখনো তাঁর নাম ওঠে। মোমিনপুরে বন্ধুর বাড়ি থেকে আড্ডা দিয়ে মাঝরাতে বেহালায় হেঁটে ফেরার সময় নির্জন রাস্তায় ট্রামের আওয়াজে কবিতার ছন্দ খুঁজে পেতেন। কুড়ি বছর বয়সে London times literary supplement এ তাঁর কবিতা নিয়ে লেখা বেরিয়েছে। ব্রিটিশ কবি স্টিফেন স্পেন্ডার কলকাতায় এলে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বাড়িতে স্পেন্ডারের সঙ্গে সমর সেনের মার্কসবাদ নিয়ে তুমুল তর্কাতর্কি হয়েছিল। প্রসঙ্গত জানাই কলকাতায় আসার অল্পদিন আগে স্পেন্ডার ও আরো একজন ব্রিটিশ কবি উইশটন অডেন যৌথভাবে খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন, যে তাঁরা মার্কসবাদ ত্যাগ করেছেন। সমর সেনে স্পেন্ডারকে এই নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেন। শোনা যায় তর্কাতর্কি এতই দীর্ঘ হয়েছিল যে এরপর সুধীন্দ্রনাথ, সমর সেনকে বাড়িতে কোনদিন আমন্ত্রণ করেননি।

প্রয়াত সরোজ দত্ত যেমন বলেছিলেন সেরকম সত্যই কি এই ছোটখাটো মানুষটি! ইনি হতাশা আর ব্যর্থতার কথা খালি প্রচার করেছেন? ভেঙ্গে পড়া মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়ের কবি? উনি তো চেয়েছিলেন 'আকাশ গঙ্গা আসুক নেমে'। আর সেই একুশ বছর বয়সে লিখেছিলেন

'আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল
নামুক মহুয়ার গন্ধ'।

আমি ফ্রন্টিয়ার অফিস থেকে নেমে আসছি। সাবেকি কোলকাতার সরু মট লেন। এই গলি যেখানে লেনিন সরণিতে মিশেছে তার দুদিকে ছোট ছোট বার/পাণশালা। কলগার্ল, বৃদ্ধা বেশ্যারা সন্ধ্যের পর ওখানে ফুটপাতে ভিড় করে। বড় রাস্তায় বেরিয়ে বাঁদিকে এগুলে বারদুয়ারী, আরো উজীয়ে গেলে লেনিনের স্ট্যাচু। ডান দিকে এগুলে খালাসিটোলা। সেপ্টেম্বরের বর্ষায় হাওয়ায় স্যাঁতস্যাঁতে ভাব। গলির মুখে সাট্টার বুকির দোকান আর চোলাইয়ের ঠেক। উল্টোদিকে ফুলের দোকানে বর্ষার জলে ভেজা স্বর্ণচাঁপার তোড়া থেকে গন্ধ ভেসে আসছে। সামনে ঢং ঢং করে ট্রাম, আওয়াজ করে চলে গেল। আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল আমাদের হাওড়ার এঁদো সেকেন্ড বাই লেনের নির্জন দুপুরে, টেবিলের ওপর খোলা, হালকা হলুদ রঙের ওপর শুকনো রক্তের রঙ্গে ডিজাইন করা বইটাকে।

'ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি।
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কিসের হাহাকার'।

সময়ের স্রোতে গানের সাথে

চর্যাপদ থেকে বাংলা ব্যান্ড, রিয়েলিটি শো

মণিদীপা ব্যানার্জী

আমি সুরে সুরে ওগো
তোমায় ছুঁয়ে যাই
নাইবা পেলাম দরশ তোমার
গানে গানে যেন তোমায় পাই
তোমায় ছুঁয়ে যাই

মিউজিক এই ছোট্ট শব্দটা মানুষের জীবনের সাথে আদি কাল থেকে যে গভীরতা নিয়ে অতপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে তার ব্যাখ্যা বা বর্ণনা কোনোটাই যথেষ্ট গবেষণা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। তবে গান-বাজনার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সর্বোপরি একটা একাত্মবোধ থেকেই এই প্রবন্ধ লেখার প্রয়াস।

পৃথিবীর যেকোনও ভাষায় সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আদিপর্বে কাব্যধারাটিই প্রাধান্যলাভ করেছে। বাংলা ভাষার সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। এর দুটি সম্ভাব্য কারণের প্রথমটি হল, লিপিহীন অবস্থায় শ্রুতি ও স্মৃতিবাহিত হবার জন্য কাব্যই উৎকৃষ্ট মাধ্যম। দ্বিতীয়ত লিপি আবিষ্কারের পরেও তালপাতার পুঁথিতে স্থান সংকুলানের জন্যও কাব্যই প্রাধান্য পেল। সুর, তাল, লয় ও ছন্দ সমন্বিত শ্রুতিনন্দিত পদ স্মৃতিধার্য হয় সহজে। তাই সাহিত্যের সঙ্গে সংগীত জড়িয়ে গেল ওতপ্রতোভাবে। যেমন ঋকবেদের স্তোত্রগুলিই গান আকারে পাওয়া যায় সামবেদে।

গান শেখার শুরুতে একজন শিক্ষার্থীর মনে হতেই পারে মাত্র সাতটা শুদ্ধ স্বর থেকে কী করে এত কিছু সৃষ্টি হতে পারে। মনে হতে পারে নিশ্চয়ই কোন ম্যাজিক আছে। একেবারে গোড়ার সেই সমীকরণটা কী যার মধ্যে লুকিয়ে আছে এত অনন্ত সম্ভাবনা।

ধীরে ধীরে যত শিক্ষার পথে হাঁটা যায় তত অনুভবে আসে...

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর

--- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানুষের জীবনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট শিল্প গুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো সঙ্গীত বা মিউজিক। সঙ্গীতের প্রাগৈতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় প্রস্তর যুগে যা প্রায় ৪০,০০০ বছরের পুরোনো। ভাষা ও সঙ্গীতের মধ্যে কোনটি মানব সমাজে আগে এসেছে তা নিয়ে পুরাতত্ত্ববিদদের মধ্যে বিতর্ক আজও বিদ্যমান। যাইহোক, ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি মিউজিকের যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ হওয়া উচিত গান বাজনা। মিউজিক তো শুধু সুর নয়। সুর সব সময় কোনো না কোনো লয়ের বেষ্টনীতে প্রকাশ পায়। জগত সংসারের এই নানান সৃষ্টির সমস্ত কিছুর মধ্যেই রয়েছে লয় বা rhythm. আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসে আলোর তরঙ্গে, মেঘের গর্জনে, পাখির ডাকে, বর্ষার ধারায় সবকিছুই তো ছন্দ আছে। এই ছন্দকে বিভিন্ন বোল দিয়ে নানান ছকে বেঁধে আমরা তাদের নাম দিই। আর এই তালে, কথা ও সুরের প্রয়োগই হল প্রকৃত গান বাজনা। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সাথে অনবরত প্রবাহমান এই সুর-তাল-ছন্দ আর এই প্রবাহমানতার সাথে ফল্গুধারার মতো মিশে রয়েছে ভারতীয় রাগ

সঙ্গীত। যা হলো সমস্ত ধারার গান-বাজনার ব্যাকরণ। ভারতীয় রাগসঙ্গীতের সাথে আধ্যাত্মিকতার এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী। পাঁচটি আদিরাগের সৃষ্টি হয়েছে মহাদেবের মুখ থেকে, আর পার্বতীর মুখ থেকে অবশিষ্ট একটি রাগের উৎপত্তি। ছয় রাগের স্ত্রী হলো এই ছত্রিশ রাগিনী। নাদ - ব্রহ্ম স্বরূপ, আর এই ব্রহ্ম থেকেই জন্ম নেয় সাতটি শুদ্ধস্বর। বাইশটি শ্রুতির উপর এই সাতটি স্বরের অবস্থানে তৈরি হয় সরগ্রাম বা সপ্তক। বৈদিক যুগে যজ্ঞানুষ্ঠান সময় বেশ কিছু মন্ত্র সুরে উচ্চারিত হতো। সেই থেকে শাম গানের সূচনা। জীবনে চলার পথে এমন কিছু মানুষের আবির্ভাব হয় যে বা যারা জীবনের দর্শন বদলে দেয়। বিনয় বিনম্রতা ও একাগ্রতার সাথে কোন বিষয়কে বুঝতে পারা বা শিখতে পারা শিক্ষাকে একটা সম্পূর্ণ মাত্রা দেয়। আমার অশেষ সৌভাগ্য যে এমন কিছু মানুষের আশীর্বাদ আমি পেয়েছি। পন্ডিত অজয় চক্রবর্তী সান্নিধ্যে দীর্ঘ দশ বছর সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। ভারতীয় রাগ সঙ্গীত থেকে খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরি, ভজন এই সমস্ত বিভিন্ন ধারার বিবর্তনের ইতিহাস বিষয়ক বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য ও ঘটনা মণিমুক্তো স্বরূপ, যা পেয়েছি গুরুজীর কাছ থেকে। যাতে সমৃদ্ধ হয়েছে আমার বোধ আমার জীবন দর্শন।

গুরুজীর কাছে শুনেছি মানুষ শুধু দেহের আরাম চায় না, মনের আরাম, আত্মার শান্তিতেই তার পরম তৃপ্তি। গান বাজনাই পারে সেই শান্তি দিতে, তা সে যে কোন ধারার হোক না কেন। মানুষের জীবনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, রাগ, অনুরাগ বিভিন্ন রকম আবেগের প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে। মানুষের কণ্ঠস্বরের এই ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগই সঙ্গীতের উৎস। অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ। আর তাই বোধহয় ঈশ্বর সাধনার সবচেয়ে সেরা ও সবচেয়ে পবিত্র উপায় হল সঙ্গীত সাধনা।

"গানই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা
লাগে না ফুল-চন্দন, মন্ত্র-তন্ত্র লাগে না
গানই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা"

-- সাধক ভবা পাগলা।

গুরুজীর কাছে শোনা কিছু অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কথা এখানে না বললেই নয় এই জগত সংসারের তিনটি সত্য হলো সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা যেমন স্মৃতিশীল হবে আবার তার বিনাশ ও অনিবার্য। এই তিনটি কার্য সম্পাদন করবেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। তাই আমরা যখন কোন মন্ত্রোচ্চারনের সময় 'ওম্' উচ্চারণ করি বা রেওয়াজের সময় তোমায় বিভিন্ন স্বরে 'ওম্' অভ্যাস করি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরাই তিন দেবতাকেই স্মরণ করি। ওম্=অ +উ +ম।

অ -> সৃষ্টির সূচক (ব্রহ্মা)

উ -> স্থিতির সূচক (বিষ্ণু)

ম্ -> বিনাশের সূচক (মহাদেব)

ঠিক একইভাবে ইংরেজি ভাষাতেও GOD শব্দের অর্থ তাই-

G-> Generator (সৃষ্টি)

O-> Operator (স্থিতি)

D-> Destructor(বিনাশ)

ওম্ উচ্চারণ করলে তাই এই তিন শক্তির সৃষ্টি হয়। মনের একাগ্রতা আসে। তাই সংগীত সাধনা থেকে আর কি ভালো উপায় হতে পারে ঈশ্বর সাধনার? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্রী হিসেবে প্রত্যেক সময় আমার মনে হয় ভারতীয় দর্শন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় রাগ সঙ্গীত সব পরস্পর একাত্ম,

অভিন্ন। তাই শ্রুতিনন্দন নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওই ঘরে যখন গুরুজি ওম্ উচ্চারণ করতেন তখন চারি পাশ এক অদ্ভুত গাম্ভীর্যে ভরে উঠত। বর্ণ আর সুরের সেই অনুরণন বা vibration কে সাক্ষাৎ করা এক অবর্ণনীয় ঐশ্বরিক অনুভূতি যা আমার সারা জীবনের সম্বল।

দশম থেকে দ্বাদশ শতকে রচিত চর্যাপদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়, এবং এই সময়কালকে বাংলা সাহিত্যের আদিপর্ব বলা হয়। বাংলা দেশে রাগের প্রচলনও হয় চর্যাপদ থেকে। চর্যা পদরচয়িতারা সংগীতের মাধ্যমে তাদের গুহ্য সাধনরীতির প্রচার করেছিলন। সেই হিসাবে বলা যায় ধর্মীয় ভাব বিস্তারের মাধ্যম ছিল সঙ্গীত। দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভক্ত কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাংলা রাগ সঙ্গীত ও কীর্তনে অসামান্য প্রভাব রেখেছে। পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও যার প্রভাব থেকে গেছে।

কীর্তন বাংলার আদি গান, বাঙ্গালির নিজস্ব সংস্কৃতি। এমনকি কীর্তনের সঙ্গে ব্যবহৃত শ্রীখোল ও করতালও একান্ত ভাবে বাংলার। সাধারণ মানুষের পক্ষে অতি সহজে ঈশ্বর সাধনার অন্যতম উপায় হিসেবে কীর্তন গানের সূচনা। যেহেতু সাধারণত এই গানের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের গুণ ও লীলা বর্ণনা করা হয় তাই এই কীর্তন গান দু রকমের হয়। নাম কীর্তন ও লীলা কীর্তন। যদিও রাগ-সঙ্গীতের ছত্রছায়াতেই কীর্তনের জন্য তবুও কোথায় যেন রাগ সঙ্গীতের কঠিন বিধি-নিষেধকে কিছুটা শিথিল করে রূপ, রস, কথার স্বাতন্ত্র বজায় রেখে কীর্তন গান সাধারণ মানুষের হৃদয়ে এক অন্য জায়গা করে নেয়। পঞ্চদশ শতকে চৈতন্য মহাপ্রভূর ভক্তি আন্দোলনে প্রধান সহায় হয়ে ওঠে কীর্তন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে কৃষ্ণপ্রেমে প্লাবিত করে মহাপ্রভূ মানুষকে হতাশার অন্ধকার ও বৈষম্যের গ্লানি থেকে মুক্ত করেন। চৈতন্যদেবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের প্রধান সহায় হয়ে উঠল কীর্তন যা প্রাভাবিত হয়েছিল পদাবলী সাহিত্য দ্বারা।

পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে দরবারী ধ্রুপদ, খেয়ালের সাথেও বাঙালির সাংস্কৃতিক সম্পর্ক হয়। বাংলার নিজস্ব শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারা বিষ্ণুপুর ঘরানা ধ্রুপদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বিষ্ণুপুর ঘরানার আদিপুরুষ পণ্ডিত রামশঙ্কর ভট্টাচার্য(১৭৬১-১৮৫৩) ওস্তাদ তানসেনের বংশধর ওস্তাদ বাহাদুর খানের শিষ্য ছিলেন বলে মনে করা হয়। মিঞা তানসেন, আমির খসরু থেকে শুরু করে রামচন্দ্র শীল, গোপাল চন্দ্র পাঠক, গদাধর চক্রবর্তী প্রমূখ বাংলায় ধ্রুপদ গানকে অন্য মাত্রা প্রদান করেন। বাংলা খেয়ালের উৎস হিসাবে একটি অতি প্রাচীন ঘরানাকে ধরা হয়। মল্লরাজভূমে ৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত কোটালী ঘরানা ১৮০০ শতকের কাছাকাছি বাংলা খেয়ালে পরিণত হয় বলে মনে করা হয়। ঠুমরী ও টপ্পার কথা বলতে গেলে নিধুবাবু আর সোরিমিঞার নাম কে না জানে? নিধুবাবু পলাসীর যুদ্ধের এক থেকে দেড় দশক আগে বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন। পদাবলী ও কীর্তনের প্রভাবে গানের মূল বিষয় তখনও রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ও তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় সমাজ আচ্ছন্ন। নিধুবাবু প্রথম তার টপ্পা গানে বিরহকে বিষয়বস্তু করলেন। এরপরে একটা সময় টপ্পা ও খেয়ালের মিশ্রণে এক নতুন শ্রেণীর খেয়ালের প্রবর্তন হয়। যার নাম টপ খেয়াল। এছাড়াও এই সময় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বৈঠকী গানের আসর বসতো। ভারতীয় সঙ্গীতের বিবর্তনের ধারায় জন্ম নেয় নাট্যগীত, পাঁচালী, কবিগান, যাত্রাগান। ভারতীয় সঙ্গীতের আকাশে প্রকাশ ঘটে নানান জ্যোতিষ্কের। অন্যদিকে খেয়াল গানে ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ, গোপাল মুখোপাধ্যায়, কানাই দাস বৈরাগী, অঘোর চক্রবর্তী ছিলেন অন্যতম পুরোধা। বঙ্গদেশে আরেক জনপ্রিয় ধারার গান ছিল পাঁচালী গান। এই পাঁচালী গানের রচয়িতা ছিলেন দাশরথি রায়।

"রাধে! আর মালা গাঁথ কি কারণ
তুমি যার তরে গাঁথ মালা সে গেছে মথুরা ভবন"

তৎকালীন বঙ্গদেশে প্রচলিত অন্য আরো একটি যে ধারার উল্লেখ না করলেই নয় তা হলো কবিগান বা কবির লড়াই। দুজন ব্যক্তি বা দু দল কবিয়াল পরস্পরের সাথে সুরারোপিত প্রশ্ন ও উত্তরের আদান প্রদান করবে। বিশেষ স্বতন্ত্র দক্ষতা ছাড়া যা অসম্ভব। যুক্তি দিয়ে ভাবতে গেলে রাগ সঙ্গীতের সাওয়াল জবাব আর কবি গানের প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে আদৌ কি কোন তফাৎ আছে? শুধু গায়ন শৈলীতেই এরা ভিন্নধর্মী। তাছাড়া আর কি পার্থক্য আছে উহার মধ্যে? কোন বিশেষ পটভূমিতে চিন্তন, মনন, সৃষ্টি ও তার প্রয়োগ - এই সব কিছু একসাথে ঘাটলে তবেই এই ধরনের গান বাজনা সম্ভব।

সৃষ্টির পর থেকেই বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সঙ্গীতের ধারাবাহিকতা প্রবাহমান। যেহেতু প্রত্যেকটি ধারাই পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত, তাই সেই অর্থে সঙ্গীতের যুগ বিভাজন উচিত ও নয়, আর সম্ভব ও নয়। পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীনতম সভ্য দেশেই মানুষ তার আনন্দ অনুষ্ঠানে গোষ্ঠীগতভাবে নাচ গান করত, যা ছিল আড়ম্বরহীন ও সহজ ভক্তি আন্দোলনের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের মধ্যে সুফিবাদ জন্ম নেয়। বাংলার এই নবযুগের সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হন লালন ফকির, কবি, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক এবং আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে। বাউল সঙ্গীতে ভক্তি আন্দোলন থেকে উদ্ভূত সঙ্গীত এবং সুফী সঙ্গীত এই দুইয়েরই প্রভাব লক্ষণীয়।

কবিগান, কীর্তন, ভজন, বাউল এই সমস্ত রূপ, একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরকে সম্মৃদ্ধ ও করেছে। এইরকমই বিভিন্ন্য রূপের একীকরণের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে আর এক প্রশস্ত ধারা যাকে আমরা বাংলা লোকসঙ্গীত নামে জানি। এ প্রসঙ্গে হাসুন রাজার নাম না করলেই নয়। হাসুন রাজা ও লালন ফকির, এই দুই ব্যক্তির প্রভাবে, অধুনা বাংলাদেশের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বাউল সঙ্গীত বিস্তার লাভ করে। লৌকিক গান থেকেই জন্ম নেয় লোকগান বা পল্লী গান। বাংলাদেশের এই লোকগান তার নিজস্ব গুণে বলিষ্ঠ রূপ নেয় এর মধ্যে রয়েছে রাঢ়ের বাউল, ঝুমুর, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি গায়ন শৈলী। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক বাংলা গানে লঘুসঙ্গীতে, গণসঙ্গীতে এমন কি হালফিলের বাংলা ব্যান্ড এও নানান ভাবে লোকগানের বাক ভঙ্গি ও গায়কীর ব্যবহার হয়ে চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গানের জগতে তথাকথিত আধুকতার ছোঁয়া লাগে। পুরোধা ছিলেন পাঁচজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩ - ১৯১৩), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১ - ১৯৩৪), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫ - ১৯১০), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ - ১৯৭৬)। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম এই পাঁচ কবি বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেন এক অন্য পর্যায়ে। যদিও আধুনিক এই শব্দটা খুবই আপেক্ষিক। তাই খুব সহজভাবে বুঝতে গেলে বলতে হয় যা কিছু সমসাময়িক সময়ের উপযোগী তাই আধুনিক। এই দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে রাগ সঙ্গীতের ছাঁচে পাশ্চাত্যের ছোঁয়ায় বাংলা গানে আধুনিকতার প্রথম স্রোত আসে কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখনীতে।

"ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ।
কোথায় গেলে পাবে কেহ
ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন
এই দেশেতেই মরি"

এই গানটি সকল বঙ্গসন্তানের হৃদয়ের গান। এই গানে কেদার রাগটিকে মিশ্রিত কাঠামোয় ব্যবহার করে কবি দেশাত্মবোধের শিহরণ জাগিয়ে তুলেছেন আপামর বাঙালির মনে।

"জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান
বিস্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার গান"

রবীন্দ্রনাথের রচনা, তার গান সর্বজনীন এই গানের বোধ অনুভূতি একান্ত ব্যক্তিগত। শ্রোতার কল্পনায় কবিগুরুর কথা, সুর একান্ত নিজস্ব রূপে ধরা দেয়। তার সৃষ্টিতে একাধারে উপনিষদ থেকে সংস্কৃত সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, খেয়াল, ঠুমরি, টপ্পা, কীর্তন, লোকসঙ্গীত প্রত্যেকটি গায়ন শৈলী প্রভাব স্পষ্ট। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন ঘটেছে তার রচনায়। প্রতিটি বাঙালির অনুভূতি চেতনায় সকল আবেগ অনুভূতিকে রবীন্দ্রনাথের গানে, কথায় প্রকাশ করা যায়। এক কথায় আমাদের জীবনের প্রতিটি পরতে রবীন্দ্রনাথ স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এই কর্মযজ্ঞের আরেক কান্ডারী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। রাগপ্রধান বাংলাগান, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, ভজন, ঠুমরি, বাউল, ইসলামী, কাওয়ালী, ঘুম পাড়ানির গান, ছাদ পেটানোর গান, হাসির গান ইত্যাদির নানান রসের গানে সমৃদ্ধ তার সৃষ্টি। রাগ-রাগিনী ও বাংলা গান নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় নজরুলের সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না।

"তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম সকল যুগাবতার
তোমার হৃদয়ে বিশ্ব দেউল সকল দেবতার"

জন্মসূত্রে হিন্দু না হয়েও একজন মানুষ এমন সব অপূর্ব শ্যামা সঙ্গীত রচনা করতে পারেন। রাধার কথা কৃষ্ণের কথা এমন করে বলতে পারেন এ বিস্ময় ছাড়া আর কি? শিল্পী যদি ভক্ত হয় তাহলে শিল্প হলো তার ভক্তির প্রকাশ। সেই ভক্তির কোন আকার নেই কোন ধর্ম নেই কোন অবয়ব নেই।

একজন শিল্পীই শুধু পারে সমস্ত বাহ্যিক আড়ম্বরের উর্ধ্বে উঠে সাধনায় সমর্পিত হতে। কলকাতার অন্যতম প্রখ্যাত সেতার বাদক নিতাই বোসের মুখে শুনেছি ওস্তাদ মোস্তাক আলী খান সাহেবের বাড়িতে নিয়মিত দেবী সরস্বতীর আরাধনা হতো। রামতনু পান্ডে শুধু সংগীতকে ভালোবেসে নিজের ধর্ম পরিবর্তন করে মিঞা তানসেন হয়েছিলেন। সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ, রাজনীতি, সামাজিক আচার-বিচারের উর্ধ্বে উঠেছেন তারা, তারাই প্রকৃত সাধক, তারাই প্রকৃত যোগী, তারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী।

কেন খুঁজে ফেরো দেবতা ঠাকুর
মৃত পুঁথি কঙ্কালে
হাসিছেন তিনি অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে

কি অপূর্ব এ জীবন দর্শন। এমন জীবন বোঝে উত্তীর্ণ হওয়ায় প্রকৃত মুখ্য লাভ। সাধনার পাশাপাশি মানুষের জীবনে বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠল এই সঙ্গীত। পরবর্তীকালে বাংলা চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের প্রয়োগ বাঙালির বিনোদনের এক অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠলো। প্রমথেশ বড়ুয়াঃর মুক্তি ছবিতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রয়োগ থেকে শুরু করে বিদ্যাপতি ছবিতে নজরুল গীতির ব্যবহার ক্রমশ বাংলার গান-বাজনার ধারাকে এক নতুন স্রোতে বাইতে শুরু করে। মোটামুটি চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলা সিনেমার গানের জগত যাদের সুর ও কণ্ঠের যাদুতে সমৃদ্ধ হলো তারা হলেন পঙ্কজ মল্লিক, কানন দেবী, কে এল সাইগল, জগন্ময় মিত্র, শচীন দেব বর্মন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মান্না দে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত প্রমুখ। এনাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ও বলিষ্ঠ গায়কের পিছনে ছিল রাগসঙ্গীত এঁদের অসাধারণ দক্ষতা। সঙ্গীত প্রিয় সাধারন মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে গেলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, আরো কত অমলীন শিল্পীরা। আর যাদের নাম না বললে অনেক কথাই না বলা রয়ে যায় তারা হলেন লতা মঙ্গেশকর ও আশা ভোঁসলে। জন্মসূত্রে বাঙালি না হয়েও প্রতিটির বাঙালির এবং আপামর ভারবাসীর অন্তরের অন্তঃকরণে এদের চিরস্থায়ী ঠিকানা। শচীন দেব বর্মন, রাহুল দেব বর্মন, কিশোরকুমার, সলিল চৌধুরীর সময় থেকে মুম্বাইয়ের হিন্দি চলচ্চিত্র জগতেও বাঙালিরা একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে। গানের কথা সুর এবং গায়কী নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা পরবর্তীকালে এক অন্য মাত্রা পায়।

অনেকে ক্লাসিক্যাল মিউজিক বা রাগ সঙ্গীতের সাথে লাইট মিউজিক বা লঘু সঙ্গীতের একটা অদ্ভুত বিভাজন করেন, আমি এবং আমার মতন অনেকেই হয়তো এর সঙ্গে একমত নন। কারনটা খুবই স্পষ্ট, রাগসঙ্গীতই সবকিছুর মূল স্তম্ভ, সেখানই সমস্ত ধারার গান বাজনার নোঙ্গর বাঁধা। বর্ণমালা না জানলে বা ব্যাকরণ না জানলে যেমন গল্প বা প্রবন্ধ রচনা করা যায় না, ঠিক সে রকমই রাগ সঙ্গীতের শিক্ষা না থাকলে অনুকরণ সম্ভব হলেও সৃজনশীলতা সম্ভব নয়।

বাংলা গানের জগতে আরও পরবর্তীকালের স্বনামধন্য শিল্পী হলেন হৈমন্তী শুক্লা ও শ্রীমতি নির্মলা মিশ্র বাংলা গানের কথা ও সুরের যুগলবন্দীর যে মজা, তা সাক্ষাৎ ভাবে এই দুজনের কাছ থেকে শিখতে পেরে আমি ধন্য। দিদি শ্রীমতি নির্মলা মিশ্র কেমন এক গাল মিষ্টি হেসে বলতেন 'বলতো রূপসী কে তোমার চোখে?' ওরে ,আর্শী কে তো চুপি চুপি প্রশ্ন করছি, জোর গলায় বললে সে কি গোপন প্রশ্নের উত্তর দেবে? একটু ফিস ফিস করে বলতে হবে তো! আহা কি অপূর্ব detailing. ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সাহেবের কথায় `চেনা চেনা সুরে ওই কে যেন বাঁশি বাজায়', দিদি হৈমন্তী শুক্লার গাওয়া এই গান কে না শুনেছে রাগ সঙ্গীত আর বাংলা গান কি সাবলীল ভাবে মিলেমিশে গেছে এখানে। শ্রীমতি শিপ্রা বসুর গাওয়া প্রতিটির রাগপ্রধান গান যেন এক একটা রত্ন। 'যমুনাকে বলতে পারে? কতবার কেঁদেছে রাধা?', এইখানে রেকর্ড কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না কলকাতার নামকরা দোকানগুলোতে, একদিন বাবার সাথে সোজা পৌঁছে গেলাম দিদির বাড়িতে। মুখে পানের খিলিটি নিয়ে অনারম্বর ভাবে বেরিয়ে এলেন বসার ঘরে। আমার পাগলামো দেখে হেসে বললেন, দাড়া আমার কাছে একটা কপি আছে। আজ এত বছর পরেও মুহূর্তটা আমার চোখের সামনে ভাসছে। সেই সারল্য, সেই আন্তরিকতা আমার কাছে অমূল্য।

'যমুনাকে বলতে পারে
কতবার কেঁদেছে রাধা।
আনমনে চলতে গিয়ে
কোন পথে পেয়েছে বাধা'

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের এর সাথে বাংলা গানের কথা মিশে গিয়ে যে ম্যাজিক তৈরি হয় তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে আর ডি বর্মন, সলিল চৌধুরী, বাপ্পি লাহিড়ীর গানে। সারা বছর ধরে গানের রেকর্ডিং বা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি একটা সময় থেকে বাঙালির দুর্গা পুজোর অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠল বাঙালির পুজোর গান। আজকালের মতো যেহেতু সেসময় বিনোদনের প্রাচুর্য্য এত ছিল না তাই বাঙালী রসে বসে সবটুকু উপভোগ করতে চাইতো। 1914 সালের গ্রামাফোন কোম্পানি সেই যে শারদীয়া নামের রেকর্ড প্রকাশ করে সেই ট্র্যাডিশন চলে এসেছে কুমার শানু, অভিজিৎ, শ্রেয়া ঘোষাল, শুভমিতা এদের পূজার গানে।

সংস্কৃতির সংমিশ্রণ মানুষের ধর্ম। এই ধর্ম মেনেই যুগে যুগে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ছোঁয়া লেগেছে বাংলা গানে। ডি এল রায়, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সুরের আত্মীকরণ হয়েছে বাঙালিয়ানায়। স্বাধীনত্তোর ভারতীয় সংগীতে রক এবং পপের মিশ্রণ ঘটেছে আর ডি বর্মন ও সলিল চৌধুরীর সুরে, যা বাংলা গানে এনে দিয়েছে বাণিজ্যিক সাফল্য। পাশ্চাত্যের প্রভাব বাংলা গানে নতুন রূপে ধরা দিল গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে। ১৯৬০ এর দশকে ইংল্যান্ডে তৈরি হয়েছে পৃথিবীর প্রথম ব্যান্ড বিটলস। চারজনের একটি গানের দল। নিজেদের লেখা ও সুর করা গান গেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে বিটলসের ছোঁয়া লাগল গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের শিল্পী সত্ত্বায়। জন্ম নিল প্রথম বাংলা ব্যান্ড মহীনের ঘোড়াগুলি। সমাজ থেকেই তৈরি হয় সঙ্গীত, আবার সমাজের গ্রহণযোগ্যতায় বাহিত করে তাকে। ১৯৭৬ সালে মোহীনের ঘোড়াগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারল না। তখনও মানুষ

সিনেমার সফল গানে মসগুল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে আমেরিকায় জন্মানো বব ডিলানের গানে উঠে এসেছিল নিপীড়িত মানুষের কথা, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল বিটলস। আবার সত্তরের দশকে বিদেশে সাংবাদিক হিসাবে কর্মরত কবীর সুমন গভীর ভাবে প্রাভাবিত হলেন বব ডিলানের গানে। পরিচিত হলেন পিট সিগারের সঙ্গে। দেশে ফিরে ১৯৯২ সালে 'তোমাকে চাই' অ্যালবাম দিয়ে বাংলা গানে তার যাত্রা শুরু করলেন। তার গান 'কতটা পথ পেরোলে তাকে পথিক বলা যায়...' প্রশ্ন করে সমাজ ব্যবস্থাকে। 'পেটকাটি চাঁদিয়াল/ মোমবাতি বগ্গা/ আকাশে ঘুড়ির ঝাঁক/ মাটিতে অবগ্যা'—এই গান এক শ্রেণীর মানুষের জীবন যুদ্ধের কথা বলে। সুমনের হাত ধরে গানের জগতে জন্ম নিল এক নতুন ধারা—জীবনমুখী গান। যুব সমাজকে গভীর ভাবে আলোড়িত করল এই গান। ১৯৯৫ সালে মহীনের ঘোড়াগুলি আবার মুক্তি পেল। আজ জীবনমুখী গানের এবং বাংলা ব্যান্ডের এক ঝাঁক শিল্পী রয়েছেন বাংলা গানের জগতে।

তারুণ্যের উদ্দম আর বৈচিত্রে বাংলা ব্যান্ড নতুন প্রজন্মকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করল তবে পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন রিয়ালিটি শো এর দৌলতে অদ্ভুত অস্থিরতা, খুব সহজে ও দ্রুতপদে তারকা হয়ে যাওয়ার হাতছানিতে অনেক সঙ্গীত শিক্ষার্থী দিকভ্রষ্ট হয়ে হারিয়েও গেছে।

এইখানে আর একটি মিশ্রণের বিষয়ে উল্লেখ না করলেই নয়। যন্ত্রানুসঙ্গেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিশ্রণ ঘটেছে খুব স্বাভাবিক ভাবে। যন্ত্র হিসাবে বাঁশি যেকোনও সমাজের আদি যন্ত্র কারণ তা তৈরী হত প্রাণীর হাড় দিয়ে। এরপর প্রাণীর চামড়া ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন যন্ত্রে। তারের যন্ত্রে প্রাচ্যের নিজস্বতা একান্তভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্ন যন্ত্রে। আধুনিক বাদ্যযন্ত্র হিসাবে পরিচিত হারমোনিয়াম, বেহালা, গিটার ইত্যাদি যন্ত্রানুসঙ্গ আজ বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় হলেও এগুলি সবই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অঙ্গ।

একটা সময় ছিল যখন গুরুর কাছে নাড়া বেঁধে বছরের পর বছর নিরলস সাধনার মধ্যে দিয়ে গান শেখার রীতি ছিল, কিন্তু তা আজ আর নেই বললেই চলে। ক্যাসেট সিডির যুগ পেরিয়ে এখন আমরা ইন্টারনেটের যুগে বাস করছি। প্রত্যেক মুহূর্তে কোন না কোন টার্গেটের পেছনে ছুটে চলেছি আমরা সবাই। চিত্ত বিনোদনের সমস্ত উপাদান আমাদের হাতের মুঠোয়। একাধিক বিকল্প আমাদের সামনে। একটা কিছু ভালো না লাগলে বা বুঝতে না পারলেই দ্রুত বদলে নিতে পারি পরবর্তী বিকল্পকে। ভালো আর খারাপের সুক্ষ বিভাজন এখন আরোও সুক্ষ।

তবে সব জিনিসের ভালো-মন্দ দুটো দিকই থাকে। হতাশার কথাই বা শুধু ভাববো কেন। ইন্টারনেটের দৌলতেই তো কত হারিয়ে যাওয়া গান, কত বিরল রেকর্ডিং অনায়াসে আমরা পেয়ে যাই হাতের নাগালে। তাই ভালোকে আঁকড়ে এগিয়ে যাব আমরা। আশার আলোয় নতুন নতুন সৃষ্টির পথে এগিয়ে যাব নির্ভয়ে।

"যা কিছু নবীন, নওল কিশোর
তারি আমি পিয়াসী।
আমি নুতনের অভিলাসী"

গুরু জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের এই গান তো আজো আধুনিক। তাই দিন বদলের সাথে সময়ের বিবর্তনের সাথে গান-বাজনার ধারা হয়তো বদলাবে কিন্তু যা Eternal বা চিরন্তন তার হয়ে যাবে অন্তহীনভাবে।আর সেই আলোর হাতছানিতেই এগিয়ে যাব আমরা।

আমার রবি

প্রণতি ঠাকুর

যেদিন প্রথম দেখেছিলাম
ফ্রেমে বাঁধানো ছবি
মা বলেছিলেন, উনিই হলেন
আমাদের বিশ্বকবি।

যেদিন প্রথম দুঃখ এসে
ভাঙিয়ে দিল ঘুম
একলা একা কাটল, সেই
রাতটা নিঝুম।

তুমি এসেছিলে বলে
ভরল আকাশ আলোয়
গাছে গাছে ফুটল কুসুম
জীবন আলোকময়।

তোমার গানে কাব্যে কথায়
সাজাই ডালি অঞ্জলি
বিষাদ ভুলে নতুন আমি
তোমার কথা বলি।

তুমি আমার ভালোবাসা
তুমি আমার রাখী
তুমি আমার পূর্ণিমা চাঁদ
তুমিই তো গান-পাখি।
শুনুন শুনুন মহাশয়
শুনুন দিয়া মন,
বাঙলা ও বাঙালির কথা
করি গো বর্ণন।

ছিল ছিল, অনেক ছিল
ছিল যে প্রচুর
ভালবাসা, স্নেহ মায়া
সংসারে ভরপুর।
জ্যাঠা কাকা বাবা মা
আর ছিল ভাই বোন
অষ্টপ্রহর মিলেমিশে
আনন্দ গুঞ্জন।
চিঁড়ে মুড়ি কদমা নাড়ু
বাদাম চাক্তি মোয়া,
পিঠে পুলিশ পায়েস
রসগোল্লা, পানতুয়া।
বটতলাতে দাবার আসর
জুটতো যত বুড়ো
মন্দিরে তে শঙ্খ ঘন্টা
থালায় ভোগের চূড়ো।
সব হারিয়ে বাঙালি আজ
খুঁজে বেড়ায় সব।
বিজ্ঞাপনে শহর ঢাকা
হুল্লোড় উৎসব।
শপিং মলে দিশেহারা
লোভী চোখের তারা
আম জাম গাছ উধাও
এখন টবে গাছের চারা।
হায় বাঙালি, হায় রে,
এ কি দশা হল তোর
জেগে ঘুমোস, টের পাস না
রাত কে ভাবিস ভোর।

ক্যালেন্ডারে রবিঠাকুর
শ্রী রামকৃষ্ণ দোলে
খেলার মাঠে বাঙালি উধাও
শুধু বিদেশিরা খেলে।
হায় বাঙালি, শনির দশায়
লুপ্ত পরিচয়--
কী আর বলি, সত্যি কথা
তুই বাঙালি নয়।

বাঙালি কে নিয়ে লিখতে বসে কত কী যে মনে আসছে, তার ইয়ত্তা নেই। আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গে জন্মেছি, বড় হয়েছি, জীবনের সিংহভাগ কাটিয়ে দিলাম, এক একসময় মনে হয় আমাদের বাঙালিয়ানা কতটুকু বজায় রাখতে পারলাম। নদী যেমন নিজের গতিতে চলতে থাকে, তেমনি সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র, সংগীতের ভাষার পরিবর্তন হতে থাকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। চলতে চলতে নদীর স্রোত কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হলে সে নিজেই বাঁক নিয়ে নতুন গতিপথ তৈরি করে কিন্তু নিজস্বতা হারায় না। এই সময়ে দাঁড়িয়ে চারপাশের অবনমন দেখে হতাশা, ক্ষোভ এবং লজ্জাবোধ হয়। হ্যাঁ, যখন মনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ফিরে দেখার চেষ্টা করি, শিকড় খুঁজতে চাই, একটা আবছা অন্ধকার গ্রাস করে চেতনাকে।

২

এখন আমরা আধুনিক থেকে আধুনিকতর হওয়ার দৌড়ে ছুটছি। পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই যারা নিজেদের মাতৃভাষা কে অবজ্ঞা করে। অথচ আমরা অবলীলায় বলি, ' কেন কি' অর্থাৎ 'কিঁউ কি'র বাংলা প্রতিশব্দ। ভট্টাচার্য পদবী হয়ে যায় 'ভট্টাচারিয়া', 'সান্যাল' হয় 'সানইয়াল'। অহনা হয়ে যায় 'আহানা'। দক্ষিণ কলকাতার এক পাড়ার অনুষ্ঠানে যেখানে নিরানব্বই ভাগ বাসিন্দা বাঙালি সেখানে ঘোষক কয়েকশো ইংরেজি, হিন্দি আর আট দশটি বাংলা ভাষা যুক্ত করে ঘোষণা করে চলেছেন। বিভ্রম হয় কোথায় আছি! অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় এমন ঘটনা ঘটবে? নৈব নৈব চ। বাংলা বলতে না পারা এখন মহা কৃতিত্বের ব্যাপার। তবে আমরা ক্যালেন্ডারের তারিখ মেনে ২১ শে ফেব্রুয়ারি আর ১৯ শে মে *ভাষা দিবস* পালন করি মহা সমারোহে।

'দিবস গুলি পালিত হয়, শপথ গুলি নয়,
নকল বুঁদির কেল্লা গ'ড়ে, নকল শত্রু জয়।
দিবস, তুমি শুধুই ছবি, শুধু পটে লিখা!
দিবসগুলি হাওয়ায় হারায়, বিলীন জয়টিকা।
বারো মাসে তেরো পার্বণ, তবু বাংলাদেশ
বারোমাস্যার দুখিনী তুই,
কেঁদে ভেজাস কেশ "।

কাঁটাতারের ওপারে যে বাংলা সেখানে মাতৃভাষা কে নিয়ে এমন অবজ্ঞা দেখা যায় না। এমন একটা সময়ে এসে দাঁড়িয়েছি, যখন হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ আসে স্রোতের মতো 'হ্যাপি বিজয়া দশমী', 'হ্যাপি ধনতেরাস' , 'হ্যাপি শিবরাত্রি', নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না।

৩

কালের নিয়ম মেনে সাহিত্যের ভাষা,গানের কথা- সুর, চলচ্চিত্রের সংলাপের পরিবর্তন হচ্ছে যা স্বাভাবিক। পুরোনো যা-কিছু সব ভালো, নতুন যা হচ্ছে সবটাই খারাপ বা গ্রহণযোগ্য নয় এমন ভাবধারায় আমার বিশ্বাস নেই। বেশ কিছু ভালো গান, নাটক, সিনেমা তৈরি হচ্ছে যেগুলো সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন মানুষ সাদরে গ্রহণ করছেন। একটা বিষয়ে আমরা কেন যে আপোষ করে চলেছি, তার উত্তর নেই আমার কাছে। আমরা গর্ব করে বলি, ' আমাদের একজন রবীন্দ্রনাথ আছেন' অথচ তাঁর গান নিয়েই

যত রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষার নামে স্বেচ্ছাচারিতা চলছে। ইতস্ততঃ কিছু প্রতিবাদ হচ্ছে না যে, তা নয়। কিন্তু সংগঠিত প্রতিবাদ কোথায়! আমরা কি মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ছি ক্রমশ। সঙ্ঘবদ্ধ হতে ভুলে যাচ্ছি আমরা, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, সত্যি বলতে লিখিতভাবে বলে গেছেন, " যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই তো বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী আমার গান এটা জোর করে বলতে পারি।"

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয় ছিল এই যে " বিশেষ করে বাঙালিরা, শোকে দুঃখে, সুখে আনন্দে, আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এ গান তাদের গাইতেই হবে।"

জীবদ্দশাতেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা দেখে গেছেন এবং আতঙ্কিতও হয়ে উঠেছেন। নিজেই অভিযোগ কেরছেন তাঁর গানের গায়নে স্টিমরোলার চালোনোর।

আর্তি করেছেন : " গাইবার সময় আমার গান যেন আমার বলে মনে হয় "। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পীদের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে কখনো এমন অভিযোগ ওঠে না। পরীক্ষা নিরীক্ষার নামে অযথা তাঁর গান কে বিকৃত করার প্রবণতা শুধু পীড়াদায়ক নয়, লজ্জারও। একবারও কি ভেবে দেখছি না, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কী রেখে যাচ্ছি আমরা। বাংলা গানের স্বর্ণযুগের শিল্পীদের গান আজও আমাদের মনে গেঁথে আছে। গত কুড়ি - বাইশ বছরে বড়জোর আট দশজন শিল্পীর গান সমাদর পেয়েছে শ্রোতার কাছে।

৪

রবিঠাকুর সেই কবে বলেছেন, " এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর, বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর"। কী নিদারুণ সত্য হয়ে উঠেছে এই কথা আমাদের জীবনে। বাঙালির পোষাক, খাদ্যাভ্যাস, আচার অনুষ্ঠানে আমূল পরিবর্তন এসেছে। বিয়ে বাড়িতে এখন 'মেহেন্দী', 'সাংগীত' (সঙ্গীত) না হলে জাতে ওঠা যায় না। গায়ে হলুদ কবে থেকে হয়ে গেল 'হলদি', বৌভাত হয় না, হয় রিসেপশন, শেরওয়ানি, লহেঙ্গা- চোলি না পরলে কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে লাগে বিয়ের উৎসব। এখন তো সবকিছু সামাল দেন 'ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি'। খাবারের প্লেট হাতে বুফের লাইনে দাঁড়ালাম, থরে থরে সাজানো বেবি নান, তন্দুরি রুটি বা কুলচা, ছোলে, নবরতন কোর্মা, পনীর পসিন্দা, ব্যায়গন বাহার, গুলাব জামুন। প্রাণ হু হু করে ওঠে ফুলকো লুচি, কড়াইশুটির কচুরি, রাধাবল্লভি, নারকোল দিয়ে ছোলার ডাল, লম্বা বেগুন ভাজা, কুমড়োর ছক্কা, পোলাও, পানতুয়ার জন্য। আমাদের চিরাচরিত খাবার হয়ে গেল ত্যাজ্য। হারিয়ে গেল নহবতখানা, সানাইয়ের সুর, উষ্ণ আপ্যায়ন। আলপনার জায়গায় এল রঙ্গোলি। এই যে পরিবর্তন ঘটে গেল প্রাত্যহিক জীবনে, তার জন্য দায়ী আমরাই। বাঙালির হৃদয়খানি বড় উদার, সে সবাই কে আপন করে নেয় বটে কিন্তু নিজের ঐতিহ্য কে বিসর্জন দিয়ে। যাদের কাছ থেকে আমরা নিলাম তাদের খাবার, তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, তাদের আচার অনুষ্ঠান তারা কি একটা কিছু নিল আমাদের কাছ থেকে?

অন্য রাজ্যের মানুষ জোর করে আমাদের ওপর কিছু চাপিয়ে দেয়নি বরং তারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের নিজস্বতা কে একবিন্দু ত্যাগ করে নি। আমাদের গায়ে নকলনবীশ তকমা লাগিয়ে মহানন্দে দিন কাটাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বিলাত ফের্তা' কবিতার কথা।

"আমরা বিলাত- ফের্তা ক'ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই;
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।

.....

আমরা বিলিতি ধরনে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরনে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি। "

আমরা ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার করি। গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান হয়ে গেছে ' হাউস ওয়ার্মিং '। একটি জাতি যখন তার শিকড়ের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন তার অস্তিত্বের সংকট অনিবার্য হয়ে যায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের এবং বিদেশের বাঙালি সংগঠনগুলো তুলনায় অনেক বেশি যত্নবান বাংলা শিল্প সংস্কৃতি কে ধরে রাখতে। বাঙালির একটা দুর্নাম আছে যা অনেকাংশে সত্য। বাঙাল বেশিদিন একসঙ্গে জোটবদ্ধ ভাবে চলতে পারে না। মতের অমিল থেকে শুরু হয়ে মনান্তরে পৌঁছে যায় তারা। সংগঠন ভেঙে যায় অচিরেই। যেমনভাবে একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে গিয়ে 'শুধু আমি আর আমার পরিবার নিয়ে ভালো থাকি' এই মনোভাবের জন্য ভাঙন ধরে আজ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা আমরা। অনিবার্য এই ভাঙন বা ফাটল ভরাট করার দায়িত্ব শেষপর্যন্ত আমাদের ওপরেই বর্তায়। নতুবা পরের প্রজন্মের কাছে আমাদের মূক বধির হয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

এই লেখা কারোকে আঘাত করার জন্য নয়। আত্মসমালোচনা করতে হয় মাঝেমধ্যে, না হলে ভুলের পর ভুল, পুনরপি ভুল হতেই থাকবে।

" বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"।

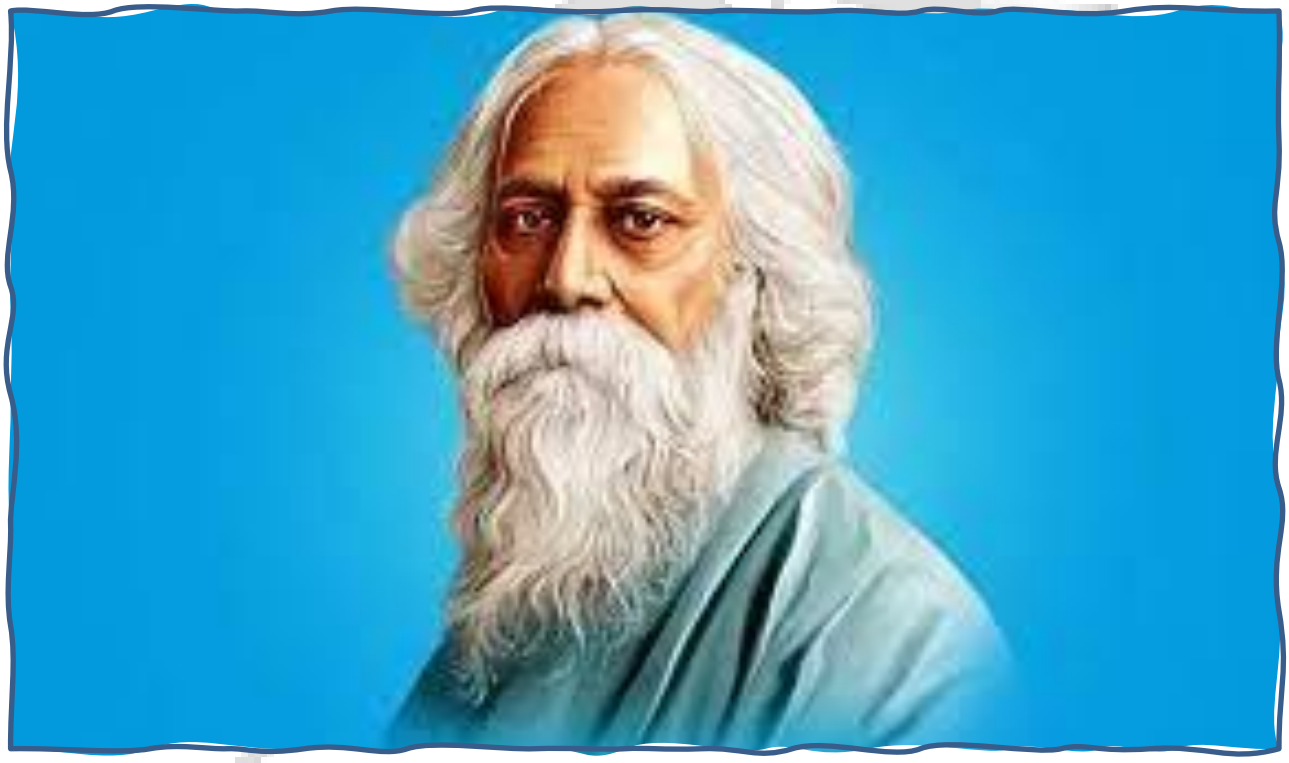

বীরসিংহের সিংহশিশু

শুভ্রা মন্ডল

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারত মায়ের কোল জুড়ে যেসব মহান ব্যক্তিত্ব জন্ম নিয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বলা বাহুল্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাদের ভিতর এক অগ্রজ পুরোধা, যিনি একধারে ছিলেন অসামান্য পান্ডিত্যের অধিকারী, জনদরদী, অন্যধারে শিখ্যা ও সমাজ সংস্কারক, বাংলা তথা সমগ্র ভারতকে তিনি চলতে শিখিয়েছিলেন এক নতুন পথে, দেখিয়েছিলেন এক উজ্জ্বল অগ্রগতির দিশা | আমরা যারা বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জন্মেছি, তারা হয়তো সবাই বিদ্যাসাগরের কথা জানেন, কিন্তু আমাদের নব প্রজন্ম যারা একবিংশ শতাব্দীর, তারা অনেকেই এই মহাপুরুষের কর্মকান্ডের সাথে পরিচিত নোই , আমাদের নতুন প্রজন্মের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে আমাদের লেখাপড়ার হাতে খড়ি হয় কিন্তু সেই বিদ্যাসাগরের লেখা বর্ণপরিচয় দিয়েই, আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থাকলেও বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে জানাটা আমাদের অন্ত্যন্ত জরুরি, তাই বাতায়নের পাতায় আজ আমি তুলে ধরতে চলেছি সেই মহান রূপকারের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী আর তার সংগ্রামের গল্প,পশ্চিম মেদিনীপুর এর ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে পিতা ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবীর কোল জুড়ে ১৮২০ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর | নিজেকে বড়ো গর্বিত মনে হচ্ছে আজ, আমারও জন্ম স্থান সেই ঘাটাল মহকুমা শহরে | ওই বিরসিংহের সিংহ শিশুই একদিন বিশ্বের সামনে ভারতের হিন্দু সমাজের এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল, "বিরসিংহের সিংহ শিশু বিদ্যাসাগর বীর, উদ্বেলিত দয়ার সাগর বীর্যে সুগম্ভীর"

এইতো বছর দুয়েক আগে গরমের ছুটিতে বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরে এসেছিলাম বিদ্যাসাগরের জন্মভিটে | আমার পৈতৃক বাড়ি থেকে পায়ে হাঠা দূরত্বে ঘাটাল বাস স্ট্যান্ড, সেখান থেকে ঘাটাল-ক্ষীরপাই মেন্ রোড দিয়ে সাড়ে আট কিলোমিটার গেলে, সিংহডাঙ্গা বাস স্ট্যান্ড, সিংহডাঙ্গা বাস স্ট্যান্ডে নেমেই দেখা যায় বিদ্যাসাগর তোরণ, ওটাই বীরসিংহ গ্রামের মেন্ প্রবেশপথ, তারপর সবুজে ঘেরা বীরসিংহ রোড দিয়ে পাঁচ কিলোমিটার এগোলেই পাথরা পেরিয়ে বিদ্যাসাগরের জন্মভিটে, আজ সেখানে বিদ্যাসাগরের সেই পুরোনো বাড়ির কিছুই আর বেঁচে নেই, তার পরিবর্তে সেখানে পুরোনো আদলে তৈরী পাঁচটি বাড়ি নিয়ে গড়ে উঠেছে বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দির, এখানে রয়েছে কিছু সংগ্রহশালা, পাঠাগার, যেখানে মাটির পুতুল দিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবিনী তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, এই স্মৃতি মন্দিরের অদূরেই রয়েছে বিদ্যাসাগরের শিখ্যাগুরু কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এর পাঠশালা, পাশেই রয়েছে মায়ের নামে তৈরী ভগবতী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রামীণ লাইব্রেরি, ঠাকুরদাস মঞ্চ প্রভৃতি, এখানে প্রতিবছর বিদ্যাসাগর মেলা বসে, দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বিজড়িত এই বীরসিংহ গ্রামে, নানান অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে প্রতিবছর স্মরণ করা হয় আমাদের করুনা সিন্ধু দয়ার সাগরকে |

আজ বিদ্যাসাগরের জগৎ জোড়া নাম থাকলেও তার বেড়ে ওঠা ছিল কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, পান্ডিত্য আর স্বাধীনচেতা পরিবার হলেও তার আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই করুন, মা সেকালের হলেও তার মন ছিল খুবই আধুনিক ভাবসম্পন্ন, পরিবাবের আর্থিক সচ্ছলতা ফেরাতে পিতা ঠাকুরদাস অল্পবয়সে বীরসিংহ ছেড়ে কলকাতায় আসেন,সেখানে এক ব্যবসায়ীর দোকানে খাতা লিখতে

শুরু করেন, ঠাকুরদাস ছিলেন অত্যন্ত সৎ, এর জন্য অতি সহজেই তিনি মানুষের বিশ্বস্ততা পান এবং একদিন সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান, দারিদ্র থাকলেও বিদ্যাসাগর ছোটোবেলাথেকেই খুব মেধাবী নিষ্ঠ আর মনোযোগী ছিলেন, সেই কারণেই গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাসাগর খুব সহজেই এক আলাদা স্থান করে নিয়েছিলেন, তার মেধাবী নিদর্শন তো আমরা সকলেই জানি, একবার তিনি বাবার সাথে পায়ে হেটে কলকাতা গেছিলেন, সেই যাত্রাপথে তিনি মাইল স্টোন দেখে দেখেই সমস্ত সংখ্যাগুলো শিখে নিয়েছিলেন, গ্রামের পাঠশালার শিখ্যা শেষ করে তিনি বাবার সাথে কলকাতায় চলে আসেন, সেখানে তিনি আজকের যেটা স্ট্র্যান্ড রোড, সেখানে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে বাবার সাথে থাকতে শুরু করেন এবং ওখানের এক পারিবারিক পাঠশালায় পড়াশুনা শুরু করেন, কয়েক বছরের ভিতর তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে অসামান্য কৃতিত্বের ছাপ রাখেন, দারিদ্র তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি, তার সেই অসামান্য কাহিনীতো আমরা সকলে জানি, রাতে আলোর অভাবে তিনি ঘরে পড়াশুনা করতে পারতেন না, আজ যেখানে মিলেনিয়াম পার্ক সেই ঘাটের রাস্তায় অনেক লাইটপোস্টের আলো ছিল, সেই আলোতে তিনি পড়াশুনা চালিয়ে যেতেন গভীর রাত অব্দি, বাবার সাথে নিজে রান্না করে দিনযাপন করতেন তিনি, এইভাবে তিনি কয়েক বছরের ভিতর সংস্কৃত কলেজের পড়াশুনা শেষ করেন এবং সেখানে প্রথম স্থান অধিকার করেন, তিনি বাংলা এবং ইংরেজি সাহিত্য, ব্যাকরণ, বেদান্ত, ন্যায়, জোতিষশাস্ত্র এবং একাধিক বিষয়ে অসামান্য মেধার পরিচয় দেন, এরপর তিনি হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এই পরীক্ষার সংসাপত্রে প্রথম বিদ্যাসাগর উপাধি উল্লেখ করা হয়, তিনি বিদ্যাসাগর, দয়ারসাগর, করুনারসাগর, বিবেকের সাগর, আধুনিকতার সাগর, প্রগতিশীলতার সাগর, উদারতার সাগর, সাগর কথাটা মনেহয় শুধু তার জন্যই প্রযোজ্য, তার অসামান্য প্রতিভার জন্য মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত কলেজের পড়াশুনা শেষ করেন এবং আরো উচ্চ শিক্ষার দিকে এগিয়ে যান |

বিদ্যাসাগর উচ্চ শিখ্যা সম্পন্ন করে মাত্র ২১ বছর বয়সে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কর্মরত হন এবং গোটা পরিবারের হাল ধরেন, বাবা ঠাকুরদাস এর বয়েস হওয়ার দরুন তিনি তাকে কলকাতা থেকে বীরসিংহ নিয়ে আসেন, এরপর তিনি তার ভাইকেও কলকাতা এনে পড়াশুনা শেখান, ফোর্টউইলিয়াম এ কর্মরত থাকার সময় তিনি বাংলা সাহিত্যের এবং শিখ্যা ব্যবস্থার কিছু ভুল ত্রুটি খুঁজে পান এবং তার সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেন, সেই সময় তিনি বহু ছাত্রকে তার নিজের বাড়িতে রেখে পড়াশুনা শেখান, আমরা সকলেই বাংলা সাহিত্যে তার অবদান জানি, শিশুকালে সব বাঙালি বাচ্চার ই শিক্ষার হাতে খড়ি হয় বর্ণপরিচয় দিয়ে, এ তার এক অনবদ্য সৃষ্টি, তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যের ও অনবদ্য সংস্কারক, কিছুদিনের মধ্যে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ত্যাগ করেন এবং তার নিজের কলেজ সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন, সেই সময় তিনি বাংলার শিখ্যা ব্যবস্থার পরিবর্তনের একটি খসড়া তৈরী করেন এবং তা রূপায়িত করার জন্য ক্লেগ কতৃপক্ষের কাছে পেস করেন, এই নিয়ে কলেজ কতৃপক্ষের সাথে মতবিরোধ হয় এবং তিনি সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করে আবার ফোর্টউইলাম কলেজে যোগ দেন, তার কয়েক বছের ভিতর সংস্কৃত কলেজ কতৃপক্ষ তাদের ভুল বুঝতে পারেন এবং তাকে আবার ফিরিয়ে আনেন এই শর্তে যে বাংলার শিখ্যা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য তাকে দেওয়া হবে অবাধ স্বাধীনতা, তিনি ই প্রথম ইংরেজি শিখ্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং ইংরেজি শিখ্যা বাধ্যতামূলক করেন, কিছুদিনের ভিতর তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং বাংলার বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত হন, এই ভাবে তিনি বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক অন্য স্টোরে নিয়ে আসেন, আজ ও বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের সেরা, তার রূপকার কিন্তু ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ই | তাইতো রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর কে বাংলা সাহিত্যের জনক হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন |

তখনকার দিনে বিয়ে হতো খুব অল্প বয়সে, শিক্ষা স্বনির্ভরতার কোনো প্রয়োজন ছিল না, মেয়েদের তো বিয়ে হতো একদম অল্প বয়সে, বিদ্যাসাগরের নিজের ও বিয়ে হয়েছিল মাত্র ১৫ বছর বয়সে, তার স্ত্রীর নাম ছিল দিনময়ী দেবী, তিনি ই প্রথম নারী শিখ্যার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন, একজন পুরুষকে শিক্ষিত করলে শুধু তাকেই শিক্ষিত করা হবে, কিন্তু একজন নারীকে শিক্ষিত করলে একটা বংশকে শিক্ষিত করা হবে, তাই সমাজে নারী শিখ্যা অত্যন্ত জরুরি, তিনি এর প্রয়োজন বুঝলেও তখনকার সমাজ ছিল এর কঠোর বিরুদ্ধে, সেইসময় দেশে একটিও বালিকা বিদ্যালয় ছিল না, তিনি বুঝেছিলে এটা করতে হবে সবার আগে, তিনি নিজে আর্থিক ভাবে তেমন স্বচ্ছল ও ছিলেন না তখন, মানুষের দোরে দোরে ঘুরে তিনি তৈরী করলেন "নারী শিখ্যা ভান্ডার" সেই অর্থে স্কুল প্রথিষ্টার কাজ শুরু করলেন, হিন্দু ব্রাহ্মণ সমাজ ছিল এর ঘোর বিরোধী, তিনি কিন্তু এসবে কোনো কর্ণপাত করেননি, এগিয়ে গেছেন সব বাধা পেছনে ঠেলে, বেথুন সাহেবের সহায়তায় ১৮৪৯ সালের ৭ই মে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বেথুন স্কুল, যা আজ স্বগৌরবে বেথুন কলেজ হিসেবে পরিচিত, বলা বাহুল্য এই বেথুন স্কুল ই ভারতের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়, এই কলেজ থেকেই প্রথম স্নাতক হন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি যিনি ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসক, অভিনেত্রী শোভা সেন ও এই কলেজের, বাবার কাছে শুনেছি বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদাজিয়া ও নাকি এই কলেজে পড়াশুনা করেছেন কিছুদিন, এছাড়াও অগণিত কৃতি ছাত্রী রয়েছেন, আছেন শিল্পী, সমাজ সংস্কারক, স্বাধীনতা সংগ্রামী | মাত্র কয়েক বছরের ভিতর তিনি সারা বাংলায় ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তার একটি নিজের বীরসিংহ গ্রামে, মায়ের নাম উৎসর্গিত "ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়" নামে,তিনি পরিবারে পরিবারে গিয়ে তাদের মেয়েদের সেখানে ভর্তি করতে বলেন, অল্প দিনের মধ্যে প্রায় ১৫০০ মেয়ে বিভিন্ন স্কুল গুলোতে ভর্তি হয়, খুলে যায় আর এক অবারিত পরিবর্তনের রাস্তা, নারী শিখ্যায় শিক্ষিত হতে থাকে গোটা দেশ, এসব বিদ্যাসাগরের ই অবদান |

তখনকার দিনে সতীদাহ প্রথা ছিল এক ঘৃণিত প্রথা যেখানে যেখানে এক অপরিণত বিধবাকে তার মৃত স্বামীর চিতায় জ্বলন্ত পুড়িয়ে মারা হতো, এতে তার মন জ্বলে উঠেছিল, তার বিরুদ্ধে তিনি গর্জে উঠেছিলেন, সেই সময় তিনি কাছে পান রাজারামমোহন কে, বিদ্যাসাগরের সংস্কারমূলক কাজে হিন্দু ব্রাহ্মণ সমাজ ছিল আগাগোড়াই একটি বাধা, তিনি বুঝেছিলেন সতীদাহ রদের একমাত্র রাস্তা বিধবা বিবাহ, এর বৈধতা খুঁজতে তিনি বৈদিক শাস্ত্র নিয়ে গভীর ভাবে পড়াশুনা শুরু করেন এবং প্রমান করেন যে বিধবা বিবাহ বৈদিক শাস্ত্রে উল্লিখিত এবং বৈদিক মতে তা গৃহীত ও, এরপর তিনি বিধবা বিবাহের একটি খসড়া আইন প্রণয়নের কাজ শুরু করেন এবং এক বছরের ভিতর সেই খসড়া সম্পন্ন করেন, অবশেষে অনেক বাধা বিপত্তির মাঝে এবং ডালহৌসি সাহেবের নিরন্তর সমর্থনে ১৮৫৬ সালের ২৬ শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাস্ হয় আজ যা "The Hindu Widows' Remarriage Act, 1856" নামে পরিচিত, এই বিধবা বিবাহকে উদহারণ স্বরূপ করে রাখতে তিনি মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে বিধবা মেয়েদের ভালো প্রতিষ্টিত পরিবারে বিয়ে দিয়েছেলেন, এমনকি তিনি ১৮৭০ সালে নিজের ছেলে নারায়ণ চন্দ্রের সাথে এক বাল্য বিধবার বিয়ে দিয়েছিলেন, আজ ভাবতে খুব অবাক লাগে যে আমরা বিংশ শতাব্দবিতে কত গোড়ামি নিয়ে চলি কিন্তু কতকাল আগেও বিদ্যাসাগর ছিল কত উদার মনের আর আধুনিকতায় ভরা |

অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের জন্য ও তার অবদান ছিল অসামান্য, তার কাজ শুধু বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনায় আসেন, সেখানে "কর্মতার" এ বসবাস শুরু করেন, তার জীবনের ১৮ টা বছর তিনি এখানে অতিবাহিত করেছিলেন ওই অনগ্রসর সাঁওতাল মানুষের উন্নতিকল্পে, সেখানে

তিনি গড়ে তুলেছিলেন বালিকা বিদ্যালয়, প্রবীণদের জন্য সান্ধ্য বিদ্যালয়, দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় প্রভিতি যা আজ নন্দনকানন হিসেবে পরিচিত, বিদ্যাসাগরের এই সমাজ সংস্কারের নজির বিহীন অবদানের জন্য, ঝাড়খন্ড সরকার এই ব্লকের নামকরণ করেন "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" ব্লক হিসেবে, আমরা সদা গর্বিত বিদ্যাসাগরের এই ব্যাপ্তিহীন কর্মকান্ডে |

তিনি সাহায্য করেছিলেন অগণিত মানুষকে, সবার আগে মনে পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে, একসময় মধুসূদন ভুগেছিলেন চরম অর্থকষ্ঠে, সেইসময় বিদ্যাসাগর তার পশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাইতো মধুসূদন লিখেগিয়েছেন "বিদ্যাসাগর" কবিতা,

বিদ্যাসাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেম- ক্লান্তি অম্লান কিরণে।

বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি ছিল অতুলনীয়, মায়ের ডাকে তিনি দুরন্ত দামোদর যদি সাঁতরে পেরিয়ে এসেছিলেন এক প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝার রাতে, কতটা মাতৃ ভক্তি থাকলে একসন্তান তার মায়ের কথায় এমন দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলতে পারে অনায়াসে |

তিনি রামকৃষ্ণ দেবের ও প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছিলেন, ছোটবেলায় পিসিমনির মুখে শুনেছি, একবার রামকৃষ্ণ আর বিদ্যাসাগরের দেখা হয়েছিল, রামকৃষ্ণ উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন,বলেছিলেন তুমি তো বিদ্যার সাগর, কৌতুকের ছলে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন "আমি তো সাগরের কিছু নোনা জল সংগ্রহ করতে পেরেছি", তার প্রতিউত্তরে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, তথাকথিত সাগরের জল নোনা হতে পারে কিন্তু বিদ্যাসাগরের জল কখনো নোনা হতে পারে না |

এতো কর্মকান্ডের মাঝে ১৮৯১ সালের ২৯ শে জুলাই মাত্র ৭০ বছর বয়সে বিদ্যাসাগর কলকাতায় শেষ নিঃস্বাস ত্যাগ করেন | বাংলা, ভারত তথা বিশ্বের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন তার কর্মকান্ডের ভিতর দিয়ে, ২০০৪ সালে তিনি বিবিসি র দ্বারা বাঙালির নবন সর্বকালের সেরা বাঙালি হিসেবে উল্লিখিত হন, ১৮৭৭ সালে তিনি “Companion of the Indian Empire” উপাধি পান, তাকে স্মরণীয় করে রাখতে ভারতীয় ডাক তার নামে স্ট্যাম্প চালু করেন, কলকাতার দ্বিতীয় হুগলি সেতু বিদ্যাসাগরের নামে উৎসর্গ করা হয়, বিখ্যাত চিত্রপরিচালক কালী প্রসাদ ঘোষ "বিদ্যাসাগর" নামে একটি চলচিত্র তৈরী করেন যেখানে তার জীবন কাহিনী ও কর্মকান্ড তুলে ধরা হয়|

বিদ্যাসাগর এক সীমাহীন নাম, এই দুটো পৃষ্ঠায় তার কথা তুলে ধরা খুব ই এক কঠিন কাজ, তাও খুব সংক্ষেপে তার কিছু কথা আপনাদের সামনে লিপিবদ্ধ করলাম, আজকের দিনে আমরা যদি বিদ্যাসাগরের ভাবনার কিছুটা আরো বাস্তব রুপদিতে পারি, তাতে তার কর্মকান্ড সার্থক হবে, আমরা বাঙালি হিসেবে চিরকাল গর্বিত থাকবো বিদ্যাসাগরের জন্য |

রবীন্দ্রনাথের টাইম ম্যানেজমেন্ট ও ডক্যুমেন্টেশন

ডা. পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার

নানা সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের বহু খবর আজ আমাদের অজানা নেই। তাঁর অসংখ্য চিঠি, যেগুলি তিনি লিখেছেন দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনীয় এমনকি নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ঘটনার উল্লেখ করে, তাঁকে কেন্দ্র করে বহু মুগ্ধ মানুষের স্মৃতিচারণা, তাঁর ভ্রমণ কথা, ঠাকুরবাড়ির রোজকার হিসাবের খাতা ইত্যাদি উপকরণ থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবন ও দর্শনের একটি ছবি তৈরি নিতে পারি আমাদের মনের পাতায়। ভেবে অবাক হতে হয় কী অসাধারণ নিপুণতায় এবং যত্নে কবি নিজেকে প্রকাশ করে গিয়েছেন এইসব মূল্যবান উপকরণগুলি মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুদূরদর্শী। আজ থেকে দেড়শ বছর আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নিজেকে মহাকালের খাতায় চিরন্তন করে রাখবার জন্য ডকুমেন্টেশন এবং টাইম ম্যানেজমেন্টের গুরুত্ব কতখানি। তাঁর প্রতিটি কাজই ছিল ছন্দোবদ্ধ। তিনি যখনই কিছু লিখেছেন, তার সন-তারিখ-স্থান ইত্যাদির উল্লেখ রেখেছেন। সেটা গান, কবিতা, চিঠি, প্রবন্ধ যাইই হোক না কেন। অথচ সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই নিজের জীবনপঞ্জি বা ডায়ারি লেখা পছন্দ করতেন না। তাঁর কথায় 'যে-সব কথা ভুলে যাবার সে-সব কথা জমিয়ে রাখবার চেষ্টাই করি নি; যে-সব কথা না ভোলবার সে-সব তো মনে আপনিই আঁকা থাকে।' ডায়ারি বা জীবনপঞ্জি না লিখলেও রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বছরের বৃত্যান্ত লিখে গিয়েছেন তাঁর জীবনস্মৃতি বইতে। যদিও মীরা দেবীকে লিখেছেন, 'কোনো দিন আমি সময় ঠিক মনে রাখতে পারিনে। আমার চিঠির তারিখের সঙ্গে পাঁজির তারিখের সর্ব্বদা কি রকম অনৈক্য হয় সে তো তোরা জানিস্। ইস্কুলে ইতিহাসে কোনোদিন আমি খ্যাতিলাভ করতে পারিনি। .... অতএব আমার জীবনচরিত তারিখ সম্বন্ধে একেবারে নিষ্কণ্টক হয়েই প্রকাশ হবে।' আসলে প্রায় পৌঢ় বয়সে কবি যখন ধূসর শৈশবের ইতিহাস রচনা করছেন তখন দিন-তারিখের হিসাবে কিছু গণ্ডগোল হতেই পারে। জীবনস্মৃতি প্রকাশ এবং সম্পাদনার সময় যাঁরা সহায়তা করেছেন রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ আস্থা ছিল যে, সন-তারিখের যাবতীয় বিভ্রান্তির তারা নিরসন করবেনই। অথচ রবীন্দ্রনাথই আবার য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়রি, জাপান যাত্রী, রাশিয়ার চিঠি ইত্যাদি প্রবন্ধে তাঁর বিভিন্ন বিদেশভ্রমণের নানা ঘটনা, অভিজ্ঞতা আর নিজের পর্যালোচনা লিখে গিয়েছেন। এগুলি আজ আমাদের কাছে রত্নখনির মত মূল্যবান। লক্ষ করবার বিষয় রবীন্দ্রনাথ যখন যা রচনা করেছেন, গান-কবিতা-গল্প-নাটক, যাইই হোক না কেন সাথে সাথে সেটি সংরক্ষণের উদ্দ্যোগ নিয়েছেন। গান রচনার পরেই, দিনেন্দ্রনাথ বা অন্য কারও সাহায্যে তাতে সুর দিয়ে, গেয়ে এবং অন্যকে দিয়ে গাইয়ে নিয়েছেন। গল্প লেখবার পরেই সেটি অন্যদের পড়ে শুনিয়েছেন, ছাপানোর ব্যবস্থাও করেছেন। নাটক লিখেই তোড়জোড় করেছেন তার অভিনয় আর মুদ্রণের। কিছু কবিতা লেখা হয়ে গেলেই কাব্যগ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এই তৎপরতা আর ধারাবাহিকতাতার জন্যই রবীন্দ্রনাথ আজও অবিনশ্বর হয়ে রয়েছেন। ১৮৭৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বোম্বাই থেকে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন পাড়ি দিয়েছিলেন বিলেতে পড়াশুনা করবার উদ্দেশ্যে। সেই যাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তিনি লিখেছেন তাঁর য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে। সেই অসামান্য বর্ণনার একটু নমুনা দেখে নেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথ সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখে বোম্বাই থেকে রওনা দিয়ে, ২৮ তারিখে এডেন বন্দর ছাড়িয়ে, অক্টোবরের ৩ তারিখে সুয়েজ অতিক্রম করে, ৮ তারিখে ইটালির ব্রিন্দিস হয়ে, ৯ তারিখে প্যারিস ছুঁয়ে ১০ তারিখে লণ্ডন পৌঁছে ব্রাইটনে জ্ঞানদানন্দিনীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলে। প্রতিদিনের এই চলার পথের নানা ছোটোখাট ঘটনা, প্রকৃতি বন্দনা আর নিজের কথাও লিখে গিয়েছেন পাশাপাশি। এই ভ্রমণের প্রতিটি দিনের রোজনামচার খবর আজ আমারা প্রায় সবাই জেনে গিয়েছি নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিপত্র আর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত পাল ও অন্যান্য গবেষকদের কাছ থেকে। এছাড়াও দেশবিদেশের সফরসঙ্গী হিসাবে বহু ভাগ্যবান মানুষ কবিকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাঁকে ঘিরে থাকা মানুষজনের স্মৃতিকথায়

রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি দিনের বহু খুঁটিনাটি ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে মাধুরীলতা ওরফে বেলার বিয়ের কথাটাই ভাবুন না। ১৯০১ সাল। বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র সুদর্শন, বিনয়ী, বিলেত ফেরত শরৎকুমারকে কবি পছন্দ করলেন বেলার ভাবী স্বামী হিসাবে। কিন্তু পাত্রপক্ষ কুড়ি হাজার টাকা বরপণ চেয়ে বসলেন। আর্থিক অনটনে জর্জরিত রবীন্দ্রনাথের কাছে সেটা ছিল সাধ্যের অতীত। শেষে অনেক টানাপোড়েন, অবিশ্বাস, লাঞ্ছনা আর অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আত্মসমর্পন করতে হয়েছিল পাত্রপক্ষের কাছে। দশ হাজার টাকার রফায় মেয়েকে তুলে দিতে হয়েছিল শরতের হাতে। আর ১২২ বছর আগেকার এই দুর্বিষহ বিয়ের প্রত্যেকটা খবর আমরা জেনে ফেলেছি তখনকার বিভিন্ন লেখা, চিঠিপত্র আর স্মৃতিকথা থেকে। ১৮৯৯ থেকে ১৯০৮ সাল, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবচেয়ে ব্যাস্ত আর কঠিন লড়াইয়ের সময়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ছাত্র আর শিক্ষক সংগ্রহ করা, নিরন্তর ছোটাছুটিতে এক মুহূর্ত সময় নেই। একই সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যবসার ক্ষতি, টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানীর পতনের ফলে বিশাল ঋণের বোঝা মাথার উপরে। এই চূড়ান্ত অনটনের মধ্যেই হানা দিয়েছে একের পর এক মৃত্যু। কে নেই সেই তালিকায়? বলেন্দ্রনাথ, নীতিন্দ্রনাথ, নিজের স্ত্রী, মেজমেয়ে রেণুকা, বাবা দেবেন্দ্রনাথ, আদরের ছোটো ছেলে শমী এবং আরও অনেকে। একই সঙ্গে রচনা কর চলেছেন অসংখ্য গান-কবিতা, প্রবন্ধ, স্মরণ, শিশু, উৎসর্গ, খেয়া ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ। সঙ্গের দোসর আশেপাশের মানুষের সমালোচনা, বিদ্রুপ আর অসহযোগিতা। এই জটিল সময়ের প্রায় প্রতিটা দিনের সমস্ত খবরও কিন্তু আজ আমাদের অজানা নেই। এগুলি সম্ভব হয়েছে তাঁর সঠিক এবং বৈজ্ঞানিক ডকুমেন্টেশনের জন্যই। শোকের সঙ্গেই যেন কবির বসবাস। শ্রী প্রশান্ত পাল লিখেছেন, 'শোকের উচ্ছসিত প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।' একের পর এক প্রিয়জনের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের জীবনে ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য স্থৈর্যের সঙ্গে তিনি সেই শোক নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ রেখে ঈশ্বর নির্ধারিত কাজগুলি করে গিয়েছেন নিঃশব্দে এবং যথাযথ সময়-সারণি অনুসরণ করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ জীবনটাই ডকুমেন্টেড হয়ে রয়েছে। নানা মাধ্যম থেকে আমরা জেনে নিতে পারি তাঁর যে-কোনো একটি দিনের ঘটনাপঞ্জী। তাঁর সঙ্গে কবে কোথায় কার সাক্ষাত ঘটেছিল, কোন সভায় তিনি কি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাঁর জন্মদিনগুলি কিভাবে পালন করা হত, শান্তিনিকেতন আশ্রমে তাঁকে ঘিরে কবে কি ঘটনা ঘটেছিল ইত্যাদি তথ্যগুলি আজ অতি সহজে আমাদের নজরে আসে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমসময়ে কিম্বা তার পরে আর কারও জীবনের এই ধরণের বিবরণ আমরা আর দেখতে পাই না। রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি, চিত্রকলা, সিনেমা নাটক, রাজনীতি ইত্যাদিতে উজ্জ্বল সাক্ষর রেখে গিয়েছেন। তাঁরা সকলেই আমাদের প্রণম্য। কিন্তু তাঁদের কর্মজীবনের নানা বৃত্যান্তের খুঁটিনাটি বর্ণনা আমরা তেমনভাবে জানতে পারিনা, যেমনটা পাই রবীন্দ্রনাথের জীবন থেকে। এর কারণ কি? আমার মনে হয় মনে হয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি আর মানুষের ব্যস্ততাই এর জন্য দায়ী। রবীন্দ্রনাথের সময়ে মানুষের জীবন ছিল আজকের চাইতে অনেক সহজ-সরল। ছিল না মোবাইল ইন্টারনেটের মত মাধ্যম যা সব সময় মানুষের মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটায়। তাছাড়া কবির উজ্জ্বল ব্যাক্তিত্ব, আভিজাত্য আর চোখধাঁধানো দেবসুলভ সৌন্দর্যের আকর্ষণে তাঁকে ঘিরে থাকতেন অসংখ্য অনুরাগী আর সেক্রেটারিরা। তারা রবীন্দ্রনাথের প্রতিদিনের নানা ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তাদের ডায়ারি, চিঠিপত্র আর নানা লেখা আর স্মৃতিকথায়। আজকের দিনে কোথায় সেই নিবেদিত-প্রাণ,একান্ত অনুরক্ত সেক্রেটারিরা, কোথায় বা সেই সারাদিন ঘিরে থাকা ভক্তকুল? যারা থাকেন তাদের বেশীরভাগই থাকেন নিজেদের স্বার্থের জন্যই। তখন মানুষের হাতে ছিল অঢেল সময়। ইন্টারনেট আর মোবাইল-কম্পিউটারের দাপটে আজকের আর্থ-সামাজিক ছবিটা একেবারেই বদলিয়ে গিয়েছে। চিঠি লিখে যোগাযোগ করা বা নিজের ভাবনা শেয়ার করবার তো প্রশ্নই ওঠেনা। আসলে আমরা চিঠি লিখতেই ভুলে গিয়েছি। সেই জায়গার দখল নিয়েছে ইমেল আর হোয়াটস অ্যাপ। এতে কাজ দ্রুত হয় বটে, কিন্তু তা হারিয়ে হয়ে যায় কিছুদিনের মধ্যেই, জমিয়ে

রাখা যায় না ভবিষত্যের জন্য। অথচ ইতিহাসের নিরিখে চিঠির গুরুত্ব অসীম। চিঠি সময়ের দলিল, একজন মানুষের আত্মপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম, সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকার বিশ্বস্ত দর্পণ। চিঠিকে বলা হয় 'ইতিহাসকে ফিরে দেখার অন্যতম উপকরণ'। তাই চিঠি বা ছাপার আকারে বই কিম্বা পত্রপত্রিকাই একমাত্র পারে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির কর্মজীবনের খুঁটিনাটিকে চিরদিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে। অনেকে অবশ্য ডায়ারি লিখে থাকেন। কিন্তু আজকের যুগে কারও পক্ষেই সেই অভ্যেস বেশিদিন টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। আর একটি উপায় রয়েছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রোজকার ঘটনা, তথ্য ইত্যাদি ক্লাউড বা কোনো সার্ভারে ধরে রাখা। তবে এর জন্য দরকার সঠিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেগুলির যথাযত সংরক্ষণ এবং একজন নিঃস্বার্থ সহকারীর। আর একটি কথা আজকাল অনেকেই বলে থাকেন, এবং সেজন্য আত্মশ্লাঘা আর গর্ববোধও করেন। সেটি হল ব্যস্ততা। যেমন 'আজ আমি ভীষণ ব্যাস্ত', 'না রে যেতে পারছি না- অফিসে খুব ব্যস্ত থাকতে হবে', 'অমুক ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট তিন মাসের আগে পাওয়া যাবে না – খুব ব্যস্ত ডাক্তার কিনা' ইত্যাদি। এসব কথা আজকাল প্রায় সবার মুখেই শোনা যায়। জীবন ধারণের প্রতিযোগীতায় মানুষ আজ সত্যিই দিশাহারা। নিজের জন্য আমাদের সময় কোথায়? অকারণে জানলার কপাট খুলে দূরের আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখা, কিম্বা বাদলার দিনে বৃষ্টির ফোঁটার দিকে চেয়ে থাকা আজকাল প্রায় অসম্ভব। যদিও বা চেয়ে থাকেন, প্রিয়জনেরা আপনার মানসিক সুস্থতা নিয়ে ভাবনা শুরু করবেন। শুধু নিজের জন্য নয়, বন্ধু-পরিজনদের সঙ্গে আড্ডা আলোচনা তর্ক ইত্যাদির সময়ও আজ আমাদের অবশিষ্ট নেই। কিন্তু সত্যিই কি আমরা এতটাই ব্যাস্ত? মনে রাখতে হবে আজ আমাদের দিনের জন্য বরাদ্দ সময়ে বেশ কিছুটা ভাগ বসিয়েছে ফেসবুক ইউটিউব ইত্যাদি স্যোশাল মিডিয়াগুলি। সেগুলিকে এড়িয়ে চলতে পারলে, সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে, নিশ্চয়ই সময়ের কিছুটা সাশ্রয় হত। আবার অনেকের কাছে ব্যস্ততা একধরণের স্ট্যাসাস সিম্বল। তাদের ধারণায় নিজেকে খুব বেশী ব্যস্ত দেখানো গেলে- বন্ধুবান্ধবদের কাছে থেকে বেশি বেশি কদর আর সমীহ আদায় করা যায়। । আর রবীন্দ্রনাথের কালে? তখন মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠে, আয়েশ করে গড়গড়ার নলটি মুখে নিয়ে আড্ডা দিতে দিতে দিন শুরু করতেন। কাজকর্ম চলত অলস ঢিলে গতিতে। দুপুরের গুরুভোজনের পর সুখের দিবানিদ্রা, বিকালে কিছু আমোদপ্রমদ আর দিনান্তে নৈশভোজনের শেষে রাতের গাঢ় ঘুম- এই ছিল মোটামুটি তাদের রোজকার ছবি। একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি দিনের কাজের রুটিন দেখে নেওয়া যাক। ১৯০১ সালের ১৮ জানুয়ারি কলকাতা থেকে চিঠি লিখে তিনি শিলাইদহে স্ত্রীকে সারাদিনের কাজের হিসাব দিয়েছেন। হিসাবটাতে একবার চোখ বোলানো যাক। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরেই মাঘোৎসবের গানের মহড়া সেরে অমলা দাশের বাড়ি গেলেন, সেখান থেকে বির্জিতলার বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে বালিগঞ্জে সরলা দেবীর বড়িতে অনেক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তাঁকে না পেয়ে, তারকনাথ বাবুর সঙ্গে পুরীর বাড়ি সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা হল। তারপর বাড়ি ফিরে বেশ কিছু সাক্ষাতপ্রার্থীর সঙ্গে মোলাকাত। আবার চল্লেন বালিগঞ্জে সরলাকে গান শেখাতে। তারপরে আর একবার যেতে হল সংগীতসমাজে। সেখান থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত দুপুর হয়ে গেল। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি লিখে ফেলেছেন মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে শোক জ্ঞাপন করা প্রবন্ধ, প্রবাসী পত্রিকার জন্য কবিতা ইত্যাদি। এ কিন্তু মাত্র একদিনের গল্প নয়। এই রুটিন প্রায় প্রতিদিনেরই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন নিজের ব্যস্ততা জাহির করেন নি। বরং বলতেন আমি 'অকাজের কাজে ব্যস্ত আছি'। আজ আমরা সময়ের দোহাই দিয়ে নানা সামাজিক কর্তব্য এড়িয়ে চলি। যেখানে স্বার্থ বা লাভের ভাঁড়ার শূন্য সেখানেও আমাদের বাহানা সেই ব্যস্ততা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? নোবেল প্রাইজ পাবার পর শান্তিনিকেতনে বিতর্কিত সংবর্ধনার পরের দিনেই তিনি শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন তাঁর এক আত্মীয়ের বিয়েতে পৌরহিত্য করতে। সেটি এমন কিছু দরকারি কাজ ছিল না। ১৯২২ সাল্। কলকাতার অলফ্রেড থিয়েটারে শারদোৎসব অভিনয় চলছে প্রচণ্ড উৎসাহ আর উদ্দীপনায়। নাটক পরিচালনা আর যাবতীয় ব্যবস্থাপনার গুরু দায়িত্ব নিতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকেই। তার মধ্যেই, গড়পাড়ের অসুস্থ

সুকুমার রায়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন তাঁকে দেখতে আর গান শোনাতে। অথচ তার আগের দিনই শান্তিনিকেতনে মৃত্যু হয়েছে দিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। আবার পরের দিনই ছিল দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের পরিকল্পনা। এ ধরণের অসংখ্য ঘটনা ছড়িয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনে – ব্যাস্ততার নামগন্ধ ছিল না সেখানে। আসলে রবীন্দ্রনাথের জীবন ছিল অসম্ভব ডিসিপ্লিন্ড। সময়ের ব্যবহারের বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল স্পষ্ট। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সূর্য প্রণাম সেরে, সতীর্থদের সাথে নিয়ে চা পান করেই বসে যেতেন লেখার টেবিলে। সারাটা দিন কেটে যেত অসংখ্য চিঠির জবাব লিখে। চলত গানের মহড়া, ছেলেদের ক্লাস নেওয়া, সাক্ষৎপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করা, গান কবিতা রচনা, প্রবন্ধ লেখা, ভাষণ তৈরি করা ইত্যাদি অবিরাম হাজারো কাজ। যখন যে কাজে হাত দিতেন অখণ্ড একাগ্রতাই সেটি সম্পূর্ণ করে তবে নিশ্চিন্ত হতেন। একই রুটিন মেনে চলতেন দেশবিদেশের ভ্রমণেরও। আজকের ছুটে চলা জীবন নানা ঘটনার সংঘাতে আলোড়িত, বিভ্রান্ত। মোবাইল ফেসবুক ইত্যাদির বেড়াজালে আজ একাগ্রচিত্তে কোনো কাজ সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব। একটা কাজ করতে করতে হাজার চিন্তা মাথার মধ্যে ভীড় করে আসে। বই পড়তে পড়তে চোখ চলে যায় ফেসবুকের নোটিফিকেশনে। একটা প্রোজেক্ট শুরু করলে বার বার কাজে বাধা পড়ে। মনোনিবেশের এই ব্যার্থতার জন্য কোনো কাজই ঠিক মত শেষ হতে না। তাই আমার মতে সঠিক টাইম ম্যানেজমেন্ট, নিজের কাজের প্রতি সততা, ভালোবাসা আর পরিশ্রমই এনে দিতে পারে কাঙ্ক্ষিত সার্থকতা, যার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন নিজের জীবনধারাতে।

সাধারণ মানুষের অসাধারণ সংস্থা - ISRO

ডঃ সরিৎ দাস

চন্দ্রায়ন-৩-এর সফল অবতরণ চতুর্দিকে হৈ হৈ ফেলে দিয়েছে। টিভি এবং ইন্টারনেট ছেয়ে গেছে তার ছবি, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং ইতিহাস সন্ধানে। এত তথ্য এবং বিশেষজ্ঞদের কথনের মাঝে আমি তার ওপরে আরও একটি প্রবন্ধ লিখতে চাইনা। ISRO-র ইতিহাসও অনেকেরই জানা, তা নিয়েও আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। আমার উদ্দেশ্য এই সংস্থাটির কিছু অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য যা আমার মতে এর উত্তরণ তথা সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে ,তা সামনে আনা। আমি ISRO-তে কাজ করিনি, তবুও এর সাথে কিছু প্রজেক্টে জড়িয়ে থেকে এং বন্ধুবান্ধবের বা ছাত্র যারা ISRO তে সরাসরি কাজ করেছেন তাদের সাথে বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় যে বৈশিষ্ট্যগুলো বেরিয়ে এসেছে , এখানে তারই কিছুটা বর্ণনা করার চেষ্টা করবো। পাঠক মার্জনা করবেন যদি তা আপনার জানা তথ্যের পুনরুক্তি হয়, কারণ আমার উদ্দেশ্য তথ্যের ভিত্তিতে ISRO-র মূল্যায়ণ নয় বরং একটি সংস্থার সেই প্রাণবায়ুর অন্বেষণ করা যা অতি সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও সংস্থাটিকে অসাধারণ সাফল্য অর্জনের শক্তি যুগিয়েছে।

ইতিহাসের টুকরো - সারাভাই, ধাওয়ান

আগেই বলেছি ISRO-র ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু ভারতবর্ষের মহাকাশ গবেষণার কোনও আলোচনাই সম্পূর্ণ হবে না যদি না দুটি মানুষের অবদানের কথা উল্লেখ করা না হয় - বিক্রম সারাভাই এবং সতীশ ধাওয়ান। এঁরা শুধু এদেশে মহাকাশ গবেষণার পথিকৃত নন, তার কারিগর এবং স্বপ্নদ্রষ্টা। ভারতে মহাকাশ গবেষণা স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে শুরু হয়নি। প্রথমে তা ছিল পরমাণু গবেষণা সংস্থার (Atomic Energy Commission) অধীনে একটি বিভাগ। বিভাগটির নাম ছিল Indian National Committee for Space Research যা ১৯৬৩ সালে বিক্রম সারাভাইয়ের নেতৃত্বে শুরু হয় এবং ১৯৬৯ সালে পৃথক সত্ত্বায় ISRO হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বিক্রম সারাভাই ছিলেন দূরদর্শী ও মেধাবী বিজ্ঞানী। আমেদাবাদের এক বস্ত্রশিল্পের শিল্পপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ব্যবসার চাইতে বিজ্ঞানের প্রতি বেশী সমর্পিত ছিলেন সারাভাই। বিক্রম কেম্ব্রিজের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রির জন্য ভর্ত্তি হলেন, তার ভর্ত্তির জন্য সুপারিশ পত্রটি লিখে দিয়েছিলেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। এরপরে ১৯৪০-এ স্নাতক এবং ১৯৪৫-এ মহাজাগতিক রশ্মির (cosmic ray) ওপর ডক্টরেট পেলেন তিনি। দেশে ফিরে আমেদাবাদের ভৌতিক গবেষণা কেন্দ্র (Physical Research Laoratory বা PRL) স্থাপন করেন তিনি মাত্র ২৮ বছর বয়সে। এই সময় থেকেই হোমি ভাবার সাথে তার সখ্যতা। তার কারণ দুজনেরই গবেষণার বিষয় ছিল মহাজাগতিক রশ্মি। মনে রখা দরকার হোমি ভাবা কিন্তু পরমাণু গবেষণার মানুষ ছিলেন না বরং তা ছিলেন মেঘনাদ সাহা কিন্তু আর্থিক এবং রাজনৈতিক কারনে বঞ্চিত হন। সে অন্য এক গল্প। বিক্রম সারাভাই ভারতের মহাকাশ গবেষণার লক্ষ্য নিয়ে অত্যন্ত অভিনব এক চিন্তাধারার পথিকৃত ছিলন। ৬০ এর দশকে একদিকে সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে মহাকাশ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে প্রশ্ন উঠেছে ভারতের মতো সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অর্ধভুক্ত দেশে মহাকাশ গবেষণা কি

গরীবের ঘোড়া কেনার শখের মতো রোগ? সারাভাই কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে এর জবাব দিয়েছিলেন, তাঁর কথায়ঃ

"এমন অনেকে আছেন যারা একটি উন্নয়নশীল দেশের মহাকাশ গবেষণা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আমাদের কাছে এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত নেই। আমাদের উদ্দেশ্য অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলোর সাথে চাঁদ অন্যান্য গ্রহে অনুসন্ধান অথবা মহাকাশে মানুষ পাঠানোর প্রতিযোগিতায় জড়ানোর মত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভর করে নেই। কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে আমরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে চাই, তবে আমাদের মানুষ এবং সমাজের কল্যাণের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহারে সবার আগে থাকতে হবে।"

আজ আমরা চন্দ্রায়ণ বা মঙ্গলায়ণের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হলেও মনে রাখতে হবে, ISRO কিন্তু আজ অবধি বিক্রম সারাভাইয়ের এই দিশাকেই অনুসরণ করেছে। ভারত এবং তার মানুষের প্রয়োজনেই ভারতের মহাকাশ গবেষণা নিবেদিত করেছে। প্রমাণ হিসেবে বলা যায় বিক্রম সারাভাই নিজে আমেরিকান মহাকাশ সংস্থা NASAর সাথে সমঝোতা স্বাক্ষর করেছিলেন, উপগ্রহের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার জন্য। আজও ISROর অধিকাংশ মিশনই আবহাওয়ার পূর্বাভাষ, কৃষিকাজের সহায়তা, মৎসজীবীদের সাহায্য ও সতর্কবার্তা, টেলি যোগাযোগ, দূরদর্শন ও বেতার প্রচার, সামরিক বাহিনীর সহায়তা ইত্যাদি সামাজিক প্রয়োজনেই উৎসর্গিত।

দুঃখের কথা বিক্রম সারাভাই বেশিদিন বাঁচেন নি। ১৯৭১ সালে মাত্র ৫২ বছর বয়সে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয় ভারতবর্ষের প্রথম উপগ্রহ আর্যভট্টের উৎক্ষেপনের প্রস্তুতি যখন চূড়ান্ত পর্বে। যে কাজ শুরু হয়েছিল ত্রিবান্দ্রমের কাছে থুম্বা গ্রামের পরিত্যক্ত একটি গির্জায় স্থাপিত সারাভাইয়ের অফিসের মাধ্যমে এবং যার প্রথম ক্ষুদ্র রকেটটি গরুর গাড়িতে করে বহন করা হয়েছিল উৎক্ষেপনের জন্য, সেই সংস্থার আজকের ISRO হয়ে ওঠার পেছনে যেমন রয়েছে হাজার হাজার বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের অবদান তেমনি রয়েছে কিছু নির্ভীক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রশাসকের নেতৃত্ব। সারাভাই নিজেই আমলাতান্ত্রিকতার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "সহযোগিতামূলক সংগঠন কখনই বিশাল আমলাতন্ত্রকে উৎসাহ দেয় না, কারণ তা জানে যে অতিকায় আমলাতন্ত্র কখনই মানুষের প্রয়োজনের প্রতি সচেতন হয় না।" তাই আজও ভারতের সরকারি মহাকাশ বিভাগের সচিব হন ISRO-র চেয়ারম্যান, পদাধিকার বলে, কোনও IAS অফিসারের ধরাছোঁয়ার বাইরে তা।

পরবর্ত্তীকালে বিজ্ঞানী MGK মেনন সহ অনেক উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীই ISRO কে নেতৃত্ব দিয়েছন, কিন্তু তার মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। আমেরিকার NASA- র সঙ্গে যুক্ত California Institute of Technology বা Caltech থেকে Aerospace বিভাগে Ph.D. করে অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান দেশে ফিরে বাঙ্গালোরে Indian Institute of Science (IISc) - এ অধ্যাপনা করছিলেন। তিনি ক্রমে তার ডিরেক্টর পদ গ্রহন করেন ১৯৬২ সালে। ১৯৭২ সালে তিনি ISRO-র চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত হন। এ বিষয়ে একটি ঘটনা তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তাকে নির্দেশ করে। ১৯৭১-৭২ সালে তিনি ভিসিটিং প্রফেসর হিসেবে Caltech-এ গিয়েছিলেন। তখনই একদিন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ফোন আসে যে দোর্দন্ডপ্রতাপ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ISRO নিয়ে তাঁর সাথে তখনই কথা বলতে চান। সতীশ ধাওয়ান নির্লিপ্তভাবে জবাব দেন, "আমি এখন ক্লাস নিতে যাচ্ছি, প্রধানমন্ত্রীকে বলুন আমাকে ক্লাসের পরে ফোন করতে।" প্রধানমন্ত্রীর সচিব জবাব শুনে হকচকিয়ে যান। পরে প্রধানমন্ত্রী ফোন করেছিলনে ISRO-র চেয়ারম্যান হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে। উত্তরে ধাওয়ান তিনটি শর্ত দেন - প্রথমত, তিনি

IISc-র ডিরেক্টরের পদেও একইসঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকবেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর কাজের সুবিধার জন্য ISRO-র হেড কোয়ার্টার হব ব্যাঙ্গালোরে, দিল্লিতে নয় (আজও তাই আছে।) এবং তৃতীয়ত, কোনওরকম আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করবেন না। বলা বাহুল্য, সমস্ত শর্ত মেনে নিয়েই তাঁকে নিয়োগ করা হয়।

সতীশ ধাওয়ান বুঝেছিলেন যে শুধু উপগ্রহ তৈরি করলেই হবে না তাকে উৎক্ষেপন করার রকেটও আমাদেরই বানাতে হবে। তিনিই ISRO-র Launch Vehicle প্রযুক্তির জনক আর তাই আজ শ্রীহরিকোটার উৎক্ষেপন কেন্দ্রে নাম সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র এবং সেই রকেট তৈরী হয় থুম্বার কাছের ISROর বিরাট কেন্দ্রে যার নাম বিক্রম সারাভাই মহাকাশ কেন্দ্র (VSSC)। কেমন প্রশাসক ছিলেন সতীশ ধাওয়ান তার এক চমৎকার উদাহরণ পেশ করেছেন আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে. আব্দুল কালাম। রকেট SLV-র(Satellite Launch Vehicle) উৎক্ষেপন হচ্ছিল, প্রজেক্ট ডিরেক্টর আব্দুল কালাম। শেষ মুহূর্তে জ্বালানীর ট্যাঙ্কে ছোট একটি লিক ধরা পড়ল, কালাম ভাবলেন সামান্য লিক, ওতে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু রকেট গিয়ে পড়ল বঙ্গোপসাগরে - মিশন অসফল। ক্ষিপ্ত সাংবাদিকদের সামনে সতীশ ধাওয়ান কালামকে মুখ খুলতেই দিলেন না। সব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে বললেন, "আমরা অসফল হয়েছি কিন্তু আমার সহকর্মীদের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে, আগামীবার ওরা নিশ্চয়ই সফল হবে।" পরের বছর আবার উৎক্ষেপন এবং এবার সফল হল SLV। ধাওয়ান সাংবাদিক সম্মেলনে গেলেনই না। পাঠালেন আব্দুল কালামকে - এই হচ্ছেন নেতা, যিনি ব্যর্থতার ভার নিজের ঘাড়ে নেয় কিন্তু সাফল্যের কৃতিত্ব দেন সহকর্মীরদের, নিজে পেছন থেকে।

অসাধারণ সংস্থা

ওপরের অতীত ঘাঁটার মূল উদ্দেশ্য হল এটা দেখানো যে ISRO জন্মলগ্ন থেকেই এক বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি দ্বারা চালিত, যার কান্ডারীরা ছিলেন বিজ্ঞানে সমর্পিত প্রাণ। নিজস্ব মেধার জোরেই তাঁরা ছিলেন অকুতোভয়, আর তাই তাঁরা আমলাতন্ত্র বা রাজনৈতিক শক্তির কাছে মাথা নত করেন নি। পরবর্ত্তী সময়ে সবাই যে এই পথকে সঠিকভাবে পালন করেছেন, সেটা জোর দিয়ে বলা না গেলেও এই সংস্থায় একটা বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডল তৈরি হয়েছে যা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ইসরোতে প্রায়শই সমস্ত কর্মীদের সভা হয় বিভিন্ন কেন্দ্রে। যেখানে একজন জুনিয়র টেকনিশিয়ানও সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তা বা বিজ্ঞানীদের টেকনিক্যাল বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন। ভারতবর্ষেই শুধু নয় এমনকি বিদেশেও এমন চল খুব কম জায়গাতেই আছে। মনে করা যেতে পারে ১৯৮৬-এ NASA-র চ্যালেঞ্জার মহাকাশযান উৎক্ষেপনের ৭৩ সেকেন্ড বাদে ভেঙে পড়ে এবং নিহত হন সাতজন মহাকাশচারি। দুর্ঘটনার তদন্তকারী দলে ছিলেন সর্বকালের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান। তিনি দেখান যে ঠান্ডায় শক্ত হয়ে যাওয়া একটি রবারের সিলের জন্যই এই দূর্ঘটনা হয়। শুধু তাই নয়, NASA-র আমলাতান্ত্রিক গঠনে নিচের স্তরের বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের সতর্কতাকে অগ্রাহ্য করাই এধরণের দুর্ঘটনার কারণ। তাঁর এই অভিমতকে তদন্তকারীদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা চেপে দেওয়ার চেষ্টা করায় তিনি তার রিপোর্টে সই করতে অস্বীকার করেন। পরে অবশ্য তাঁর মতামত রিপোর্টে যুক্ত করা হয়। এদিক থেকে ISRO শুরু থেকেই অনেকটা খোলামেলা সংস্কৃতির বাহক। বর্ত্তমান লেখক ISRO-র বহু বিজ্ঞানীর পদোন্নতির ইন্টারভিউয়ে তথা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আলোচনাতে বিশেষজ্ঞ হিসবে অংশগ্রহণ করে অনুভব করেছেন যে সেখানে প্রযুক্তি বা বিজ্ঞানগত প্রশ্নকে কখনই প্রশাসনিক কারণে এড়িয়ে যাওয়া হয় না, এমনকি ওপরের দিকের প্রতিজন বিজ্ঞানীর পদোন্নতির ইন্টারভিইউয়েই সভাপতিত্ব করেন ISROর

চেয়ারম্যান স্বয়ং এবং আমরা যারা বাইরের বিশেষজ্ঞ হিসেবে যাই তাদেরকে কার্যত ভিটো ক্ষমতা দেওয়া হয়।

কিন্তু তার চাইতেও বড় বিষয়টি গত কয়েক দিনেও উঠে এসেছে তা দিয়েই এ প্রবন্ধের শীর্ষক করেছি। কথাটা বলেছিল আমার বন্ধু তপন মিশ্র। তপন আমার জীবনে দেখা সবচাইতে ব্রিলিয়ান্ট মস্তিষ্ক বললেও অত্যুক্তি হবে না। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম দশে থাকা, পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্সে প্রথম, এমনকি IIT JEE তেও উচ্চস্থান পাওয়া তপন, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী ছিল। অমন ক্ষুরধার মেধা আমি সারাজীবনে আর দেখিনি। তপন ISRO-তে চাকরি নেয় এবং আমেদাবাদের SAC (Satelite Application centre) -এর ডিরেক্টর হয়েছিল। ISRO-র চেয়ারম্যান দৌড়েও ছিল সে, কিন্তু সে অন্যপ্রসঙ্গ। আমি IIT Ropar-এর ডিরেক্টর থাকাকালীন তপনকে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত কররা জন্য একটি বক্তৃতা দিতে ডাকি। ওই বক্তৃতাতেই তপন বলে, " ISRO is an extraordinary organization of very ordinary people." অর্থাৎ ISRO সাধারণ মানুষদের একটি অসাধারণ সংস্থা।

বক্তব্যটিকে একটু খুলে ব্যাখ্যা করা যাক। ভারতবর্ষে প্রযুক্তি বা ইঞ্জিনিয়ারিংই সেরা ছাত্রদের পছন্দের পাঠ্যক্রম। সেই সেরাদের সেরারা যান IIT বা NITগুলোতে। নিদেনপক্ষে আন্না ইউনিভার্সিটি বা যাদবপুরের মতো নামী কলেজগুলোতে।

ISRO-র বিজ্ঞানীদের মধ্যে আপনি এই ধরণের নামী দামী স্থানের থেকে গ্র্যাজুয়েশন করা বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদ খুঁচিত পাবেন। যেমন ধরুন প্রচারের কেন্দ্রে থাকা ISRO-র চেয়ারম্যান এস, সোমনাথ হলেন কোল্লাম-এর (কেরালা) টি.কে.এম কলেজের থেকে B.Tech (Mechanical Engineering) ছাত্র। চন্দ্রায়ণ ৩-এর মিশন ডিরেক্টর রিভু কারিধাল শ্রীবাস্তব লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের B.Sc. এবং M.Sc স্নাতক পদার্থবিদ্যায়, চন্দ্রায়ণ ৩-এর প্রজেক্ট ডিরেক্টর পি. ভীরামুথুভেল প্রথমে পলিটেকনিক ডিপ্লোমা করেন এবং তারপর শ্রী সাইরাম ইঞ্জিয়ারিং কলেজে (চেন্নাই) B.Tech ডিগ্রি নেন। কেউই এঁরা ঝাঁ চকচকে শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসেন নি। সেই অর্থে এঁরা অতি সাধারণ কিন্তু এঁরা অসাধারণ কাজ করে দেখিয়েছেন। এর সিক্রেটটা কি? যাদবপুরের ছাত্র এবং গত ২৮ বছর ধরে IIT Madras এর অধ্যাপনা করার পরও বলছি, আমাদের দেশে মেধা শুধু নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে নেই, বরং বড় বড় প্রতিষ্ঠাগুলোতে তারাই আসতে পারে যারা প্রচুর টকা খরচ করে কোচিং কারখানাগুলোতে প্রস্তুতি নিতে পারে। সেইজন্যই IIT/NIT-তে বোম্বে, দিল্লি, কলকাতা, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, চন্ডীগড়, হায়দ্রাবাদের মতো বড় শহরের ছাত্রদের দাপাদাপি। পাস করার পর এই সব ছাত্রদের দৃষ্টি থাকে মূলতঃ বিদেশযাত্রা অথবা মোটা অঙ্কের বহুজাতিক সংস্থার চাকরি। নিদেনপক্ষে IIM-এর ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি। ISRO বা DRDO-র মতো সরকারি চাকরিকে এরা তাদের উপযুক্ত বলে মনে করেন না। সমাজের উঁচুস্তরের থেকে আসা এই সব ছাত্ররা যে কেরিয়ারের স্বপ্ন দেখেন তার সাথে ISRO-র বিজ্ঞানীর সাদামাটা জীবন খাপ খায় না। আমি বলছি না এর ব্যতিক্রম নেই , কিন্তু মূলতঃ প্রবণতাটা এরকমই। অন্যদিকে গ্রামগঞ্জ আধাশহর থেকে আসা মেধাবী ছাত্ররা যাঁরা মূলত মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছেন এবং কোচিং বা বাড়ির শিক্ষা পরিমন্ডলের সহায়তা পাননি, তাঁদের কাছে ISRO-র মতো সংগঠন শুধু গ্রাসাচ্ছাদন নয়, অভাবনীয় কিছু করে দেখানোর এক অসাধারণ সুযোগ। এই সুযোগই তাঁদের শেখায় স্বপ্ন দেখাতে। আর তাতেই রাত দিন এক করে দেন এইসব 'সাধারণ' বিজ্ঞানীরা। তাঁদের যে মেধার স্বীকৃতি তাঁরা সমাজে

পাননি সেই মেধা উজাড় করে দেন সেই স্বপ্নকে সফল করতে। মনে আছে তেমনই মফঃস্বল থেকে আসা এক বিজ্ঞানী এ.পি.জে আব্দুল কালাম বলেছিলেন, “Dream is not what we see in sleep. Dream is what does not allow us to sleep.” - আমরা ঘুমিয়ে যা দেখি তা স্বপ্ন নয়, যা আমাদের ঘুমোতে দেয় না, তাই স্বপ্ন। আর এই স্বপ্নের সাথে ঐ বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডল মিলেই তৈরি করেছে অসাধারণ সংস্থা ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা, ISRO।

তাহলে কি ভারতবর্ষের নামী বিশ্ববিদ্যালয়, IIT, IISc-র কোনই কৃতিত্ব নেই ISRO-র এই সাফল্যে ? ব্যাপারটা অতটা হতাশাজনক নয়। যাঁরা আজ ISROর কান্ডারী, তাঁদের অনেকেই পরবর্ত্তীকালে পাঠ নিয়েছেন IIT/IISc-তে। যেমন ISRO-র চেয়ারম্যান সোমনাথ মাস্টার ডিগ্রি নিয়েছেন IISc থেকে এবং তিনি ডক্টরেট করেছেন IIT Madras -এ আমাদের বিভাগ থেকে। ভীরা মুথুভেলও NIT ত্রিচি এবং IIT Madras-এ পরবর্ত্তী শিক্ষা নিয়েছেন। আসলে জনমানসে IIT গুলোর যে চিত্র আছে, আজ তা বাস্তবিক পরিস্থিতি থেকে অনেকটাই পৃথক। আজ আর IIT/NIT শুধু BTech ছাত্র তৈরির কারখানা নয়। IIT মাদ্রাজে এই মুহূর্ত্তে মাস্টার এবং ডক্টরেটের ছাত্র প্রায় ৬০%, B.Tech ৪০%-এরও কম। উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণা এইসব সংস্থার মূল প্রতিপাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এখানেই ISROর মতো সংস্থান তাদের বিজ্ঞানীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ তথা গবেষণার সহায়তায় বিভিন্ন প্রজেক্ট দ্বারা IIT/IISc-র মতো সংস্থার থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হন। ISRO-র সাথে দু-একটি প্রজেক্ট করেননি এমন অধ্যাপক IIT মাদ্রাজে কমই আছেন। আর তাই বড় কিছু করে দেখানোর জেদ, ISRO-এর পরিমন্ডল এবং উচ্চতর সংস্থার সহযোগিতা - এ সবকিছুই ‘সাধারণ’ মানুষদের এই সংস্থানকে করে তুলেছে অসাধারণ। টমাস আলভা এডিসন বলেছেন, “Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.” - ISRO-র বিজ্ঞানীরা এই অধ্যবসায়ের ভূমিকাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। আজ সোস্যাল মিডিয়ায় ISRO বিজ্ঞানীদের অতি সাধারণ জীবন যাপন, বেশভূষা বা বিনম্র ব্যবহার নিয়ে চর্চা চলছে, কিন্তু এর কারণটা ভুললে চলবে না। মধ্যবিত্ত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ তথা আদর্শবোধ এর পেছনে রয়েছে। এঁরা দেশের জন্য, বিজ্ঞানের জন্য কিছু করাকে জীবনের পরম প্রাপ্তি বলে মনে করেন। মঙ্গলায়ন চলচ্চিত্রের গৃহবধূ বিজ্ঞানীর গ্যাস বাঁচিয়ে লুচি ভাজার চিন্তা যেমন তাকে মঙ্গলায়নের জ্বালানী বাঁচিয়ে মঙ্গলে পৌঁছানোর আইডিয়া দিয়েছিল। ISRO-র অত্যন্ত কম খরচে এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে এমন অনেক বিজ্ঞানীরই মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ, যা ISRO-কে করেছে সাধারণ মানুষদের এক অসাধারণ সংগঠন।

অশনি সংকেত

ISRO-র এই প্রশংসার অর্থ কি এই যে এটি একটি নিখুঁত বৈজ্ঞানিক সংগঠন যেখানে নিভৃতে উৎসর্গীত বিজ্ঞানীরা কাজ করে চলেছেন, কোনও আমলাতান্ত্রিক বাধা পারস্পরিক হিংসা, দ্বেষ রহিত হয়ে শুধু বৈজ্ঞানিক উৎসাহে পরিচালিত হয়ে? এটা মনে করা খুবই ইউটোপীয় ধারণা হবে। মানুষ থাকলেই সেখানে অসম প্রতিযোগিতা, পরশ্রীকাতরতা এবং অনৈতিক প্রচেষ্টা থাকবেই। সংস্থান যত বড় হবে ততই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও বাড়বে এবং ISRO-ও এর ব্যতিক্রম নয়।

এর প্রথম আভাষ পাওয়া যায় কুখ্যাত ISRO গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে। ISRO-র সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীদের একজন ছিলে ডঃ নাম্বিনারায়ণ। তিনি দায়িত্বে ছিলেন ISRO-র ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের বিকাশের। রাশিয়া প্রথমে এই ইঞ্জিন

দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু আমেরিকার চাপে তারা পিছিয়ে যায়। ISRO তখন নিজেরাই তা বানানোর চেষ্টা করে। ১৯৯৪ -এ ডঃ নাম্বিনারায়ণ সহ কয়েকজন বিজ্ঞানীকে কেরালা পুলিশ গ্রেপ্তার করে, ISRO-র এই ইঞ্জিনের নকশা বিদেশীদের হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগে। তাঁকে বরখাস্তও করা হয়। পরবর্ত্তী সময়ে কঠিন লড়াই ক'রে না ডঃ নাম্বিনারায়ণ আদালতে প্রমাণ করেন যে সমস্ত অভিযোগই ভূয়ো। তিনি এ অভিযোগও করেন যে CIA ভারতের ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন তৈরী করাতে বাধা দেওয়ার জন্যই এই ষড়যন্ত্র করেছে। আসলে এই ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন প্রক্ষেপন যানের অন্তিমচরণ যেখানে তরল হাইড্রোজেনকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং তার জ্বলনের জন্য তরল অক্সিজেনও নিয়ে যাওয়া হয় কারণ মহাকাশে বাতাস নেই, তাই আবহাওয়ার অক্সিজেনও পাওয়া সম্ভব নয়। মহাকাশ মিশনে তাই এই ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। CIA-র হাত প্রমাণিত না হলেও ডঃ নাম্বিনারায়ণকে যে ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছিল তা প্রমাণিত হয় এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁকে শুধু তাঁর বকেয়া মাইনেই নয়, তাঁর মানহানি এবং বছরের পর বছর হয়রানির জন্য কোটি টাকা ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে কি দেশের এক অগ্রগন্য বিজ্ঞানীর জীবনের হারিয়ে যাওয়া এক দশকেরও বেশী সময় এবং অন্ধকারের জীবন কে ফিরিয়ে দেওয়া যায়? দুঃখের বিষয় এই ষড়যন্ত্রে কেবল পুলিশ নয়, ISRO-র অভ্যন্তরের কিছু ঈর্ষান্বিত বিজ্ঞানীও যে যুক্ত ছিলেন, তা দিনের মত স্পষ্ট। দ্বিতীয় ঘটনাটি আমার সহপাঠি তপন মিশ্রকে নিয়ে। বছর দুয়েক আগে, অবসর নেওয়ার পর তপন সোস্যাল মিডিয়াতে অভিযোগ করে যে তাকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল যা ডাক্তাররা নির্ণয় করেছিলেন। শুধু তাই নয় একটি গোপন সুড়ঙ্গের মাধ্যমে তার বাসভবনে বিষধর সাপও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ডাক্তার এবং সুরক্ষা কর্মীদের তৎপরতায় তিনি বেঁচে যান। প্রমাণিত না হলেও ISRO-র এত উঁচুপদে থাকা বিজ্ঞানীর এ অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

উপরের ঘটনাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে ISRO-তে All is not well। সবকিছু ঠকঠাক চললে সংস্থার শীর্ষ বিজ্ঞানীকে মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে বরখাস্তও করা হত না বা খ্যাতনামা বিজ্ঞানী হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগও আনতেন না। এসব ঘটনা সংস্থার আভ্যন্ত্যরিণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের দিকেই আঙুল তোলে। যে কোনও বড় সংগঠনেই কিছুটা আভ্যন্তরীণ রাজনীতি, ল্যাং মারামারি থাকবেই কিন্তু তা শীর্ষ বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত আক্রমণে পর্যবসিত হলে, সংস্থার লক্ষ্যই ব্যহত হয়। যেমন মনে করা হয়েছে যে নাম্বিনারায়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ভারতের ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের বিকাশকে এক দশকেরও বেশী পিছিয়ে দিয়েছে। এ এক অশনি সংকেত যার বিরুদ্ধে ISRO-কে দ্রুত সাবধান হতে হবে।

শেষের কথা

এধরণের লেখার কোনও পরিশিষ্ট হয় না। আমি ISRO-র সামগ্রিক মূল্যায়ণ করতে বসিনি। তার জন্য সরকার রয়েছেন, রয়েছেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। আমি শুধু ISRO-কে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হওয়ার সুবাদে তার সাফল্যের কিছু উপাদানের কথা সামনে আনার চেষ্টা করলাম যা হয়তো সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয় না। তার সাথেই কিছু ঘটনা আমাদের সতর্কও করে যাতে অসাধারণ সাফল্যের খতিয়ান এবং ঐজ্জ্বল্য-এর দুর্বলতা গুলোর ওপর আচ্ছাদন না ফেলে দেয়। ভবিষ্যতে আরও উঁচুতে ওঠার সেটাই হবে গ্যারান্টি - বিক্রম সারাভাইয়ের স্বপ্ন সফল হওয়ার নিশ্চয়তা। এটাও মনে রাখা দরকার যে ISRO-র এখনও অনেকিছু করা বাকি। এখনও আমরা Reentry বা Reusable রকেট তৈরী করতে পারিনি। Reentry Vehicle হচ্ছে এমন রকেট যা মহাকাশ থেকে বায়ুমন্ডলে ফিরে আসে। এই ফেরার সময় ঘর্ষণজনিত

প্রচন্ড তাপ সৃষ্টি হয় যা নিয়ন্ত্রণ করার প্রযুক্তি অত্যন্ত জটিল। মনে করা যেতে পারে, এই প্রযুক্তির ত্রুটির জন্যই কল্পনা চাওলা সহ অন্যান্য মহাকাশচারীদের প্রাণ দিতে হয়। ISRO এর ওপরেও কাজ করে চলেছে। তাছাড়াও মনে রাখতে হবে বিক্রম সারাভাইয়ের স্বপ্নের ISRO হলো মানব কল্যাণের মহাকাশ প্রযুক্তি, যা সফল করতে হবে। তেমনই সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত কুৎসা ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়িকে যথাসম্ভব করতে হবে নিয়ন্ত্রণ। বিক্রম সারাভাইয়ের ভাষায় "The strength of an organisation can be judged by how well it can ride calamities."

Not Your Normal Type

Jayita Chowdhury

How to act normal
Look fine and formal
When there are thoughts
Intrusive enough
In your head creating knots?
How to laugh with a group
And ignore the growing coup
That your mind has planed
To destroy your peace with
And keep awake through the night damned?

There's no way out!
The words you can't mouth
Become the silent thoughts
No one understands
And you just stare ahead….
You want to shoutout loud
That "My head's not on the cloud
It's just my intrusive thoughts
That ask me strange questions like
Why aren't broccolis red?"

You stay in your place
With a really dull face
And people assume it's you
Being lazy and irritable
You never say what you think
I can't really help you dear
I can't stop the mockery and jeers
What I can suggest is this
Don't let the people around you
Push you to the brink
Being normal isn't defined
Your normal isn't mine
So, let's make this simple
Be the best version of yourself
Try calming yourself down
Maybe herbal tea can help
Or you can try those green kelps
Honestly, I don't know how those taste
But I know one thing for sure
Be yourself, keep that frown

Keep doing what you like
Ride the town on your bike
Think of different possibilities
Wear your accessories
People will laugh and jeer
You don't take that to your heart
'cause I know you're smart
You can make the best of your time
Keep the negative thoughts away
I wish you good luck and cheers!

The Sun Shines

Swagata Dasgupta

The gushing wind was heralding a storm,
The clouds hid the sun as if to scorn,
A dream, a love , a care, a patience and an uncertain heart :
All trees were fazed,
All flowers were blown,
A seed of fear was clawing to tear the hopes apart !

The sylvan beauty, the sound of nature, the enticing flowers ,
That invaded my heart for hours n hours !
The company, the laugh ,
The chitchat, the grub ,
Which I loved once,
Has now been lost that charm n colours ⋯

Sometimes some loving notes , some compassionate eyes brought tears ,
Just for a time being ⋯
Again they are lost in their timeline .
Then came two small hands that hugged me and said “Nonna, I love YOU “,
Came there the older one “ Don’t worry, Nonna, I will take care of YOU “

Guiding Stars

Pragyaa Saha

The recipe to life is not very sweetened always,
Lessons are taught the hard way
Barriers are put up right when the road is smooth,
However these lessons are what candidly life means.

Sixteen was not very delightful age to her like it was to be
The bitter truth of loneliness flashed before her eyes,
She then left alone with her docile heart staring at her own shattered self.

A one time lesson, all it was
Showed her the numerous faces a person could inhabit,
Strengthened her heart to fight like those
Injured soldiers to the war field.

Too hard it was for the trust or faith to grow back
But then came a gem to teach her yet another lesson,
The lesson to forgiveness
Tender so the broken maiden was,
She learnt to believe in second chances with a pinch of forgiveness.

In the wake of every dark day came the light to a

bright sun she knew,
But how could one believe in the light
When the darkness was concealing her beliefs.

Like every other battle this one was a hard one too
She had to fight her demons to live her teenage self,
And for that she learnt to forgive
Herself before the others sometimes.

Then came the end of the deep dark tunnel
Where she finally saw the light,
But this time she faced the brightness with caution
Came two little birds to aid her towards flying.

The wounded bird learnt to spread her wings wide
And like every following lesson there would be,
She wouldn't forget
Henceforth the choice to forgiveness was put up
but with a promise to never forget.

The final outlook on life when seen
Seems pretty difficult but,
These small and important lessons are what ultimately
Makes us human and helps us accustom to the various storms ahead.

The Gamechanger

By Avik Samanta

"Dad!", my son shouted from the living room, "my mouse is too slow. I keep getting killed in the game⋯". "Please do something- buy me a gaming mouse". I was concerned, not because my son was in mortal danger (it's an online video game after all), but because of his constant nagging I could hardly focus on my work. So, I opened the shopping app on my phone⋯ The gaming mouse arrived the same evening, thanks to the amazing logistics we have nowadays. It was Green and shiny and emitted surreal lights when plugged to the laptop. My son was happy, and I was relieved. "Dad!", the familiar cry pierced the silent air of the house. "What now?"- I sounded exasperated. "The new mouse is of no use⋯it's even slower than the previous one... I got killed three times in the last minute". My son came to my study, his eyes darting here and there. "You are not working now⋯give me the mouse that you use for your work. Let me give it a shot."

"Ha! It's slow even for Microsoft Word and you want to play online games with it!"- I silently chuckled as I handed the work mouse to my son. But I was wrong! My son did not complain after all. I went and looked at his laptop- he was happily slaughtering the fictitious enemies. Looked like the tiny, black, unassuming mouse had finally found its calling. "Hey- I have to work. Give me back my mouse"- I shouted so that my son can hear through his headphone. He did not bother to look up from the screen and handed me the shiny, green gaming mouse- "You take it!" Suddenly my work area is not so dull anymore. It is lit up with the strange light emitted by "venom" (yes, that's the name I have given it), the shiny, new gaming mouse that is happily glowing, now that it is relieved from the more strenuous duties. I get back to my work as I keep hearing my son's shout of joy at the background and the incessant left and right mouse clicks as the enemies bite the dust! About the author: Avik has been staying in Chennai with his wife and son for the last 9 years and is a member of the Bengali Association. He is working in Finance and is an avid traveller and board-gamer.

Vision Of The Blind

Sagar Sengupta

Being a teacher by profession one is in the practice of the craft of teaching. This happened to me when I joined the profession in the year 2000, immediately after my graduation. I do believe that everyone around us in this society is a teacher in one way or the other. Every parent happens to be the first teacher for their children. One gets to learn a lot from a superior in office. Since ancient times it has been the practice of learning from peers, colleagues, seniors, experienced professionals and the like. In fact, it is learning that keeps us alive, the day one stops learning, one is hardly any more. More than twenty years back on the morning of a lazy Sunday in the January of 2003, my father received a call from a unique organization at Poonamallee, Karyanchavadi. The organization functions under Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. Yes, I am talking of NIEPVD - National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, Regional Centre, Chennai. This center is unique in many respects. The Visually impaired and low vision trainees who have completed 10 th std are provided with job oriented, skill development courses like a one-year course on Braille Stenography and Secretarial Practices [English], Certificate courses in Computer Applications, Clerical Assistant/LDC, Reflexology and Independent Living Skills [ILS]. Also, the campus has a Department of Special Education which conducts two-year B.Ed. program on Special Education.

Rarely, people have an awareness or realization that a visually challenged (more often we call them Blind) person can also illuminate the world with their vision (long term thinking). Various State Governments and the Union Government have earmarked vacancy in various departments where these people work as Stenographers, Computer Operations Executive, Clerks, teachers as well as Masseur Therapists. As part of Corporate Social Responsibilities initiatives, many public sector undertakings and private corporates employ blind people on job who keep working just like their normal peers.

With discipline and time management and soft skills like dress etiquette, communication and memory, these people keep illuminating the world with their vision even though they don't have vision. They give rise to happy families. Our family had the opportunity to attend the marriage of a trainee in Stenography course who now works as a Senior Executive in the Canara Bank Regional Circle- Vishakapatnam, Andhra Pradesh. What an experience it was for me and my family. They

participate in sports and games, with full enthusiasm. To name a few, they have specialized chess boards which they are able to feel the squares with braille dotted structures, ball throw for cricket they are able to do with stone filled balls that make noise while the bowler delivers and by hearing the noise of the flow of the ball, the batsman hits back. They excel in singing, operating musical instruments and also dance as well as enacting drama just like we do. The Regional Centre, NIEPVD is supported by funds from Government of India in all respects. Our country and the union as well as the state governments have continuously operated and are operating such centre of Excellence as Non-Governmental Organizations also.

A very unique question may arise in the minds of readers of this article. Why not provide vision to the person's born with blindness by EYE REPLACEMENT. Our medical support system across the globe has made it possible for such exercises to be happening, less in numbers as on date, because of the high costs involved in these transformations. We will have to come out from our prejudice and gradually make this effort all along and inclusive in sense if needed with economic support. With more and more amongst us, willing to help them by donating ourselves after our life, for them to get vision, the medical fraternity can do the rest.

To conclude, the VISION OF THE BLIND, let us join our hands together and keep supporting such people to excel in many more areas of expertise in the near future. I have regarded it to be a great learning of my lifetime to have learnt about the visually challenged through NIEPVD. They have been great teachers.

Chess : A game I love

Sushmit Banerjee

Chess is a game which originated in the 600s AD. The earliest form of chess is known as chaturanga, which originated in India. The game spread throughout Asia and Europe over the coming centuries and eventually evolved into what we know as chess around the 16th century. The game gained popularity because of its ability to pose intellectual challenges. It was also used as a metaphor for strategic warfare in real wars. Chess is also very accessible which contributed significantly to the growth and popularity of the game.

Personally, I like chess because it enhances important cognitive skills like memory, concentration and focus. It also improves decision-making skills which are very important. It also helps me to be creative by thinking beyond conventional moves, explore innovative strategies and visualize potential outcomes. Playing chess requires strategic thinking, analytical skills, pattern recognition, decision making skills, patience, out of the box thinking etc.

In order to have success in chess, a chess player needs to be aware of various chess strategies which are to be used while playing. Some of the common chess strategies include:

1. Pawn Structure: The pawn structure is a very important aspect of analyzing a particular chess position. It can tell us a lot about chess positions. For example, pawn weaknesses such as isolated pawns or doubled pawns can be easily attacked and exploited by the opponent. On the other hand, a pawn such as a passed pawn in the ending will be very difficult for the opponent to stop.

2. Piece Development: It is essential to bring out as many pieces as possible early in the opening. The more active the pieces are, easier it will be to take control of the flow of the game. The goal of piece development in the opening is to improve the coordination, mobility, and effectiveness of the pieces.

3. King safety: By far, the most important piece in chess is the king. Checkmating the king results in the end of the game. This is why it is important to move the king to a safer position behind pawns. This is commonly done by castling in the opening. Castling is a special move in chess that involves the king and the rooks. This is done to safeguard the king and activate the rook. There are two types of castling: King-side castling and Queen-side castling.

4. Center control: The center is the most important area of the board. The player who controls the center will have a much easier time controlling the board. It enhances piece activity and enables the

player to carry out their plan in the middle of the game.

5. Tactical Ability: Tactical play involves recognizing and exploiting opportunities for short term gains, such as capturing pieces, launching attacks or setting up traps. Tactics include pins, forks, skewers, and other tactical motifs.

6. Positional Understanding: Positional play focuses on long term planning, evaluating the strengths and weaknesses of the position and making strategic decisions accordingly. This includes assessing pawn structure, piece activity, king safety, and imbalances.

The 1972 World Chess Championship match between American chess prodigy Bobby Fischer and Soviet Grandmaster Boris Spassky was a critical event in the history of chess. This was during the Cold War era, where the United States and the Soviet Union (present- day Russia) were engaged in intense political tensions. This championship was seen as a symbolic representation of the rivalry between the two superpowers. This was the time when chess gained an international audience and media coverage. Ultimately, Bobby Fischer emerged victorious, becoming the first American to win the World Chess Championship and ending the Soviet dominance in the Chess world, which had lasted for decades.

Anatoly Karpov and Garry Kasparov were both Soviet chess players who dominated the chess world during the late 20th century. Their rivalry was intense and spanned several World Chess Championship matches. Karpov became the World Chess Champion in 1975 when Bobby Fischer forfeited the title, and he held the title until 1985. In 1984, Garry Kasparov emerged as a challenger to Karpov's crown in the World Chess Championship match held in Moscow. After 48 games, the match was controversially terminated without a decisive result, with Karpov leading narrowly. Kasparov won the rematch in 1985, becoming the youngest World Chess Champion at the age of 22.

Vishwanathan Anand is the first Indian to become a chess grandmaster. He quickly reached the top of the chess world. Anand's breakthrough came in 2000 when he won the FIDE World Chess Championship, a tournament-based championship, defeating Alexei Shirov in the final. Anand won the World Chess Championship in 2007 by defeating the reigning champion, Vladimir Kramnik, in a match held in Mexico City. During his reign as World Champion, Anand successfully defended his title in two subsequent World Chess Championship matches. He defeated Vladimir Kramnik of Germany in 2008 and Vesselin Topalov in 2010. Unfortunately, Anand's reign as the Chess World Champion came to an end in 2013 when he lost to the powerful challenger in Magnus Carlsen of Norway. Despite this, Vishwanathan Anand has had an extremely strong influence on

the chess world. He has inspired countless others to take up chess as a career in India and around the world.

Along with Anand, there have been several grandmasters from West Bengal, who have had a prominent influence on the chess scene in India such as Dibyendu Barua and Surya Shekhar Ganguly. Dibyendu Barua is one of the earliest grandmasters in Indian chess. In fact, he was India's second grandmaster, second only to Vishwanathan Anand. Barua has represented India in numerous Chess Olympiads and other international events. He also won several National Chess Championships in India. Dibyendu Barua's contributions to Indian Chess have been instrumental in inspiring and nurturing young talents in the country. Surya Sekhar Ganguly is another strong Grandmaster from India. He is one of India's leading players and has achieved numerous accolades in his chess career. The successes of players like Dibyendu Barua and Surya Sekhar Ganguly have undoubtedly played a part in fostering the growth of chess in Kolkata and beyond, inspiring a new generation of players in the country.

Memories down the lane

Mrs. Rama Sadhu

Betrayal converted into Love

She just completed her doctorate after much struggle from the childhood, totally new to this social media, cause she didn't find time to spend time on herself, always used to dig her face on the book. In polished language she is a bibliophile lady.

Joined college as an Assistant Professor in self finance Arts and Science College.

To refer books and to prepare notes for her lecture, she was compelled to dig internet.

One fine day she was introduced to social media where the people used to chat, she was so excited to chat with all the strangers. Every Saturday and Sunday was a weekend for her.

That day was 19th February, Regi was introduced to Pritam through social media, both were talking initially,

But as their conversation started growing up day by day, they were not aware that when they both fall in love with each other. First she thought it was her infatuation, but later Regi realised that it was not her infatuation but she was serious, head over heels in love with Pritam only thing she was unable to open her core of her heart to say that she was in love with him. But to her surprise, Pritam proposed to her and told her that he was in love with her and want to marry her, he also said that he will introduce her to his parents and marry her systematically and will fulfill all the necessary rituals for getting married.

But, after few months her dreams were shattered into pieces. She came to know from his cousin, that he was already in love with his childhood friend Keerthi and was keen to marry her after few months.

When Pritam was enquired about it, he blindly refused all his promises to Regi. Moreover he sprinkled salts in her wounded heart that he was actually killing his time and what his cousin told is the actual fact that he was urge to marry her childhood friend very soon.

Regi finally realised that she was duped she was depressed for days.

On that doomsday when both Pritam and Keerthi busy in their wedlock, she by breaking all the bonds, she left India for attending conference, and there was absolutely no connection between Regi and Pritam for months.

Regi was totally broken and shattered. Cause her love was not fake but genuine, she still love him but her emotions was totally locked inside her. She returned back to India and got married to an extremely lovable handsome guy Manav by name, day by day she was sinking and Manav extended his helping hand to protect her from all sorts of

disasters. Slowly Regi started recovering from all the problems she was facing. Now she is happily married lady with a very cute son

Days passed to month and years, Pritam too became father of their only son.

Pritam was missing Regi terribly and one fine day he contacted her and their friendship blooms again. But in between he used to insult Regi in no cause, made her down each and every moment, she went to meet him at his office, instead meeting her he chased her out. During his sister's wedding though she gifted her, but he refused to invite her fearing his marriage should be safe, when he was asked of denying inviting her, he invited her like a beggar. When she was sick, she just asked for a simple greetings, he lied to her that he had sent and asked her to collect it from the post office, she was so excited to receive the card from her beloved, though she was sick she went to post office traveling miles to receive the card, but again she was fooled.

Can a man make such a respectable qualified woman down for multiple times?

Finally he realised that he betrayed her.

He wanted to find a way to make atonement for his sins. He wants to amends to restore a damaged relationship between them and he wants to reconcile her by extending his hand of friendship.

This friendship again blooms into Love even they were also not aware of it.

But the beauty of this story that they still didn't meet each other, but they are still friends for past 9 years, and I strongly believe that they are not going to meet ever.. But their friendship will continue for ever and ever.

Bread Butter Jam

Doesn't it sounds something strange and peculiar? Is it yummy or awful?

Neither it is yummy and obviously it can't be awful, but yes it is the dream of a young girl, Ruma. Ruma hails from a lower middle class migrant family, from Bangladesh. Her father was appointed as a clerk in Southern Railway with a meagre salary. Those days Railways perks were not the best, so it was very difficult for the family to make both ends to meet. He had to take care of his family of 6 members including 4 kids (3 daughters and a son) and his wife who used to stay in a single 1 HK(only hall and kitchen) Railway Quarters in Chennai.

Ruma's father tried his best to give the best of the education to all his kids.

He decided to put his son in a public school and his three daughters in a Railway Convent school.

As her parents were unable to afford school fees for their son, every academic year her father would pay the fees from his provident fund. However school fees was exempted for the daughters because the father was a Railway Employee.

Additionally the school used to provide uniform as well. However books weren't free. Ruma and her two sisters used to get second hand books from their seniors as the parents couldn't afford books.

The school uniform in a Railway Convent is Blue Pinafore with white shirt, black shoes and white socks between Monday to Thursdays whereas Fridays it is white skirt and white shirt, with white shoes and socks. For Eleventh and Twelfth standard it is blue pants and white shirt with black shoes and white socks on Monday to Thursday and Friday is same as high school girls students. You must be wondering, Why I am so much particular about their uniforms? It is because Ruma's parents couldn't afford to buy uniform for them, so her father opted for free uniform which is provided for Railway Employee's children however they are of cheap quality materials, but rest of her classmates would wear standard quality materials.

Her parents unable to afford to buy shoes for them, her two sisters somehow were not punished for not wearing shoes which is mandatory, cause their class incharge was a bit more flexible and kind hearted too. But her class incharge was an Anglo Indian lady, very strict disciplinarian personality, when she was in V standard Ruma was punished everyday for not wearing the shoes, punishment was she was not allowed to sit on the bench with rest of her classmates. She used to sit on the floor for the whole academic year, and the rest of her classmates used to cast at her as a downtrodden, for no standard uniform and always punished for not wearing shoes, so gradually no friends too.

Her mother used to prepare something mixed rice for all her siblings, during lunch all her two sisters sit together and used to have lunch together. But she craves for Bread Butter and Jam where all the Anglo Indian Students used to eat.

Well, she was promoted to VI standard and here in class VI Standard her class incharge was really very good and friendly character with everyone.

Now let me come to the point of this Bread Butter and Jam, while she was in Sixth grade, one of her uncle used to visit them often.

One day early morning, he gave her and other two sisters twenty rupees each to buy lunch as it was too late and her mother couldn't prepare their lunch box. In meantime Ruma was extremely happy and excited was thinking that she was going to fulfill her long waiting dreams from the childhood, eating Bread Butter and Jam like her Anglo Indian friends used to eat.

So that day as soon as she received money from her uncle, she started early to school, went to bakery nearby her school and with that twenty rupees she purchased loaf of Bread asked the Baker to spread Butter and Jam on the Bread and also she purchased jelly and juice too, she was so excited and waiting eagerly that her long waiting dreams were going to fulfill today.

Finally at 12 noon, lunch break rang, she came out hurriedly with her lunch bag sat peacefully at the corner of the ground to eat her sumptuous lunch, as she opened her tiffin box, many of her classmates had a glimpse of her lunch and sat with her, she happily shared her lunch with her classmates and she too ate a bit, that day onwards those classmates became her close friends too.

Killed Two birds with one stone, finally Ruma achieved two things in single action. Her dreams to eat bread butter and jam and longing for friends were finally fulfilled.

My Horrific Night

I decided to stay alone when my husband got an invitation from his childhood friend's to attend a marriage function of his known relatives in Kolkata.

It's only a week program as my Principal denied to give me vacation to accompany my husband due to fast approaching semester examination in the college where I am working as an Assistant Professor in Chennai.

This is the first experience, I am going to stay alone at home, basically I am bit timid in nature.

Though I convinced Malay Sadhu my husband, not to worry, I can manage staying alone at home. I bid goodbye to my lovable hubby who is so worried about my decision of staying alone. Returned home finally.

As the evening grows into night, my pulse beat raised I can feel both the palpitation and the heart beat together simaltaneously. I don't have guts to stay alone, took a quick decision gave few kicks to my sweetheart, my Pinky Honda Activa who is always my dearest companion when riding alone.

Reached my younger sister's home who was waiting for me eagerly especially my cute little niece

At my sister's house, I received a VIP treatment from them...days rolled by obviously keeping in touch with my husband every now and then.

Finally, I received a call from my husband asking me to stay at home that night as he was about to reach home early morning and he forgot to take the keys to get in, for me no other option but to reach home, so after my college I reached home gathering lots of guts 'yes I can stay alone'.

As the evening rolled to night, everything was fine, I had my dinner, prepared myself to sleep early, tied all the four corners of the mosquito net. Just about to sleep, to my dismay started raining heavily, followed by no power which startled me. As at that time we were using single phase, so except my house there was power for all my neighbours. My initial reaction was I complained to Electric Board to resolve my issue at the earliest but they totally neglected my single complaints.

Finally, I decided to sleep keeping my bedroom window open to collect some chill breeze but to my utter surprise I slept as I was so tired

Around 3 am, I can feel my mother in law standing behind the mosquito net staring at me anguishly.

We lost her year back, I tried to open my eyes struggling hard to reach her, but everything was in vain, started sweating profusely, shivering and trembling, but still unable to reach her, at last I tried to open my eyes just speechless and shocked to see a cockroach behind the mosquito net.

Changed my position and slept again forgot to notice the time,

Again I felt someone was peeping at me through the mosquito net this time I was really afraid want to scream, but unable to scream, I struggled hard to open my eyes but I found it was a difficult task even to open my eyes, but finally I succeeded to open my eyes just to see the same cockroach behind the net,

Got up, sweating profusely, feeling thirsty gathered all my will power got up drank water till my heart content and slept again, I don't have any idea when the power came, got up hurriedly with the ringing of calling bell, my husband was waiting for me to open the door.

What a coincidence! Is it cockroach or my mother in law? Or simply my nightmare... But to agree it's a terrific nightmare. Whenever I think of this incident, I still feel the goosebumps on my extremities.

IMAGINARY DAMSEL

I have seen the magic on you, just a glance of your shining face compelled me to lose my direction from my ambition.

There is no one in this world to compare with you, cause you yourself is the best comparison of you, in this best moment of you and me how can you expect that I will forget you.

The most beauty and the hidden secret is how many pictures I have drawn, and how many poems I have written based on you as you are an imaginary pretty poet of mine.

Don't you understand that you only are beautiful Bengali damsel.

Tell me how can I ever forget you.

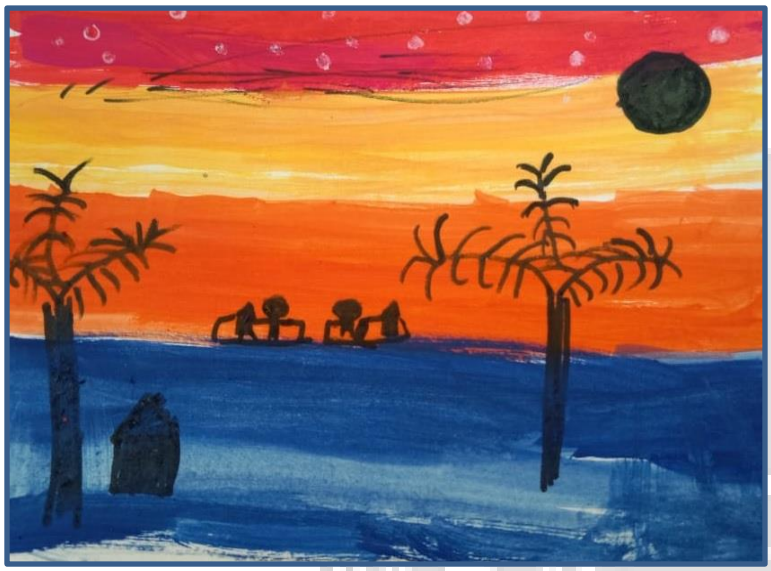

আমাদের কৃতীলেখা মন্ডলের সৃজন শৈলী

দক্ষিণের দর্পনের ফ্রেমে
কচিকাচার কারুকাজ

"বাংলার টানে বাঙ্গালীর অর্পণ,
দক্ষিণের দর্পন"

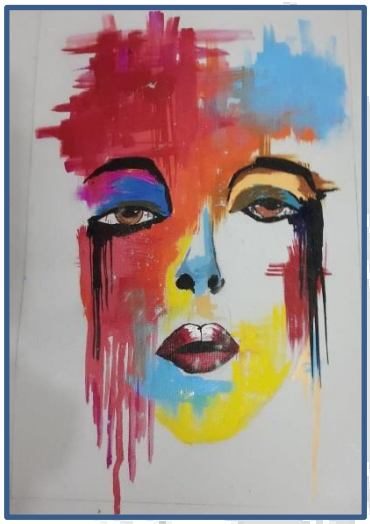

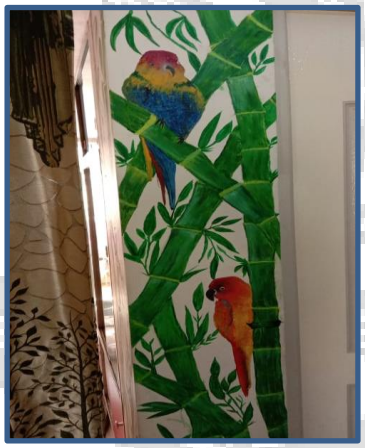

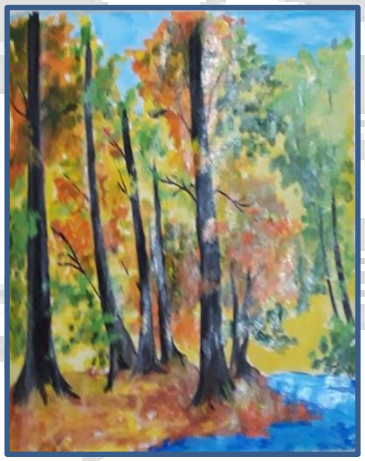

আমাদের সাগ্নিক দাশগুপ্তের সৃজন শৈলী

শুভ্রা মন্ডলের একটি পোট্রেট

লেখক পরিচিতি

প্রণতি ঠাকুর আবৃত্তি, শ্রুতি অভিনয়, গল্পপাঠ অর্থাৎ বাচিক শিল্পের জগতে এক বিশিষ্ট নাম। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের পরিচিত সংবাদ পাঠিকা, শখের মঞ্চাভিনয়ে সফল। বাংলা কয়েকটি সিরিয়ালে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা আছে। নিজের আবৃত্তি প্রশিক্ষণ সংস্থা "সূর্যাবর্ত", যেখানে নিজের তত্ত্বাবধানে এই শিল্পের প্রয়োগ সম্পর্কে যত্নের সঙ্গে শেখান। দেশের বিভিন্ন জায়গা ছাড়াও বিদেশের বাঙালির কাছে তাঁর আবৃত্তি ও শ্রুতি অভিনয় যথেষ্ট সমাদৃত। কিছু সমাজ সেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন, যেটি তাঁকে বাঁচার প্রেরণা দেয়।

প্রীতিলতা বিশ্বাস চেন্নাই এর অধিবাসী। প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। লেখার মাধ্যম বাংলা ভাষা। অনুবাদ: ইংরেজি থেকে বাংলা।

ড: তিমির ভট্টাচার্য পেশায় একজন রাবার টেকনোলজিস্ট। হালিশহরে জন্ম কিন্তু বর্তমানে চেন্নাইবাসী। ছোটবেলা থেকেই নাটক, গান ও কবিতা আবৃত্তি করে আসছেন। তার লেখা কিছু নাটক কবিতা ও গল্প বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

নীলাঞ্জনা চৌধুরী, বর্তমানে চেন্নাই এ থাকেন। কবিতা কে ভালোবেসে বাচিক শিল্পের সাথে যুক্ত। মূলতঃ কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। প্রকাশিত কবিতার বই একটি।

পারমিতা রায় বর্তমানে চেন্নাইয়ে থাকি। বড় হয়েছি কলকাতাতে, টুরিসিম ট্রাভেল ম্যানেজমেন্ট অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েশন করেছি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে । কবিতা লিখতে গল্প লিখতে এবং ছবি আঁকতে ভালোবাসি। এখনো শিল্পচর্চার মধ্যে সৃষ্টির মধ্যেই থাকার চেষ্টা করি। নিজের মনের কথা নিজের ভালো লাগার কথা লেখার চেষ্টা করেছি.... দক্ষিণের দর্পণ বই এ লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার জন্য খুবই আনন্দিত বোধ করছি।

পিন্টু চ্যাম্প মাহাতো জন্ম জামশেদপুরে বর্তমানে চেন্নাইবাসী। HCL এ ম্যানেজার পোস্টে কর্মরত। চাকরির ব্যস্ততার পাশাপাশি নাটক কবিতা ও কুইজ করতে খুব আগ্রহী।

বাসবদত্তা কদম বছর দশেক সফটওয়্যার প্রোগামার হিসেবে চাকরি করেছেন। বর্তমানে পারিবারিক প্রয়োজনে গৃহবন্দী গৃহবধূ। চেন্নাইতে আছেন গত ১২ বছর। নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনের মুখপত্র সাগরীতে লেখা দিয়েই লেখালেখির শুরু। গত তিনবছর ধরে কলকাতা এবং অন্যত্র বেশ কিছু পত্রিকায় (মুদ্রিত এবং অনলাইনে) লিখছেন।

সুতপা দেবনাথ পশ্চিমবঙ্গের রানাঘাটের বাসিন্দা। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা ও মুক্তগদ্য লেখেন। প্রকাশিত কবিতার বই 'ঢোল কলমির চাঁদ'।

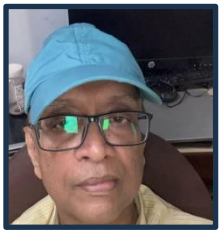

নামঃ বাসুদেব গুপ্ত, বয়সঃ ৭২, ধামঃ সল্টলেক, কামঃ কর্মরত কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ার ৫০ বছর অভিজ্ঞতা। হবিঃ লেখা, রান্না করা, বাজনা বাজানো, বই পড়া, খবর শোনা।

ডঃ অমিত বিশ্বাস অঙ্ক-পরিসংখ্যানের শিক্ষক এবং গেম থিওরি নিয়ে গবেষণা করেন তার পেশার অঙ্গ হিসাবে। পারিপার্শ্বিক সমাজে তিনি অবদান রেখেছেন এবং রাখতে চান, তবে তা নীতির বিনিময়ে নয়। বাংলা এবং ইংরাজী দুই ভাষাতেই তিনি লিখে থাকেন, কল্পকাহিনী তথা তথ্য ও সমাজ বিজ্ঞান ভিত্তিক সাহিত্য।

প্রণব বসু বেঙ্গালুরু বাসিন্দা লেখক মাঝে মধ্যে শখ করে পুরানো কালের মত ছন্দ্ মিলিয়ে কবিতা লেখে।

Sagar Sengupta is a qualified trainer, having 23 years of experience, did graduation in Bank Management. Advanced diploma in Child Care and applied psychology. Also have two PG diploma- business management.

পল্লব চৌধুরী একজন পরমাণু গবেষক, ছেলেবেলা থেকেই লেখালিখির শখ, তিনি নিয়মিত লেখেন, ইতিমধ্যে তার বেশ কিছু লেখা খুব জনপ্রিয় হয়েছে |

নবনীতা মুখার্জি, কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনা করে শিক্ষকতা পেশা হিসাবে থাকলেও বর্তমানে আমি একজন হোম মেকার, ঘরে বাইরে অনেক কিছুই সামলাতে হয়। কলকাতা আমার মাতৃভূমি হলেও সকল পরিবার ছেড়ে চলে আসতে হয় চেন্নাই তে। দেখতে দেখতে ৯ বছর হয়ে গেল এখানে। নাটক, কবিতা আবৃত্তি করতে ভীষণ ভালো লাগে। কয়েকটা নাটকে অভিনয়ও করেছি। অবসর সময় একটু-আধটু লেখালেখি করতে ভালোবাসি, গল্পের বই পড়তে, গান শুনতে, নতুন ধরনের পদ রান্না করতে, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে ভীষণ ভালোবাসি।

শুভ্রা মন্ডল ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর, বর্তমানে সংসার সামলান, বাড়ির কাজ আর বাচ্চাদের পড়াশুনা, গান বাজনা এই সব নিয়ে ব্যাস্ত থাকতে ভালোবাসেন, বেশ কিছু পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখেন।

সিতাংশু শেখর বিশ্বাস একজন পরমাণু গবেষক | তিনি গানবাজনা, লেখালেখি, শিক্ষকতা, সমাজসেবা, জোতিষ চর্চা নিয়ে তার অবসর সময় কাটান |

আমি কৃতীলেখা মন্ডল স্কুলের ফাঁকে মায়ের সাথে গানবাজনা চর্চা করি, ছবি আঁকি, ছড়া লিখি, প্রকৃতি বিষয়ক ছবি আঁকতে আমার খুব ভালোলাগে |

Sushmit Banerjee is in his late teens and has been playing the game of chess from a very early age of seven under the guidance of his father. He is a FIDE rated chess player and apart from He also loves to read novels and watch movies about scientific fiction. He is pursuing mechanical engineering with specialization in AI &ML from VIT and wishes to study Robotics in his post-graduation. He lives with his parents in Chennai for the last twelve years.

I am Jayita Chowdhury, a fourth generation 'Probashi Bangali' (Bengali resident) of Chennai. I did my schooling from Kendriya Vidyalaya, Ashok Nagar, Chennai and at present I am pursuing under graduation in Chemistry.I developed an interest in reading books and writing short stories from a very young age. The first full fledged book I wrote was at the age of eleven. It was titled 'Students' and was a first hand narration of various experiences in my school life. My teachers and Principal liked this book so much that they decided to get it published and circulate the copies to all the Kendriya Vidyalayas in Tamilnadu when I was a seventh grader in 2017. Since then my passion for writing has been continuing as my favourite hobby till date. Even though I haven't experimented that much with writing poetry, I sometimes, find it a good medium to vent out my feelings. This composition is one such poem.

Mrs. Rama Sadhu, wife of Malay Sadhu, though Probashi Bengali she feels proud that she belongs to a sweet Bengali Community, born and brought up in Chennai. She is Professor by profession, she is a vibrant writer who embeds a piece of her own soul in her stories, she has co-authored more than 20 anthologies and published successfully.

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম উত্তর চব্বিশ পরগণার নৈহাটিতে হলেও বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় স্নাতকোত্তর স্বপ্না শূন্য দশকের কবি। নিয়মিত লেখেন প্রথম সারির বাংলা পত্র-পত্রিকা ও ওয়েবজিনে। প্রথম কবিতার বই মাছঘরের নৌকা পেয়েছে একান্তর সম্মান। প্রকাশিত হয়েছে কবিতার বই দুঃখরতির ছাইপাঁশ, আমিও কুড়িয়ে নিলাম জলের স্বভাব, ছেলেটি অযুতনামা এবং ডাকিনী ভায়োলিন। স্বপ্নার লেখা ছোটগল্পের বই টিকটিকি, জামা ও অন্যান্য গল্প পাঠক প্রশংসিত।

রুপা ব্যানার্জী, নাটক, আবৃতি ছাড়াও ছোট কবিতা, ছোট গল্প লেখা, আর তসর সাথে স্কউট, ট্রেকিং, চক্ষুদান শিবির, এই সব সোশ্যাল কাজে ব্যাস্ততা। বাড়ি Taki

Myself Swagata Dasgupta, I have been a part of the teaching faculty in leading schools of Chennai for nearly 25 years. Music, art, drama, writing and reading are the different fields that fascinate me always. My prime love is teaching, grooming and guiding young minds. I have been taking online classes till this June 2023. Being a part of Bengali family, I enjoy ADDA also! After my husband's demise, when I reached the U S, both my grand kids (one 6 yrs, another 12 yrs) have been trying to pull me out of the pit of grief and depression. Seeing their efforts, these lines were the spontaneous overflow of my powerful emotions! They call me "Nonna"

আমি সঞ্জীব মল্লিক। দক্ষিণ রেলওয়ে'তে কর্মরত আর চেন্নাইএর বাসিন্দা। ছোটবেলা থেকেই ভাবতে খুব ভালোবাসি। সেই ভাবনা কখনও কখনও বাক্যে পরিণত পরিণত করার চেষ্টা করি। বই পড়তে ভীষণ ভালোবাসি।

প্রথিতযষা চিকিৎসক, চক্ষু- বিশেষজ্ঞ ও গবেষক। আবৃত্তি ও লেখালেখিতে অবসর যাপন করতে ভালোবাসেন। তাঁর লেখা গল্পের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

Sarit Kumar Das is an Institute professor of the department of mechanical engineering at IIT Madras. He also held the position of Dean (Academic Research) at Indian Institute of Technology Madras. He was the Director at IIT Ropar. His research varies from a wide range of Heat transfer applications like nanofluids, biological heat transfer microfluidics and nanoparticle mediated drug delivery in cancer cells. He is an elected fellow of National Academy of Sciences, India (NASI) and Indian National Academy of Engineering (FNAE).

আমি শ্যামল কুমার ঘোষ। বর্তমানে সহকারী বাণিজ্যিক আধিকারি হিসেবে দক্ষিণ রেলওয়ের সেলেম মণ্ডলে কর্মরত। সময় পেলেই শব্দের বুনোটে লিখে ফেলি মনের কতশত ভাবনা। অবসর সময়ের সঙ্গী বই, ছোটো খাতা আর প্রিয় কলম। Ghosh

রীতা সেনগুপ্তা বহুদিন চেন্নাই এর বাসিন্দা, তিনি লেখালেখি গানবাজনার সাথে যুক্ত, নিয়মিত লেখেন, তার কিছু বইও ইতিমধ্যে বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে |

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়। সত্তরের দশকের শেষ থেকে লেখালেখি শুরু। গদ্যলেখক

মণিদীপা দীর্ঘ 35 বছর সঙ্গীত জগতের সাথে যুক্ত। পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী,শ্রীমতী নির্মলা মিশ্র, বিদূষি হৈমন্তী শুক্লা প্রমুখ স্বনামধন্য গুণী জনের কাছে দীর্ঘ সময় সঙ্গীত শিক্ষা লাভ তার পরম প্রাপ্তি।এছাড়া মণিদীপা দর্শন শাস্ত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর,যা তার সঙ্গীত চর্চার বিশেষ পরিপূরক

নন্দিনী পাল একজন সফল ফুড ব্লগার ও ইউটিউবার।

Disclaimer: পত্রিকার অনলাইন প্রকাশনার প্রস্তুতি দেরিতে শুরু হবার কারণে আমরা সকল লেখকের ছবি ও পরিচয় সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। আমাদের এই ত্রুটি একান্তই অনিচ্ছাকৃত। যাদের ছবি এবং পরিচয় এখানে প্রকাশে আমরা ব্যর্থ হলাম তাদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

দক্ষিণের
দর্পণ